হারানো ঠিকানা

কৃষ্ণা বসু

হারানো ঠিকানা • কৃষ্ণা বসু

এক হারিয়ে যাওয়া যুগের কাহিনি 'হারানো ঠিকানা'। এক বালিকার চোখে দেখা হয়েছে অতীতের সেই বিস্মৃত সময়কাল। স্বাধীনতার মধ্যরাতে যখন ভারতীয় জাতি ভাগ্যের সঙ্গে এক ঐতিহাসিক অভিসারে চলেছে তখন লেখিকা বাল্যকাল অতিক্রম করে পা রেখেছেন যৌবনে। ঘটনাচক্রে প্রথম স্বাধীনতার দিনটি তিনি দেখেছেন দেশের রাজধানী দিল্লিতে। লেখিকার হাত ধরে অনেক হারানো ঠিকানায় আমরাও ঢুকে পড়ি।

9 789350 403112

আনন্দ

হারানো ঠিকানা

হারানো ঠিকানা

কলকাতা ১৯৩০-১৯৫৫

কৃষ্ণা বসু

আনন্দ

পিতৃদেব
চারুচন্দ্র চৌধুরী
সশ্রদ্ধ স্মরণ

প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ২০১৩

© কৃষ্ণা বসু
সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ISBN 978-93-5040-311-2

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং
নব মুদ্রণ প্রাইভেট লিমিটেড
সিপি৪ সেক্টর ৫, সল্টলেক সিটি, কলকাতা ৭০০ ০৯১
থেকে মুদ্রিত।

HARANO THIKANA
[Memoirs]
by
Krishna Bose
Published by Ananda Publishers Private Limited
45 Beniatola Lane, Calcutta 700 009

কৃতজ্ঞতা

বইটি লিখতে সবচাইতে বেশি সাহায্য পেয়েছি আমার এক জীর্ণ ও ছিন্নভিন্ন ডায়েরির কাছে। এখানে ধন্যবাদ অচল। পুত্র সুগত নিজের অজস্র কাজের মধ্যেও নিরন্তর উৎসাহ ও তাগিদ দিয়ে চলেছে। কনিষ্ঠ সুমন্ত্রর নীরব প্ররোচনা। সে তার নিজের বই লিখছে আর একটি করে অধ্যায় আমাকে পড়তে দিচ্ছে। বই লেখার সময়ে বিভিন্ন রকম সহায়তা পেয়েছি যাদের কাছে তারা কার্তিক চক্রবর্তী, সুখময় চৌধুরী, মনোহর মণ্ডল, অনির্বাণ ভট্টাচার্য, মৌ ব্যানার্জি। অমনোযোগী গৃহকর্ত্রীর সংসার চালু রেখেছেন অমলা ও রাখোহরি। প্রকাশিত ছবিগুলি বিভিন্ন সময়ে তুলেছেন পরিমল গোস্বামী, উইলিয়াম পেরিরা, চারুচন্দ্র চৌধুরী ও ধ্রুবনারায়ণ চৌধুরী। আনন্দ পাবলিশার্সের সুবীর মিত্র ও তাঁর সহকর্মীদের জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৩

কৃষ্ণা বসু
'বসুন্ধরা'
৯০, শরৎ বসু রোড
কলকাতা ৭০০০২৬

আমাদের প্রকাশিত এই লেখকের অন্যান্য বই

ইতিহাসের সন্ধানে
১৯৪৭: স্মৃতিবিস্মৃতি
এক নম্বর বাড়ি
চরণরেখা তব
পার্লামেন্টের অন্দরমহলে
যে তরণীখানি

এ ক
ভূমিকম্প ১১

দু ই
ডোভার লেন ২৩

তি ন
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ৪০

চা র
রাসবিহারী অ্যাভিনিউ ৫৪

পাঁ চ
কদম্‌কদম্‌ বঢ়ায়ে যা ৮০

ছ য়
সাল ১৯৪৭: আনন্দে-বিষাদে ১০০

সা ত
স্বাধীন দেশে ১১৩

আ ট
বিশ্ববিদ্যাতীর্থ প্রাঙ্গণ ১২৯

ন য়
জীবনে নবদিগন্ত ১৪৬

নির্দেশিকা ১৫৫

এ ক

ভূমিকম্প

কলকাতা শহর, চৌরঙ্গি, সাল ১৯৩৪। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সূর্যের তেজ চারিদিকে। ভিক্টোরিয়ান স্থাপত্যের বিশাল অট্টালিকার মাঝখানে কেমন করে যেন একটি ছোট, দোতলা বাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। আমার স্মৃতিতে জীবনের প্রথম ঠিকানা। চৌরঙ্গি ইউরোপীয়দের এলাকা। সেখানে কেমন করে এক সাধারণ বাঙালি পরিবার এক ছোটখাটো দোতলা বাড়িতে বসবাস করছিল কে জানে! অবশ্য ওপারে ভবানীপুর, বনেদি বাঙালি এলাকা। মাঝখানে কোথাও অদৃশ্য লাইন অব কন্ট্রোল, এল. ও. সি. আছে।

সেই দোতলা বাড়ির দু'-তিনটি ধাপ নেমে গেছে ফুটপাথে। ওপরের ধাপে দাঁড়িয়ে মা কিনছেন চিনেবাদাম, মায়ের আঁচল ধরে দাঁড়িয়ে আছি আমি। আমার বয়স তিন। শেষ ধাপে মস্ত ঝুড়ি নামিয়ে বাদামওয়ালা কাগজের ঠোঙায় বাদাম ভরতে ব্যস্ত। কথা নেই, বার্তা নেই, হঠাৎ একটা হুলুস্থুলু সৃষ্টি হল। মানুষজন রাস্তায় ভয়ার্ত দৌড়াদৌড়ি করছে। চারদিকে যেন কাড়া-নাকাড়া বেজে উঠল। অবশ্য ঠিক তা নয়। শঙ্খধ্বনি শোনা গিয়েছিল। যেমনি অকস্মাৎ শুরু হয়েছিল গন্ডগোল তেমনি ঝপ করে থেমে গেল, স্বাভাবিক ঢঙে ফিরে গেল জীবন। মা অস্ফুট কণ্ঠে বললেন, 'ভূমিকম্প হয়ে গেল, বেশ জোর ভূমিকম্প।'

আমি ভয়ানক বায়না ধরলাম ভূমিকম্প দেখব। আমি তো দেখতে পাইনি, কেমন দেখতে ভূমিকম্প? আমার কান্নাকাটি সত্ত্বেও ভূমিকম্প আর একবার দেখা দিল না। আমার প্রতি ভূমিকম্পের এই অবহেলায় চোখে জল, মনে দুঃখ। এই আমার প্রথম স্মৃতি।

আমার ছোটবেলার স্মৃতিতে এর পরের দৃশ্যও এই ভূমিকম্পের সঙ্গে জড়িত। আমি মা'র হাত ধরে লিফটে চড়ে উপরে উঠছি। লিফট কলকাতার খুব বেশি বাড়িতে সেকালে থাকার কথা নয়। এসপ্লানেড ম্যানসন বাড়িতে থাকেন আমার ফুলমামা কিরণ রায় আর তাঁর আমেরিকান স্ত্রী, আমার আন্ট অ্যানা। দরজায় বেল টিপতে আন্ট অ্যানা দরজা খুলে দাঁড়ালেন। এলোমেলো চেহারা, কেঁদে চোখ লাল। মা সান্ত্বনা দিচ্ছেন। তখন অবশ্য কিছুই বুঝিনি এত গোল কীসের। এখন জানি ১৯৩৪ সালের জানুয়ারিতে ভয়াবহ ভূমিকম্পের সময়ে ফুলমামা ছিলেন বিহারের দ্বারভাঙা শহরে, যে এলাকা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। দশ দিন ফুলমামার কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

বাড়ির খুব কাছেই ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল। বাবা-মা-র খুব মর্নিংওয়াক-এর বাতিক। রোজ সকালে আমাকে নিয়ে চলে যান ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল। একাধিকবার প্রদক্ষিণ করা হয় সৌধ। সিংহাসনে আসীন ভিক্টোরিয়ার মস্ত স্ট্যাচুর পাশে সর্বক্ষণ পাহারা দেয় এক লাল পাগড়ি মাথায় পুলিশ। তার সঙ্গে আমার বেশ ভাব হয়ে গেছে। সে আমাকে দেখলে ডাকে, খোকি কী খবর? আমিও খুব বকবক করি। বাবা আমার একটা ছবি তুলেছেন ফুলগাছের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। ছবিটার নাম বাবা দিয়েছেন ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতা থেকে Heaven lies about us in our infancy। কিন্তু ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে মর্নিংওয়াক আমাদের ছন্দময় জীবনে এক সমস্যার সৃষ্টি করল। বাড়ির অপর অংশে থাকেন বাড়িওয়ালা, কলকাতার রক্ষণশীল পরিবার। স্ত্রীলোকের ভিক্টোরিয়া ভ্রমণ তাঁদের কাছে অত্যন্ত নিন্দনীয় বোধ হল। মাঝেমাঝে নানা মন্তব্য ভেসে আসে— ওই চললেন মেমসাহেব স্বামীর সঙ্গে হাওয়া খেতে। দিন দিন কটুকাটব্য বাড়তেই লাগল। বাড়িতে আমরা তিন জন বাবা, মা আর আমি। কিন্তু কাকারা ছড়িয়ে আছেন কলকাতা শহরেই বিভিন্ন এলাকায়। ছুটির দিনে প্রায়ই সকলে একসঙ্গে হন চৌরঙ্গির বাড়িতে। এ বাড়িতে আর থাকা যাবে কি না বাবা পরামর্শ করেন ভাইদের সঙ্গে। এমন সময়ে একদিন কোনও অশালীন মন্তব্য ভেসে আসার জেরে ন'কাকা মন্মথচন্দ্র ধেয়ে চলে যান অপরদিকে এবং ঘুসি মেরে আসেন বাড়িওয়ালাকে। ব্যাপারটা পুলিশ অবধি গড়িয়ে যায়।

আমার মা খুব সাহসিনী, দমে যাবার পাত্রী নন। মর্নিংওয়াক চালু থাকে। একদিন বাবার শরীর খারাপ। মা আমাকে নিয়ে একাই চলে গেলেন ভিক্টোরিয়া। আমরা ভিক্টোরিয়া সৌধ প্রদক্ষিণ করছি এক ব্যক্তি আমাদের অনুসরণ করছে। একে বলা হত 'ফলো করা'। মেয়েরা একা পথেঘাটে বার হলে অনেকসময় কোনও অপরিচিত পুরুষেরা ফলো করতেন। আমরা বড় হয়ে ওঠার পরেও এই ব্যাপার দেখেছি। যখন ক্লাস টেন-এ পড়ি, লেকের দিক থেকে কুকুর জিমিকে নিয়ে বাড়ি ফিরছি, পিছনে কয়েকটি ছেলে 'ফলো' করছে। উচ্চস্বরে বলছে, টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরির মেয়ে চলেছে সঙ্গে চেনে বাঁধা কুকুর। খোলাখুলি মেলামেশার সুযোগ নেই। তাই এসব নিরীহ প্রথা বলে বিবেচিত হত।

সেদিন ভিক্টোরিয়ার স্ট্যাচুর কাছে পৌঁছতে আমার পুলিশ বন্ধু খোকি বলে ডাক দিতে মা দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, এই লোকটি অনেকক্ষণ ধরে আমাদের পিছু নিয়েছে। পুলিশ লাঠি উঁচিয়ে কওন হ্যায় বলে তেড়ে যেতেই লোকটি ভ্যানিশ।

এখন ভাবি মা-র ভিক্টোরিয়া ভ্রমণ কেন সমস্যার সৃষ্টি করেছিল। অনেক দিন আগেই তো ঠাকুরবাড়ির বধূরা স্বামীর সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে ময়দানে হাওয়া খেতে বার হয়েছেন।

বড় হয়ে আমি এ ব্যাপারে একটা নিজস্ব থিয়োরি দাঁড় করিয়েছিলাম। আমার মনে হত পূর্ববাংলার মেয়েরা তুলনায় অধিক উদার সামাজিক ব্যবস্থায় বড় হয়েছেন। এপার বাংলায় মেয়েরা গোঁড়ামি ও রক্ষণশীলতায় বন্দি।

কত ছেলেবেলার কথা স্মৃতিতে থাকে? চৌরঙ্গির বাড়ির ঘরগুলি আমার স্পষ্ট মনে পড়ে। দু'-চারটি ঘটনাও ছবির মতো মনে ভেসে ওঠে। কোনও ছুটির দিন হবে। কাকারা এসেছেন। মা একতলায় খাবার ঘরে কাজকর্ম করছেন। সামনের ঘরটি বাবার স্টাডি, আমরা বলতাম বৈঠকখানা। সেখানে বাবা-কাকারা গল্পসল্প করছেন। কিন্তু দোতলার শোবার ঘরে আমি আর মেজকাকা নীরদচন্দ্র চুপিচুপি কী যেন শলাপরামর্শ করছি। মেজকাকা আমার হাতে আর মুখে কাঠকয়লা বা কিছু দিয়ে আঁকিবুকি কেটে দিয়েছেন। চুলও ঝুঁটি মতো বেঁধেছেন। আইডিয়াটা হল আমাকে

পাগল সাজানো হচ্ছে। এরপর শোবার ঘরে মায়ের মস্ত কারুকাজ করা যে ওয়াড্রোব আছে তার পিছনে আমি লুকিয়ে থাকব। সবাই যখন দোতলায় উঠে আসবে তখন আমি আত্মপ্রকাশ করব। সে ভারী মজা হবে। এদিকে মা কী কাজে একটু আগে ওপরে এলেন। চাবি দিয়ে ওয়াড্রোব খুলছেন। আমি যথাসাধ্য নিঃশব্দে লুকিয়ে আছি। মা দেখে ফেলেছেন। খুকু বেরিয়ে এসো শিগগির। অ্যাঁ, এ কী চেহারা!

মার বকুনিতে ভয় পেয়ে যাই। আমি জানি বড়রা কিছু করলে দোষ হয় না। তাড়াতাড়ি বলি, বিচ্ছু আমাকে পাগল সাজিয়েছে।

মেজকাকাকে আমি ছেলেবেলায় অনেক দিন বিচ্ছু ডাকতাম। কারণ ঠিক জানা নেই। শুনেছিলাম উনি কখনও আদর করে ওই নামে আমাকে ডাকতেন তাই আমিও ফিরে ডাকতাম। লেখকজীবনে মেজকাকা নীরদচন্দ্রের শাণিত লেখনী যে কখনও কখনও বিছের দংশনের মতো অনুভূত হবে তা অবশ্য জানা ছিল না।

দোতলার সামনের ঘরে বাবা ইজিচেয়ারে শয়ান। আমি পায়ের কাছে মেঝেতে বসে খেলা করছি। লাইন দিয়ে সাজিয়েছি ছোট ছোট পিতলের জন্তুজানোয়ার, পশু-পাখি। উট, হরিণ, ময়ূর আরও কত কী! কিছুদিন আগে কাশীতে বেড়াতে গিয়ে এসব খেলনা পাওয়া গিয়েছিল। কাশীতে বেড়াতে যাবার কথা আমার কিছু মনে নেই। জানালার বাইরে ছাদে বাঁদর ঘোরাঘুরি করছে অস্পষ্ট মনে পড়ে। আমি বাবার সঙ্গে বকবক করছি। ঘর থেকে দেখা যায় উলটোদিকের বিশাল প্রাসাদোপম অট্টালিকা। সাহেবসুবোরা থাকে সেখানে। মস্ত চওড়া সিঁড়ি উঠে গেছে মাঝখানে। স্থাপত্যের কায়দায় বাইরে থেকে দেখা যায় প্রশস্ত সিঁড়ি।

'বাবা, আমি কাল রাতে স্বপ্ন দেখলাম একটা মস্ত বড় হাতি ওই সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠছে থপ থপ।' ঘরে মা-র প্রবেশ। শোনো কথা, হাতি সিঁড়ি দিয়ে উঠছে! বললেন মা।

আমার ম্লান মুখ। বাবা তাড়াতাড়ি বললেন, উঠতেই পারে।

এই হাতি বিতর্কে বাধা পড়ল। বাইরে গাড়ির আওয়াজ। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। সামনের ঘর আর পিছনে শোবার ঘর, মাঝখানে এক টুকরো খোলা বারান্দা। ছাদ নেই, উপরে নীল আকাশ। সেই ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়ালেন

আমার ঠাকুরদা উপেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী। মা মাথায় ঘোমটা টেনে এগিয়ে এসে প্রণাম করলেন। ঠাকুরদার এই একটি মাত্র ছবি আমার মনের মধ্যে আছে। অদৃশ্য থেকে কেউ যেন বললে, কাট। এরপর বিস্মৃতি।

আমি শুনেছি আমার ঠাকুরদা উপেন্দ্রনারায়ণ ঠাকুমার মৃত্যুর পর ছেলেরা মোটের উপর স্থিত হয়েছে ও দুই মেয়ে বিবাহিত দেখে নিয়ে কাশীবাসী হয়ে যান। মাঝেমধ্যে বিশেষ কোনও কারণ ঘটলে কলকাতায় এসে ছেলেদের দেখে যান। সেকালে কি প্রবীণেরা সংসারজীবনের শেষে 'বনং ব্রজেৎ' না করলেও কাশীবাসী হতেন? আমার ঠিক জানা নেই।

সেবার ঠাকুরদার কলকাতা আসার বিশেষ কারণ খুব সম্ভবত ছিল আমার সেজকাকা শিশুচিকিৎসক ডা. ক্ষীরোদচন্দ্র চৌধুরীর বিবাহ। এ বিবাহ আমার স্মৃতিতে বিশেষ নেই। একটা মস্ত দোতলা বাড়ি ভাড়া করা হয়েছিল, লোকজন গমগম করছে। পাশের বাড়িতে ছিলেন এক ইউরোপীয় দম্পতি, বিয়েবাড়ির গোলমাল তাঁদের পছন্দ হয়নি। অতএব কিঞ্চিৎ বাদানুবাদ। তারপর ছোটকাকা বিনোদচন্দ্রের সঙ্গে তাঁদের হাতাহাতি, উভয়পক্ষের থানায় যাওয়া। জেলে যেতে হলে ছোটকাকার আর দাদার বিয়ে দেখা হত না। এর বছর দুয়েক আগে মেজকাকা নীরদচন্দ্রের বিবাহের সময়ে ছোট দুই ভাই মন্মথচন্দ্র ও বিনোদচন্দ্র মহাত্মা গাঁধীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেবার অপরাধে জেলে ছিলেন। জেল থেকে বন্দি দেবরেরা তাঁদের নতুন বউঠানের উদ্দেশে অভিনন্দনবার্তা পাঠিয়েছিলেন। এবার কোনওমতে জেলে যাওয়া থেকে পরিত্রাণ। সেকালে সব পরিবার থেকেই কেউ না কেউ জেলে যাবেন বা পথেঘাটে সাহেবসুবোদের সঙ্গে হাতাহাতি, মারামারি হবে এ যেন ছিল জীবনেরই অঙ্গ।

চৌরঙ্গির বাড়ির একটি ঝলমলে স্মৃতি মনের মধ্যে আছে। বাড়িতে উৎসবের পরিবেশ। সন্ধ্যায় আত্মীয়স্বজন একে একে এসে উপস্থিত হচ্ছেন। বাবার দিক আর মায়ের দিক দু'দিকেই বড় পরিবার। বাবারা ছয় ভাই, দুই বোন। মায়েরা পাঁচ ভাই, তিন বোন। অবশ্য সবাই কলকাতায় থাকেন এমন নয়। অনেকে 'দেশ'-এ আছেন, অর্থাৎ পূর্ববাংলায়। দুই পিসিমা ময়মনসিংহে, বড়মামা ঢাকাতে। মেজমাসি থাকেন বর্মা নামে দূরের একটা দেশে। তবুও সবাই একসঙ্গে হলে বাড়ি ভরে যায়। আমাকে

একটি লাল জর্জেটের ফ্রক পরানো হয়েছে, থাক থাক ফ্রিল দেওয়া। বাবা কিনে এনেছেন হোয়াইটওয়ে লেডলো দোকান থেকে। আমার চার বছরের জন্মদিন। 'কই কৃষ্ণকলি কোথায়? এখনও সাজ হল না।' ফুলমামার গলা শোনা যাচ্ছে। আমাকে কোলে করে নিয়ে ফুলমামা সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে যাচ্ছেন। নীচে লোকজনের হইচই, খাবারদাবারের গন্ধ। চৌরঙ্গির বাড়ির ঠিকানা এরপর আমার জীবন থেকে হারিয়ে গেল।

যদিও আমার বড় হয়ে ওঠা সম্পূর্ণ কলকাতা শহরে কিন্তু আমার জন্ম ঢাকাতে, আমার মায়ের পিতৃগৃহে। সেকালে মেয়েরা সন্তান হতে, বিশেষত প্রথম সন্তানের জন্মের সময়ে বাপের বাড়িতে থাকবেন এমনি রেওয়াজ ছিল। আমার ক্ষেত্রে আমি আমার মায়ের বিবাহের দশ বছর বাদে জন্মগ্রহণ করতে চলেছি। শুনেছি মা কলকাতা থেকে ঢাকা যাবেন। ট্রেন জাহাজ ইত্যকার সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে, তখন জানা গেল যাত্রার দিনটি শুভ নয়। কী করা যায়! পুরোহিত বিধান দিলেন আগের রাত্রে যাত্রা করে নিজের শয়ন কক্ষের বাইরে এসে বাস করতে হবে। তথাস্তু।

আমার জন্মের বৃত্তান্তর সঙ্গে একটি অলৌকিক কাহিনি জড়িত আছে। বিবাহের পর তিন বছরের মাথায় মা সন্তানসম্ভবা হন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেটি নষ্ট হয়ে যায়। এরপর দীর্ঘ সাত বছর সন্তানহীনা নারীর মনে গভীর দুঃখ। আত্মীয়ামহলে কথাও শুনতে হয়। ঈশ্বরের কাছে মা অনেক প্রার্থনা করেন। এমনি সময়ে একবার কাশীতে গেছেন, শ্বশুরমশাই থাকেন সেখানে। সঙ্গে ছোটননদ, বিবাহিতা, এক পুত্রের জননী। কাশীতে একজন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত বিধান দিলেন বিশেষ এক তিথিতে পূজার পরদিন সকালে সংকল্প করে গঙ্গাস্নান করতে হবে, এরপর সন্তান লাভ নিশ্চিত। মা ভক্তি ভরে পূজার্চনা করলেন। কিন্তু পরদিন সকালে দেখা গেল অবগাহন সম্ভব নয়। আশাভঙ্গে মা অত্যন্ত কাতর। ছোটননদ বললেন, আমি তোমার নামে সংকল্প করে স্নান করে আসব, নিশ্চয় ফল লাভ হবে। ঈশ্বর প্রক্সিতে সাড়া দিলেন। মা কন্যাসন্তান লাভ করলেন।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর যখন ঢাকা গেলাম, বন্ধুরা আমাকে যে বাড়িতে জন্মেছিলাম দেখিয়ে আনলেন। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, লক্ষ্মীবাজার জায়গাটা কি এখনও আছে? ওঁরা বললেন, আছে বই কী!

আমরা কি অলক্ষ্মী নিয়ে থাকব নাকি!

এই বাড়ির গল্প মার কাছে, দিদিমার কাছে অনেক শুনেছি। দাদু ললিত রায় ছিলেন সেকালের স্বদেশি জমিদার। ওঁদের জমিদারি ছিল নরসিংদিতে। তবে কর্মসূত্রে ঢাকাতে থাকতেন। মা বলতেন, প্রায় রাতে ওঁদের ঘুম ভেঙে যেত বুটজুতোর মসমস শব্দে। বুঝতেন পুলিশ ঘিরে ফেলেছে বাড়ি, সার্চ হবে। দিদিমা বলতেন, তোর দাদু মাঝেমাঝেই রাত্রে ডেকে তুলতেন। 'ওঠো তো, একটু ভাতে ভাত বসাও।' সামনে দাঁড়ানো দুটো ছেলে, নেহাতই ছেলেমানুষ। ভাতে ভাত খেয়ে তারা রওনা হয়ে যেত। আর তাদের কোনওদিন দেখতাম না।

বিপ্লবীদের সাহায্যকারী ও আশ্রয়দাতা হিসেবে পুলিশের নজর ছিল দাদুর উপর। এর মধ্যে দাদুর মনে হল নদী পারাপার করার জন্য যে লঞ্চ চলাচল করে সবই বিদেশি কোম্পানির। দাদু স্থির করলেন স্বদেশি লঞ্চ চালাবেন। স্বদেশি লঞ্চের যাত্রা শুরু হল। কিন্তু যাত্রী বিশেষ হয় না। তখন ফ্রি-তে চা-বিস্কুট দেওয়া হতে লাগল লঞ্চ-যাত্রীদের। তবুও দেশবাসী বিদেশি লঞ্চই পছন্দ করতে লাগলেন। ফলে স্বদেশি কোম্পানি উঠে গেল। লোকসান সামলাতে জমিদারির কয়েকটি মহল বিক্রি করে দিতে হল।

তবে কিছুদিন একটা লাভ হয়েছিল। বিপ্লবীরা খালাসি সেজে লঞ্চ-এ অনেক সময় আশ্রয় নিতেন। অনেক দিন পরে তেমন একজন বিপ্লবী তাঁর আশ্রয় নেবার অভিজ্ঞতা আমাকে বলেছিলেন। তিনি স্বনামধন্য ত্রৈলোক্য মহারাজ। শেষ পর্যন্ত ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় (Dacca Conspiracy Case) দাদু গ্রেপ্তার হয়ে জেলে গেলেন। সেই মামলায় বিপ্লবীদের হয়ে সওয়াল করতে এসেছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে দাদুর কতকগুলি বিশেষ ধরন ছিল। যেমন ছেলেদের বিদেশে পড়াশুনোর জন্য পাঠাবেন কিন্তু ইংল্যান্ডে পাঠানো চলবে না। তখনকার দিনে উচ্চশিক্ষার জন্য লোকে অক্সফোর্ড কেমব্রিজ-এ ছেলেদের পাঠাতেন। মেজছেলে সুরেন্দ্রকুমার রায়কে দাদু পাঠালেন আমেরিকাতে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেটা বিশের দশক। ফুলমামা কিরণ রায়কে পাঠানো হল এম. আই. টি. একই শহরে, কেমব্রিজ ম্যাসাচুসেটস। মাঝখানে আর এক মামা তিনি গেলেন জার্মানি। স্বদেশি

করা ছাড়াও সমাজ সংস্কারক হিসেবেও দাদুর আর এক ভূমিকা ছিল।

তিনি বিধবাবিবাহ উৎসাহিত করতেন, নিজে বিধবাবিবাহ দিতেন। একদিন তাঁর কানে এল কেউ মন্তব্য করেছে, উনি অন্যদের ছেলের সর্বনাশ করে বেড়ান অথচ নিজের ছেলেদের তো বিধবাবিবাহ দেন না। তৎক্ষণাৎ তাঁর হার্ভার্ড-ফেরত পুত্রের তিনি বিধবা কন্যার সঙ্গে বিবাহ দিয়ে দিলেন। আমাদের সেই মামিমা সুন্দর গান করতেন।

ফুলমামা যখন জানালেন তিনি আমেরিকান কন্যা বিবাহ করবেন তখনও দাদুর উদার মনোভাবের পরিচয় পাই। পরিবার তাঁকে সাদরে গ্রহণ করায় আন্ট অ্যানা কোনও সময়ে অভিভূত হয়ে থ্যাংক ইউ বলেছিলেন। দাদু বললেন, তুমি তোমার মা-বাবা, আত্মীয়-বান্ধব নিজের দেশ ছেড়ে আমার ছেলের জন্য এই দূর বিদেশে এসেছ। তার জন্য আমরাই তোমার কাছে ঋণী। ধন্যবাদ তো আমাদেরই বলা উচিত।

মামার বাড়ির দিকটা মনে হয় কর্মযোগের প্রাধান্য। স্বদেশি শিল্প গড়ে তুলতে হবে সেই আদর্শে মেজমামা সুরেন্দ্রকুমার রায়ের নেতৃত্বে বেঙ্গল বেলটিং, বেঙ্গল ল্যাম্প গড়ে ওঠে। অন্য ভাইরাও সঙ্গে যোগ দেন। যাদবপুরে দুই মামার দুটি বাড়ি, বেঙ্গল ল্যাম্পের কারখানার চারপাশে সবুজ গাছপালা, মাঠঘাট, পুকুর আমার শৈশবের স্মৃতির অনেকখানি জুড়ে আছে।

মা-দের গ্রামের বাড়ি নরসিংদি খুব ছেলেবেলায় একবার গিয়েছি। বড়মামা হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছেন গ্রামের ইস্কুলে। দাদুরই প্রতিষ্ঠিত ইস্কুল, তাঁর বাবার নামে। শুনেছি সেই ইস্কুল এখনও আছে, অনেক বড় হয়েছে, দাদুর বাবা কালীকুমারের নামেই রয়েছে সেই বিদ্যালয়। বড়মামিমা রন্ধনপটিয়সী। বাবুর্চি রেখে রান্না শেখানো হয়েছে। রান্নাঘরে নানারকম সাহেবি রান্নাও হচ্ছে। পাঁউরুটি, বিস্কুট, কেক বেক করা হচ্ছে। একটা কারণ হয়তো এই যে মেমমামিমা অ্যানাও রয়েছেন দেশের বাড়িতে। অ্যানা মামিমার জন্য বাথরুমে বিশেষ ব্যবস্থা করতে হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে বেশ কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছে।

আমার বাবারা বড় হয়েছেন ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জ শহরে। গ্রামের বাড়ি বনগ্রাম। আমার কোনও প্রত্যক্ষ স্মৃতি নেই। বাবা-মা আর কাকাদের

মুখে শুনে শুনে মনের মধ্যে অনেক ছবি আঁকা হয়ে আছে। দেশের বাড়িতে দুর্গোৎসব। মঠখোলা থেকে পুরোহিত এসেছেন মোষ বলি হবে। বলির পর বাড়ির পুরুষেরা পূজাপ্রাঙ্গণে গান করছেন— 'শ্মশানে কেন মা-গিরিকুমারী, কেন মা তোমার এমনও বেশ—'।

কিশোরগঞ্জের গল্প যেমন শুনি তাতে মনে হয় এ বাড়িতে জ্ঞানযোগের চর্চা বেশি। পূর্ববাংলার এক ছোট শহর কিশোরগঞ্জে ছেলেদের নিয়ে ঠাকুরদা কী করে সাহিত্য, সংগীত, শিল্পকলার এমন জমজমাট পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন ভাবলে আশ্চর্য লাগে। বাবা-কাকারা এমন চমৎকার ইংরেজি লিখতে পড়তে কেমন করে শিখলেন ভেবে আশ্চর্য হই। বাড়িতে নাটক হয়, শেকসপিয়ার থাকেন। Friends, Romans, Countrymen Lend me your ears— শোনা যায়।

ঠাকুরমা চমৎকার গান করেন। ঠাকুরদার উৎসাহে কলকাতা থেকে হারমোনিয়াম আসে। বাড়ির বউ হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান করে এর জন্য প্রচুর নিন্দা শুনতে হয়। ঠাকুরমা এসেছেন ব্রাহ্মভাবাপন্ন পরিবার থেকে। ব্রহ্মসংগীত আর রবিঠাকুরের গান করেন। সন্ধ্যাবেলায় ছেলেমেয়েরা ঘিরে বসে— সংগীতচর্চা চলে। দেবব্রত বিশ্বাস সেই শহরেই বাল্যকাল কাটিয়েছেন। ঠাকুরমার সংগীতচর্চা ও সেই কারণে ঘোর নিন্দার কথা তাঁর বই 'ব্রাত্যজনের রুদ্ধ সংগীতে' লিখে গেছেন। সত্যিই বাবাদের বাড়ি খুব গানের বাড়ি, বিশেষ করে রবীন্দ্রসংগীতের চর্চা। মা বলতেন, তোমার ঠাকুরমা ঘরের কাজ করতে করতেও গান করতেন।

রবীন্দ্রসংগীত জগতে পরিচিত নাম শৈলজারঞ্জন মজুমদার সম্পর্কে বাবার ভ্রাতুষ্পুত্র। বাবা-কাকারা ডাকেন শৈল ভাতিজা। শৈলজারঞ্জন তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও অনুরাগের সূত্রপাত কিশোরগঞ্জের উপেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর পরিবার। শৈলজারঞ্জনের ঠাকুরমা উপেন্দ্রনারায়ণের সহোদরা। পরবর্তীকালে কলকাতার বাড়িতে 'চারুকাকা' অর্থাৎ আমার বাবা চারুচন্দ্র চৌধুরীর কাছে তিনি রবীন্দ্রসংগীতের পাঠ নিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে কিশোরগঞ্জের বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের ছিল প্রবল উপস্থিতি। বাড়ির ছেলেমেয়েরা 'মুকুট' নাটক অভিনয় করছে। চারুচন্দ্র সেজেছেন যুবরাজ চন্দ্রমাণিক্য, মেজভাই

নীরদচন্দ্র রাজপুত্র ইন্দ্রকুমার। মার কাছে গল্প শুনেছি, একবার 'বিসর্জন' নাটক অভিনয় চলছে। রঘুপতির ভূমিকায় ন'কাকা মন্মথচন্দ্র, জয়সিংহের ভূমিকায় কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিনোদচন্দ্রের বুকে খড়্গ বসিয়ে দিলেন। এদিকে দর্শকাসনে ঠাকুরমা অজ্ঞান হয়ে গেলেন। খবর পেয়ে কলকাতা থেকে চারুচন্দ্র ও নীরদচন্দ্র রওনা হলেন। কিন্তু তাঁরা এসে পৌঁছবার আগেই ঠাকুরমার জীবনাবসান। একবার জ্ঞান ফিরলে চোখ মেলে বলেছিলেন, চারু-নীরুরে দেখলাম না।

আমার বাবা চারুচন্দ্রর সঙ্গে আমার মা ছায়াময়ীর বিবাহ ঠিক করেছিলেন দাদু। তিনি কী কাজে কিশোরগঞ্জ গিয়েছিলেন। ফিরে এসে বললেন, একটি পরিবারের সঙ্গে আলাপ হল, খুব বিদ্বান। তাই তিনি বিবাহের সম্বন্ধ উত্থাপন করে এসেছেন। ছায়াময়ী পড়েন ক্লাস নাইনে। বরপক্ষ ময়মনসিংহ থেকে ঢাকা এলেন কন্যাকে দেখতে। মা এস্রাজ বাজিয়ে শোনালেন, 'আয় তবে সহচরী হাতে হাতে ধরি ধরি নাচিবি ঘিরি ঘিরি গাহিবি গান'। এবার কবিতা বলার পালা। মা আবৃত্তি করলেন, 'সম্মুখ সমরে পড়ি বীর চূড়ামণি বীরবাহু চলি যবে গেলা যমপুরে অকালে—'। বাঃ বেশ! ভাবী শ্বশুর ও ভাবী দেবর এসেছিলেন মেয়ে দেখতে। দু'জনেই খুশি।

বিবাহ হবে গ্রামের বাড়ি নরসিংদিতে। বর রেলগাড়ি থেকে নেমে পালকিতে চড়লেন। বরের পালকির পাশে পাশে ছুটতে ছুটতে চলেছে এক সুশ্রী চেহারার বালক। সে কনের নানাবিধ দোষ-এর কথা বরের কর্ণগোচর করছে।

'ছোড়দির না খুব ভুলা মন, কেবল চাবি হারাইয়া ফ্যালে।' বেশ দীর্ঘ তালিকা। পালকিতে বসে শুনতে শুনতে চললেন বর। বাবা বলতেন, এর মধ্যে বেশ কয়েকটির কারণে পরবর্তী জীবনে ভুগতে হয়েছিল, চাবি হারিয়ে ফেলা তার অন্যতম। সেদিনের সেই বালক ছিলেন আমার প্রিয় ফুলমামা।

সে রাত্রি বাবা যে ঘরে কাটালেন সেখানে অন্য একটি শয্যায় কন্যাপক্ষের এক মাতুল জ্বরের ঘোরে সারা রাত প্রলাপ বকলেন। প্রশ্ন, 'চারু, জানো মানুষ কয় প্রকার?'

'আজ্ঞে না।'

'মানুষ দুই প্রকার, পাগল আর ছাগল।'

ফলে রাতে ভাল ঘুম হল না। পরদিন বিবাহসভায় এক বিপত্তি। পুরোহিত কন্যাকে 'দেবী' না বলে 'দাসী' বলাতে বর প্রতিবাদ করলেন। ব্রাহ্মণ হলে তবেই দেবী বলা বিধেয় একথা বর মানতে নারাজ। পুরোহিতের সঙ্গে মতবিরোধে বিবাহসভা প্রায় পণ্ড হবার উপক্রম দেখে উপস্থিত সজ্জনবৃন্দ মত দিলেন এঁরা ক্ষত্রিয়, তাই দেবী বলা চলবে।

নবপরিণীতা বধূকে নিয়ে বরপক্ষ কিশোরগঞ্জের গৃহে পৌঁছলেন। পরিবারের রাবীন্দ্রিক ধারা অনুসারে দেবর-ননদেরা মিলিত কণ্ঠে রবীন্দ্রসংগীতের মাধ্যমে বধূকে বরণ করে নিলেন— 'আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে তব অবগুণ্ঠিত কুণ্ঠিত জীবনে করো না বিড়ম্বিত তারে'।

ছায়াময়ী নামটি বেশ কাব্যিক ছিল। কিন্তু বিবাহের পর দেবীচৌধুরানি হয়ে যাবার ফলে মা ছোট করে শুধু ছায়া লিখতেন।

কলকাতায় মা স্বামী আর পাঁচ দেবরকে নিয়ে সংসার করেছেন বেশ কিছুদিন। বাবা-কাকারা কলেজ জীবন থেকে কলকাতাবাসী। কিন্তু দেশ অর্থাৎ ময়মনসিং-এ নিত্য যাতায়াত। বাবা কোনও এক সময়ে 'বাড়ি' আর 'বাসা'র পার্থক্য বুঝিয়েছেন। প্রবাসে পড়াশুনো বা কাজের সূত্রে যেখানে থাকেন তাকে বলা হয় 'বাসা'। আর 'বাড়ি' হল কিশোরগঞ্জ।

কিন্তু কোনও এক সময়ে কলকাতা বাসা থেকে বাড়িতে রূপান্তরিত হয়। ঠাকুরমার মৃত্যু, ঠাকুরদার কাশীবাসী হওয়া, বড়পিসিমা প্রিয়বালার বিবাহ হয়ে গেছে নেত্রকোনার সম্পন্ন পরিবারে, ছোটপিসিমা সরোজবালা বধূ হয়েছেন তালজাঙ্গার জমিদার গৃহে। কলকাতার সংসারে মা একা নারী, ছয় জন পুরুষ সদস্য নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রতিভাবান। প্রতিভা আর খামখেয়ালিপনার মধ্যে প্রাচীর বেশ সূক্ষ্ম। মায়ের সংসারজীবন খুব সহজ হবার কথা নয়। ভাতের হাঁড়ি, রাত্রের রান্না নিয়ে মা বসে আছেন রান্নাঘরে। রাত্রি গভীর হচ্ছে, মা ঘুমে ঢুলছেন। বসার ঘরে সাহিত্য আলোচনা চলেছে। কবি মোহিতলাল মজুমদার এসেছেন, কবিতা পাঠ চলছে। 'ঝমর ঝমর ঝম বাজে ঐ মল—' মা চমকে উঠছেন।

আরও এক সাহিত্যিকের আনাগোনা আছে বাড়িতে। তিনি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বাবা যাবেন সপরিবার গালুডি ভ্রমণে। বিভূতিভূষণ একখানা

খাতায় লিখে দিচ্ছেন সেখানে গিয়ে কী করণীয়। যথা— নেকড়ে ডুংরি পাহাড় হইতে সূর্যোদয় দর্শন, সুবর্ণরেখার তীরে চন্দ্ররেখা অবধি ভ্রমণ, কলসিবাংলার বউদিদির সহিত পরিচয় স্থাপন ইত্যাদি। খাতাটি বাবা যত্ন করে রেখে দিয়েছিলেন। তবে এসব আর একটু পরের ঘটনা।

সেজকাকা ক্ষীরোদচন্দ্রর মেডিকেল কলেজের পাঠ শেষ হয়েছে। বিলাতে আরও উচ্চশিক্ষার জন্য যেতে উৎসুক। কিন্তু তা সম্ভব নয়। স্বদেশি করতেন, পুলিশের খাতায় নাম আছে। বিলেত যাবার পাসপোর্ট মঞ্জুর হবে না। এরই মধ্যে হঠাৎ একদিন মাকে এসে বললেন, বউদি, শিগগির সুটকেস গুছিয়ে দিন। কালই বেরিয়ে পড়তে হবে। সে কী! কোথায়? কাল বন্দর ছেড়ে যাবে এক বিদেশি জাহাজ, তাতে ডাক্তারের কাজ জোগাড় করেছেন। সেই জাহাজে চাকুরি নিয়ে সোজা এসে পৌঁছলেন আমেরিকার বস্টন শহরে। সেই শহরে কেমন করে যেন পাসপোর্ট জোগাড় করলেন। তারপর এলেন ইউরোপে। জার্মানির টিউবেনগেন ও অস্ট্রিয়ার ভিয়েনাতে শিশু চিকিৎসার পাঠ নিলেন তিনি। অর্থের কষ্ট হয়েছিল খুব। মাকে চিঠিতে জানাতেন কষ্টের কথা। শুনেছি মার কাছে এ খবর জেনে দাদু কখনও সখনও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। সেকালে আত্মীয়তার পরিধি ছিল বিস্তৃত আর দাদু ছিলেন পরোপকারী। আমার মা এই ধারা পিতৃসূত্রে পেয়েছিলেন। মার এই চারিত্রিক দুর্বলতা নিয়ে ছোট দুই কাকা পরিহাস করে বলতেন বউদিদি কাষ্ঠ আহরণ করতে যাবেনই।

আমার ডাক্তারকাকা যদি যথাসময়ে ভিয়েনা থেকে দেশে না ফিরতেন তবে নাকি আমি আমার এক বছর বয়সেই ইহলীলা সাঙ্গ করতাম। শিশু চিকিৎসক কাকা ফিরে এসে দেখলেন আমাকে বার্লি পথ্য করে রেখে ও নানারকম ভুল চিকিৎসার ফলে প্রায় শেষ করে আনা হয়েছে। সেজকাকা নিজের হাতে চিঁড়ে ভাজা, সুজি, হলুদ দিয়ে ভাত ইত্যাদি খাইয়ে আমাকে মৃত্যুমুখ থেকে ফিরিয়ে আনলেন। সেকালে পেডিয়াট্রিকস্ (Pediatrics) কাকে বলে কোনও ধারণা ছিল না। শিশু চিকিৎসার ক্ষেত্রে ডা. কে সি চৌধুরী নামে তিনি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। আমার সৌভাগ্য আমি তাঁর প্রথম রুগি হিসেবে দেশের পেডিয়াট্রিকস্ প্রসারে নাম লিখলাম।

দুই

ডোভার লেন

'দাদা তুমি নাকি বালিগঞ্জে বাড়ি দেখেছ? ছ্যা ছ্যা!' মেজকাকা নীরদচন্দ্র নিন্দার ভাষা খুঁজে পেলেন না। তাঁর মতে ওখানে আপস্টার্টরা থাকে যত্তসব উঠতি বড়লোক, ভুঁইফোড়দের জায়গা। বনেদি বাঙালি এলাকা হল উত্তর কলকাতা। যেমন উনি থাকেন শ্যামবাজারে, গ্রে স্ট্রিটের একটি ফ্ল্যাট বাড়িতে। ৭/২ ডোভার লেন বাবার খুব পছন্দ হয়েছে। একতলা বাড়ি, সঙ্গে অনেকখানি জায়গা। বাবার খুব বাগানের শখ। চারিদিকে খোলামেলা, অল্প কয়েকটি দোতলা বাড়ি এদিক ওদিক নতুন উঠেছে। তবে হ্যাঁ, সন্ধ্যাবেলা শেয়ালের ডাক শোনা যায়।

অস্পষ্ট মনে পড়ে, মেজকাকিমা অমিয়া এসেছেন দুই শিশুপুত্রকে নিয়ে। সারাদিন কাটাবেন। এ রকম এবাড়ি থেকে ওবাড়ি ডে স্পেন্ড করা দিন কাটানো নিয়মিত হত। সন্ধ্যায় ছোটছেলেকে কোলে নিয়ে ঝিনুকে দুধ খাওয়াতে খাওয়াতে হঠাৎ বললেন, 'শুনতে পেলি? ওই শোন শেয়াল ডাকছে।' সেই প্রথম শেয়ালের ডাক শুনলাম। 'টুনটুনির বই'-এর কল্যাণে শেয়াল ছেলেবেলা থেকে আমাদের কৌতূহলের জীব ছিল।

অল্পদিনের মধ্যে বাবা পিছনে সুন্দর বাগান করে ফেলেছেন। আমাদের বাগানের ওপারে যাঁদের বাড়ি তাঁদের আরও বিরাট লন ও বাগান। বাগানের সঙ্গে যুক্ত গাড়িবারান্দাওয়ালা দোতলা বাড়ির মুখ ওপারের রাস্তার উপর। রাস্তার নাম হিন্দুস্থান রোড। ও বাড়িতে থাকেন হেম জ্যাঠামশাই আর ইন্দু জ্যাঠাইমা। জ্যাঠামশাই হেমেন্দ্রকুমার দাস বাবার মাসতুতো দাদা। ইন্দু জ্যাঠাইমা ময়মনসিংহের মসুয়ার নরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর কন্যা। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী নরেন্দ্রকিশোরের বড়

ভাই, অবশ্য দত্তক পুত্র হিসেবে। জ্যাঠাইমার বাড়িতে পালাপার্বণে মা আর জ্যাঠাইমার সঙ্গে আর একজনকে দেখতাম। সবাই ডাকত বউঠান। সাদা থান পরা বিধবার বেশ, কিন্তু চোখে পড়ার মতো সুন্দরী। তিনি জ্যাঠাইমার বড়দাদা ধীরেন্দ্রকিশোরের বিধবা পত্নী। আর একজনের উল্লেখ মাঝেমধ্যে শুনতাম। মা এবং অন্যান্যরা বলতেন টুলু বউঠান। ইনি উপেন্দ্রকিশোরের পুত্র সুকুমার রায়ের স্ত্রী, ইনিও অকালে বিধবা। ইন্দু জ্যাঠাইমা ভক্তিমতী। তাঁর ঠাকুরঘরে আছেন নাড়ুগোপাল। আমি অবাক চোখে দেখি নীলবর্ণের শিশু গোপাল, জ্যাঠাইমা পরিয়ে দেন বেনারসি শাড়ি কেটে তৈরি ছোট ছোট সুন্দর জামা।

হিন্দুস্থান রোডের এই বাড়ির কথা কেন আমার এত মনে আছে তার পিছনে গভীর কোনও কারণ আছে কী? মনে হয় আছে। আমাদের বাড়িতে বাবা, মা আর আমি। জীবনযাত্রা কিঞ্চিৎ নিস্তরঙ্গ। কিন্তু ও বাড়ি উৎসবে ব্যসনে কর্মচঞ্চল। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ নিয়ে জীবন যে প্রবহমান তার পরিচয় আমার পরস্মৈপদী। আমি যেন গাছের ডালে বসে আছি। দার্শনিক পাখি, দূর থেকে অবলোকন করছি কলরবমুখর জীবন।

ও বাড়িতে একটা চাপা উত্তেজনা। একটা বন্ধ দরজার বাইরে অপেক্ষা করছে অনেকে। মেয়েরা কেউ ভিতরে, আমার মাও আছেন তাদের সঙ্গে। দরজা খুলে গেল। বাড়ির কনিষ্ঠা কন্যার জন্ম হয়েছে। মা ডাকছেন, খুকু দেখে যাও কী সুন্দর। আশ্চর্য হয়ে দেখলাম সদ্যোজাত মানবশিশু।

এইসব স্মৃতি আমার কাছে কিছু অস্পষ্ট, ইমপ্রেশনিস্ট ছবির মতো। অকস্মাৎ কোনও একটি দৃশ্য হয়তো খুব উজ্জ্বল। বাড়ির জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ, আমরা ডাকি দিদিভাই। মহা সমারোহে আয়োজন চলছে। আমি খুব উত্তেজিত। বাবা বলেছেন শাড়ি পরব বিয়েতে। মা-বাবা নিউ মার্কেটে গেছেন কেনাকাটা করতে। আমি জানালার ধারে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। আমাকে কোলে করে বসে আছে ঝিমা। ওহো! ঝিমার কথা আগে বলা হয়নি। চৌরঙ্গির বাড়িতে আমাকে সর্বক্ষণ দেখাশুনোর জন্য যে সেবিকা ছিল সে আমাদের সঙ্গে বালিগঞ্জে এসেছে। সেকালে পরিচারিকাকে 'অমুকের মা' বলে ডাকা হত। মা জিজ্ঞেস করেছিলেন, তোমার ছেলের নাম কী! ওর নিজের ছেলে নেই, ভাইপো আছে। তার নাম

বলাই। 'বলাইর পিসি' নামে সে আমাদের বাড়িতে পরিচিত। কিন্তু অত বড় নাম আমার বলা সম্ভব নয়। মা বললেন, ওকে তুমি ঝিমা ডেকো।

ওই দেখা যাচ্ছে মা-বাবা আসছেন, হাতে বেশ বড় বড় প্যাকেট। তারই একটা থেকে বার হল আমার স্বপ্নের মতো সুন্দর ফিরোজা রঙের সিল্কের শাড়ি। সরু রুপোলি জরির পাড়। বিয়ের রাতে সেই শাড়ি পরে ঘুরছি। তবে আমার তো মোটে একটা শাড়ি, দিদিভাইয়ের যে কত— খাটের চারপাশে ঝুলিয়ে রাখা হচ্ছে। কনের গা ঘেঁষে বিয়ের সময়ে বসে আছি। সামনে আগুন জ্বলছে, চোখ জ্বালা করছে। ঘুম পেয়ে গেছে খুব। কে যেন তুলে নিয়ে যাচ্ছে, আমি প্রতিবাদ করার চেষ্টা করছি, যাব না, বিয়ে দেখব। কিন্তু ঘুম চোখ জুড়ে এসেছে।

পরদিনের ছবিটা ঢের বেশি স্পষ্ট। কন্যার পতিগৃহে যাত্রা। বাড়িতে শোকের পরিবেশ। দিদিভাই ভয়ানক কান্নাকাটি করছে। গেটের বাইরে দাঁড়ানো মোটরগাড়ি। জামাইবাবু আর দিদিভাই গেটের দিকে চলেছেন। কিন্তু গেট থেকে ছুটে ছুটে চলে আসছে দিদিভাই। জ্যাঠামশাইকে জড়িয়ে ধরে কান্না জুড়ে দিচ্ছে। আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। আমি মাকে চুপিচুপি একটা গোপন কথা বললাম, 'মা, আমি বিয়ে করব না।' তারপর যোগ করলাম, 'বাবা তো আমাকে একটা শাড়ি দিয়েছেই।' তারপর আর বিয়ে করার প্রয়োজন কী!

আমাদের নিজেদের বাড়ি যে একেবারেই ঘটনাবিহীন তেমন নয়। লোকজনের আসা-যাওয়া লেগেই থাকে। নতুন পাড়াতে এসেছি, অনেকে দেখা করে বাবা মা-র সঙ্গে আলাপ করে যান। বাবা বাগানে কিছু ফুল ফুটিয়েছেন। একদিন বাবা বাগান পরিচর্যা করছেন পরনে খাকি হাফ প্যান্ট, আর সাদা গোলগলা গেঞ্জি। বলা যায় আজকালকার টি-শার্ট। খুরপি হাতে টবের মাটি খুঁড়ছেন। পিছন থেকে এক মহিলা বললেন, 'এই যে মালি শোনো। বাড়িতে মাকে খবর দাও অমুক বাড়ির মাসিমা এসেছেন।' খুরপি হাতে উঠে দাঁড়িয়ে বাবা মুখোমুখি হলেন— আপনি! বুঝতেই পারিনি। এই মাসিমা আমাদের খুব আপন হয়ে পড়েছিলেন। মাকে খুব স্নেহ করতেন। কতরকম রান্না শিখিয়েছিলেন। তাঁর অনেকগুলি ছেলে, অমুক দাদা তমুক দাদা। ছোটছেলে মানিকদা পাড়ার সব কাজে

নেতৃত্বস্থানীয়। আর আছে মাসিমার পরমাসুন্দরী এক মেয়ে, আমরা ডাকি মনুয়াদি। নতুন পাড়ার যুবকেরা একসঙ্গে হয়ে একটি ক্লাব গড়ে তুললেন। নাম হল হিন্দুস্থান সংঘ। সংঘের শুভ সূচনা উপলক্ষে উৎসবের আয়োজন হল। ডোভার লেনের শেষ প্রান্তে মি. ঘোষদের মস্ত বড় বাড়ি। সে বাড়ির একতলার হলঘরে অনুষ্ঠান। এ বাড়ির ছেলে অলকদা ভারী সুন্দর বেহালা বাজান। ছোট্ট মেয়ে হিসেবে আমাকে নাচের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে। আমার নাচ দিয়ে সংঘের উদ্বোধন। মনুয়াদি সাজিয়ে দিয়েছে। কমলারঙের জর্জেট শাড়ি, ফুলফুল পাড়। চুল খোলা, হাতে রেকাবিতে প্রদীপ জ্বলছে। দু'-একটা পায়ের স্টেপ আর হাতের মুদ্রা। 'জ্বালো জ্বালো মম স্বর্ণ আলো' মানিকদার লেখা গান। অলকদা নিশ্চয় বেহালা বাজিয়েছিলেন। সেকালে এই ধরনের সংঘগুলির নানারকম ভূমিকা ছিল। কেউ বা সাংস্কৃতিক কাজকর্মের আড়ালে গুপ্ত বৈপ্লবিক কাজ করতেন। কেউ বা একেবারে বিপরীত, বিপ্লব থেকে তরুণদের মন অন্যদিকে ঘোরানোই উদ্দেশ্য। ব্রতচারী বা বয় স্কাউট সেকালে এই তালিকাতে ফেলা হত। আর তৃতীয় আর একটি ঘরানা ছিল। নাচ গান কবিতা ইত্যাদি সংস্কৃতিচর্চাই নিরীহ উদ্দেশ্য, তবে তারই আড়ালে কিঞ্চিৎ জাতীয় চেতনা সম্প্রচার। স্বর্ণ আলো জ্বেলে যে ক্লাবটির আমি উদ্বোধন করলাম মনে হয় সেটি এই তৃতীয় পর্যায়ে পড়ে। পয়লা বৈশাখ, আমাদের নতুন জামা হয়েছে। হালকা হলুদ রঙের ফ্রক, কলার আর ঘটি হাতা (আর-এক নাম পাফ হাতা) কচি কলাপাতা রঙের। খুব সুন্দর ম্যাচ হয়েছে। প্রভাতফেরিতে বার হয়েছি, গান হচ্ছে, 'নববর্ষে, নবহর্ষে আয়রে ও ভাই আয়— বাঁধিবি হিয়ায়, অযুত হিয়ায়—'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামে এক কবির সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। পরিচয় হয়েছে কী বলছি তিনি তো পরিবারেরই একজন সদস্য। না, না সে অর্থে নয়, অশরীরী উপস্থিতি। তাঁর গান, কবিতা, নানান লেখার মধ্য দিয়ে বড় হয়ে উঠছি। বাবা সন্ধ্যাবেলা কাজ থেকে ফিরে বসবার ঘরের ছোট অর্গ্যানটির সামনে বসেন। আমি পাশে দাঁড়িয়ে আছি, একটু নার্ভাস। বাবা গান শেখাচ্ছেন— 'তোমারি গেহে পালিছ স্নেহে/ তুমি ধন্য ধন্য হে/ আমারি প্রাণ তোমারি দান/ তুমি ধন্য— ' বাবা উৎসাহ দিচ্ছেন, বেশ

হচ্ছে, আর একটু গলা ছেড়ে গাও। 'পিতার বক্ষে রেখেছ মোরে/ জনম দিয়েছ জননী ক্রোড়ে/ বেঁধেছ সখার প্রণয় ডোরে/ তুমি ধন্য ধন্য হে—' রবীন্দ্রসংগীতের সঙ্গে প্রথম পরিচয়।

নির্জন দুপুরে মা কোলের কাছে নিয়ে বসেন। হাতে সহজ পাঠ, অ, আ, ক, খ শিখছি। 'ছোট খোকা বলে অ আ/ শেখেনি সে কথা কওয়া'।

'বনে থাকে বাঘ/ গাছে থাকে পাখি, জলে থাকে মাছ, ডালে আছে ফল/ পাখি ফল খায়/ পাখা মেলে ওড়ে'— কী আশ্চর্য সব খবর, কত সহজ করে বলা!

একটা খাতায় গোটা গোটা কবিতা লিখেছি। বাবা আবৃত্তি শেখাচ্ছেন। 'এসেছে শরত হিমের পরশ লেগেছে হাওয়ার পরে, সকালবেলায় ঘাসের আগায় শিশিরের রেখা ঝরে...'

তবে আমার খুব প্রিয় কবিতা হল— 'কাল ছিল ডাল খালি/ আজ ফুলে যায় ভরে/ বল দেখি তুই মালী/ হয় সে কেমন করে?' সেই ছেলেবেলায় যেমন আজ এই পরিণত বয়সেও কবিতার এই পঙ্‌ক্তিগুলি আমাকে মুগ্ধ করে।

রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও আমার চারপাশে আরও অনেক স্বজন আমার একাকী বালিকাজীবনে ধীরে ধীরে প্রবেশ করছেন। পাড়াতে অনেক মাসিমা মেসোমশাই পেয়েছি। সমবয়সি ছোট ছেলেমেয়ে বন্ধু হয়েছে। আমাদের বাগানে খেলতে আসে তারা। বাবা ব্যাডমিন্টন কোর্ট বানিয়েছেন, বাবা-মা, পাড়ার বড়রা খেলা করেন। আমাদেরও আছে ছোটদের র‍্যাকেট, আমরাও খেলি।

মনুয়াদি একদিন আমার বয়সি এক ছোট মেয়ের হাত ধরে নিয়ে এল। এই নে তোর জন্য এক বন্ধু নিয়ে এলাম। এর নাম মিনু। মিনুর মা মাসিমা ও তার পরিবার একেবারে পাশের বাড়িতে এসেছেন। তাঁরা বেশ আপন হয়ে পড়লেন। পরকে আপন করা তখনকার দিনে কী সহজ ছিল! মিনুর দুই দাদা আমার নিজের দাদার মতোই। ওদের অনেক ক'জন ভাইবোনের মধ্যে আমিও একজন হয়ে গেলাম।

বাবা আর মা সিনেমা দেখতে যাবেন। ছবির নাম বিদ্যাপতি, অভিনয়ে পাহাড়ি সান্যাল আর কাননবালা। এই সব নাম আমার মনে আছে। কারণ

সিনেমা হল-এ কেনা একটা চটি বই ছিল। কী সুন্দর দেখতে কাননবালা আর সব গানগুলিও ছাপা ছিল। বাবা বললেন, 'বড়দের ছবি। খুকু তোমাকে অন্য ছোটদের সিনেমা দেখাতে নিয়ে যাব।' বাবা কথা রেখেছিলেন। অল্পদিন পরেই আমাকে রবিনহুড দেখাতে নিয়ে গেলেন। সেই থেকে রবিনহুড আমার ছেলেবেলার হিরো। ডাকাতি করে কিন্তু গরিবের সে বন্ধু। শেরউড ফরেস্ট যেন আমার খুব চেনা জায়গা। রবিনহুডের সঙ্গীসাথিরা লিটল জন, উইল স্কার্লেট, ফ্রায়ার টাক আর সুন্দরী ম্যারিয়ান সব যেন জীবন্ত চরিত্র। তবে এই সিনেমা দেখার পর দু'দিন আমার খেলার সঙ্গীরা আমার সঙ্গে আড়ি করে ছিল। আমাদেরই বাগানে সব পাড়ার ছোটরা খেলা করি। 'কেন তুই কাল এলি না, সিনেমা দেখতে গেলি? তোকে খেলায় নেব না।' একটা ক্যানা ফুলের বেড-এর পাশে একা দাঁড়িয়ে আছি, চোখে জল। মনে হয় পরে বড়দের হস্তক্ষেপে স্যাংশন তুলে নেওয়া হল।

ছেলেবেলায় খুব অসুখে ভুগতাম। ডাকঘরের অমল-এর মতো বিছানায় শুয়ে জীবন কাটাই। চিকিৎসার ব্যাপারে বাবা আর মায়ের মধ্যে মতভেদ হয়। মা যদি বলেন, সেজ ঠাকুরপোকে (অর্থাৎ আমার শিশু চিকিৎসক সেজকাকা ডা. ক্ষীরোদচন্দ্র চৌধুরী) খবর দিই। বাবা বলেন, দাঁড়াও কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থকে ডেকে আনি। আবার মা যদি কবিরাজ মশাইকে চান বাবা বলেন, ক্ষীরু আগে দেখুক। আমার জীবন কখনও ডাক্তারি মিকশ্চার, কখনও কবিরাজি পাঁচন খেয়ে কেটে যায়। হয়তো কিশোরগঞ্জ থেকে ছোটপিসিমা এসেছেন সঙ্গে ছেলেমেয়েরা, বাড়িতে খাওয়াদাওয়া চলছে। আমার বিছানার নীচে ঝুড়ি ভরতি আম। আমার কোনও হেলদোল নেই। ছোটপিসিমা বলেন, মেয়েটা কী নিস্পৃহ।

জন্মদিন আসছে সামনে। মা বলেন এবার একটা সুন্দর ফ্রক কিনব। বাবা ঠিক করে ফেলেছেন একটা গ্লোব উপহার দেওয়া হবে। ফ্রক না গ্লোব বিতর্কের মধ্যে আমরা নিউ মার্কেটে চলে যাই। আমার যা পছন্দ তাই হবে। কিন্তু আমি নিস্পৃহ। সেকালের ঝলমলে নিউ মার্কেট। দু'ধারে দোকান, থরে থরে সাজানো খেলনা, জামাকাপড়। বড় হয়ে বুঝেছিলাম এই উপহার বিতর্ক আসলে গুরুতর কিছু নয়। তখন শাড়ি পরি। নিউ মার্কেটে ঢুকেই ডান হাতে গ্ল্যামার দোকান। পিংক শাড়ি না সাদা তর্ক

হলে আমি জন্মদিনে মায়ের পছন্দে হ্যাঁ বলি আর পুজোতে বাবার পছন্দ। তর্কের খাতিরে মাঝেমাঝে দুটো শাড়িই লাভ হয়ে যায়! ছেলেবেলায় কিন্তু বিতর্কের প্রভাবে আমি অন্তর্মুখী ও উদাসীন হয়ে পড়তাম।

স্কুলে যাবার বয়স হয়েছে কিন্তু বাবা ও মেজকাকা সিদ্ধান্ত নিলেন আমাদের পড়াবার মতো উপযুক্ত স্কুল বা প্রকৃত শিক্ষার পাঠক্রম পাওয়া যাচ্ছে না। মার খুব ইচ্ছে আমি লরেটোতে পড়ি, আমার বড়মাসির মেয়েরা পড়ে। তারা ফর্‌ফর্‌ করে কেমন ইংরেজি বলে। বাবার বিলেতি স্কুলে আপত্তি। অতএব আমি আর মেজকাকার দুই পুত্র ধ্রুবনারায়ণ ও কীর্তিনারায়ণ বাড়িতেই পড়াশুনো করব স্থির হল। আমার দিক থেকে বিবেচনা করলে বাবা এক মস্ত ভুল সিদ্ধান্ত নিলেন। একেই তো একমাত্র সন্তান তার উপর স্কুলে গেলে যদিও বা বন্ধুবান্ধব হত তাও হল না। 'ওনলি চাইল্ড'দের নানারকম সমস্যা থাকে। তারা একধরনের নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে, সপ্রতিভভাবে মিশতে পারে না লোকজনের সঙ্গে, লাজুক, মুখচোরা, অন্তর্মুখী হয়ে থাকে। শুনেছি ইন্দিরা গাঁধীরও এই সমস্যা ছিল। অবশ্য পরবর্তী জীবনে তিনি বদলে গিয়েছিলেন। দোর্দণ্ডপ্রতাপ প্রধানমন্ত্রী। তাঁর ভয়ে সকলে তটস্থ। আমি রয়ে গেলাম চিরদিনের মতো নিজের মধ্যে গুটিয়ে থাকা একজন। পরবর্তী জীবনে খোলস থেকে বেরিয়ে এসে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে মানিয়ে চলার জন্য সচেতনভাবে চেষ্টা করতে হয়েছে। সব সময়ে সফল হয়েছি এমন নয়।

ধ্রুব, কীর্তিরা তবু তিন ভাই। মেজকাকা যখন খুব ব্যস্ত হয়ে পড়লেন তখন ওদের জন্য প্রাইভেট টিউটর রাখতে হল। আমি বড় হয়ে উঠছি আপন মনে। আমার একমাত্র সঙ্গী বাড়ি ভরতি বই। তা ছাড়া আমার জন্য বাবা কিনে আনেন অনেক বই। 'টুকটুকে রামায়ণ' ছোটদের রামায়ণ পড়ে আমার মুখস্থ। ছোটদের মহাভারত পড়ছি গদ্যে। কিন্তু মুখস্থ করে ফেলেছি। ইন্দু জ্যাঠাইমা বলেন, ও রে বনপর্বটা একটু শুনিয়ে দে। অমনি গড়গড় করে মুখস্থ বলে যাই। তবে আমার প্রিয় বই বাংলায় লেখা 'রবিনহুড'। আমি বারবার পড়ি। তখন আমি আর ডোভার লেন-এ থাকি না, শেরউড ফরেস্ট-এ থাকি। বিকেলবেলা পাড়ার বন্ধুদের সঙ্গে 'রবিনহুড, রবিনহুড' খেলা করি। রবিনহুড-এর চরিত্রটা আমি নিজের জন্য রাখি। বাবলু খুব

মোটা, ফ্রায়ার টাক হয়। টুটু আমাদের মধ্যে লম্বা, ও হয় লিটল জন।

কিন্তু রামায়ণ মহাভারত আমার মনে বেশ প্রভাব ফেলেছে। তা ছাড়া ইন্দু জ্যাঠাইমার ঠাকুরঘরের নাড়ুগোপাল আমার মনে জিজ্ঞাসা জাগিয়েছে। জ্যাঠাইমা তাকে চান করান, জামা পরান, ছোট ছোট থালায় বাতাসা খেতে দেন। আমি বাবাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা বাবা ঈশ্বর কি সত্যি আছেন? আমাদের ৭/২ ডোভার লেনের বাড়ির পিছনের খোলা উঠোন। সন্ধ্যার বাতাস বইছে। মাথার ওপর আকাশ ভরা তারা। বাবা চেয়ারে বসে আছেন। বাবা বললেন, 'আমি ঈশ্বর মানি না। তাই আমি মনে করি ঈশ্বর নেই। কিন্তু আমাদের দেশে অনেক মহাপুরুষ জন্মেছেন, তাঁরা বলে গেছেন ঈশ্বর আছেন। তাঁরা শ্রদ্ধেয়, মিথ্যা বলার মানুষ নন। তাই এই প্রশ্নের জবাব তুমি যখন বড় হবে তখন নিজেকেই খুঁজে বার করতে হবে।'

ছোট একটু বাসাবদল হল। আমরা ৭/২ থেকে ৭/১ ডোভার লেনে এলাম। সে বাড়িতে আমার স্টাডি বলে যে ঘরটি ঠিক হল তার জানালা দিয়ে দেখা যায় সিংহি পার্কের বড় বড় গাছপালার শাখাপ্রশাখা হাওয়ায় দুলছে, তার উপরে নীল আকাশ। ঈশ্বর কি নীল আকাশের কোণে কোথাও আছেন?

বাবা অনেক জাতকের গল্প এনে দিলেন। তার মধ্যে আমার জিজ্ঞাসার উত্তর আমি পেয়ে গেলাম। মানুষের কেন এত দুঃখ, শোক, তাপ রাজকুমার সিদ্ধার্থ প্রশ্নের জবাব খুঁজছেন। তার বোধি লাভ হল। জন্মগ্রহণ করলে সুখদুঃখ অনিবার্য, গৌতম বুদ্ধ মহানির্বাণ লাভের কথা বললেন। বসবার ঘরের কাচের সুদৃশ্য আলমারিতে একটি ছোট পিতলের বুদ্ধমূর্তি ছিল। আমি সেই মূর্তি আমার স্টাডিতে কুলুঙ্গিতে বসালাম, আর একটি প্রদীপ আর দু'-চারটি জিনিস জোগাড় করে আসন সাজালাম। আমাদের বাড়িতে কোথাও কোনও ঠাকুরের আসন ছিল না। অনেক মধ্যবিত্ত বাঙালি বাড়িতে অন্তত লক্ষ্মীর আসন থাকে, তাও নেই। বাবা ঈশ্বর-বিশ্বাসী নন সে একটা কারণ হতে পারে। নয়তো ঠাকুরমার দিক থেকে ব্রাহ্ম প্রভাব ছিল সেও কারণ হওয়া বিচিত্র নয়। আমার বুদ্ধবন্দনা সেই প্রথা ভঙ্গ করল। আমি বেশ কিছুদিন মনে মনে বৌদ্ধ ছিলাম। আমার সেই বৌদ্ধ যুগেই পুজোর ছুটিতে রাজগীর বেড়াতে যাওয়া হল। চারিদিকে পাহাড়ে

ঘেরা সুন্দর রাজগৃহ, অজাতশত্রুর রাজধানী। আর রবীন্দ্রনাথের শ্রীমতী নামে সে দাসীর কাহিনি তখন জানা হয়ে গেছে। রাজ আজ্ঞা অবহেলা করে বুদ্ধদেবের আরতি দিয়ে সে আত্মোৎসর্গ করল।

পুজোর ছুটির কথা যদি বলতেই হয় তবে বলব ছেলেবেলার জীবন যেন নানা রঙের পুজোর ছুটিতে ভাগ হয়ে আছে। পুজোর ছুটি মানেই ট্রাংক, সুটকেস, হোল্ডঅল, বাসনকোসন সবকিছু নিয়ে মাসখানেকের মতো কলকাতার বাইরে হাওয়াবদল করতে যাওয়া। অনেক সময়ে দল বেঁধে যাওয়া হয়, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন যোগ দেন।

প্রথম যে পুজোর ছুটিতে গালুডি যাওয়া হয়েছিল, তা আমার স্মৃতিতে নেই বললেই চলে। কিন্তু এই গালুডি ভ্রমণের সঙ্গে পারিবারিক বন্ধু সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর কথা জড়িত বলে এই ভ্রমণের কথা এত শুনেছি যে মনে হয় হয়তো সত্যি স্মৃতিতে আছে। তবে একটা ছোট্ট দৃশ্য আমার মনে গেঁথে আছে। একটা গোরুর গাড়ির গোরু দুটো হঠাৎ দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটতে শুরু করেছে। গাড়িটা একদিকে টাল খেয়ে হেলে হেলে পড়েছে। গাড়ি থেকে ছিটকে পড়ে যাচ্ছে কাপ, ডিশ, খাবারদাবার। পরে জেনেছি দূরের কোনও পাহাড়ে বনভোজনে যাওয়া হয়েছিল। পাহাড়ের ওপরে বুনো হাতির পদচিহ্ন ভাঙা ডালপালা দেখে সবাই খুব উত্তেজিত। বিকেলের দিকে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে বিভূতিবাবু কথিত কলসিবাংলার বউদিদি ও তাঁর পরিবার বনভোজনে যোগ দিতে এসেছিলেন। তখনই এই বিপত্তি। গাড়োয়ান বললে গোরু বাঘের গায়ের গন্ধ পেয়েছে তাই খুব ভয় পেয়ে গেছে। বাঘের গন্ধ পাওয়া গেছে শুনে সদলবলে বাড়ির পথ ধরা হয়েছিল।

এরপর বিন্ধ্যাচল। সঙ্গে গেলেন বাবার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ফণীভূষণ চক্রবর্তী। তিনি প্রথমে নামকরা উকিল তারপর কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি এবং প্রধান বিচারপতি। পরে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালও হয়েছিলেন। এসব অনেক পরের কথা। সেবার আমাদের বিন্ধ্যাচল ভ্রমণ আমার জন্য মাঝপথে বাতিল করে ফিরে আসতে হয়েছিল। পাহাড়ের উপর মন্দির চত্বরে ছুটোছুটি করতে গিয়ে আমি পড়ে যাই। পা কেটে গভীর ক্ষত, সঙ্গে ধুম জ্বর। ফণীকাকা আমাকে ভুলিয়ে রাখার জন্য কবিতা লিখলেন, 'পথে

যেতে যেতে পা-টা গেল কেটে।' সেই বোধহয় আমার প্রথম পড়ে যাওয়া। এরপর সারাজীবন আক্ষরিক অর্থেই আমার বহুবার পদস্খলন ঘটেছে।

মাঝে একবার রাঁচি। এরপর যাওয়া হল দেওঘর, বৈদ্যনাথ ধাম। এবার মস্ত বড় দল। হেম জ্যাঠামশাই সপরিবার আছেন। তাই অনেক দাদা-দিদি। গান জমেছে খুব, রোজ এদিক ওদিক বেড়াতে যাওয়া। একদিন যাওয়া হবে বৈদ্যনাথ মন্দিরে পুজো দিতে। মা কেডস জুতো পরাতে পরাতে বললেন, জানো তো শিবের মন্দিরে গেলে প্রার্থনা করবে— আমার যেন শিবের মতো বর হয়— মনে থাকবে?

আমি ঘাড় কাত করে সম্মতি জানাই। আমার শুধু মনে আছে জলে ভেজা মেঝে, তাতে গোলাপফুলের পাপড়ি ছড়ানো। আমি মাথা ঠেকিয়ে প্রার্থনা উচ্চারণ করলাম। দাদা-দিদিরা পরে আমাকে খেপিয়েছিলেন, হ্যাঁরে শিবের কাছে কী চাইলি? আমি কিন্তু খুব মন থেকে বিশ্বাস করে প্রার্থনা করেছিলাম। ঈশ্বরের তো মন বুঝতে পারা ভার, inscrutable are thy ways— কোনও প্রার্থনা শোনেন, কোনও প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করেন। আমার কেমন মনে হয় আমার বালিকা বয়সের সেই পবিত্র প্রার্থনা তিনি শুনেছিলেন। আর বলেছিলেন, তথাস্তু!

কাঞ্চনজঙ্ঘার সঙ্গে পরিচয় এক অভিজ্ঞতা। ঝলমল করছে বরফে ঢাকা পর্বতশ্রেণি। কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়ায় সূর্যাস্তের লালচে আভা এসে স্পর্শ করল। মুহূর্তের মধ্যে সেই রং ছড়িয়ে পড়ল আশেপাশের সব বরফে ঢাকা চূড়ায়। সেদিকে চেয়ে বাবা বললেন, 'পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ একী সন্ন্যাসী, বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে।' দার্জিলিঙের কথা আমার বেশ স্পষ্ট মনে আছে যদিও সালটা ১৯৩৮, আমার বয়স ডিসেম্বরে হবে মাত্র আট। দার্জিলিং পাহাড়ে এবার পুজোর ছুটিতে যাওয়া হবে শুনে আমার মনে বেশ চিন্তা হয়েছিল মোটর গাড়ি কী করে পাহাড়ে উঠবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গাড়ি এসে থামল রিট্রিট কটেজের গেটে। রিট্রিট কটেজ ভারী সুন্দর ছিল। কাচে ঘেরা গোল বসবার ঘর। বাগানে রংবেরঙের ফুল। সেই বাগানে দাঁড়িয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘার সঙ্গে প্রথম আলাপ। তারপর বারবার ফিরে এসেছি কখনও দার্জিলিং, কখনও ঘুম-এ বালাক্লাভা বাড়িতে, কখনও বা কার্শিয়াং-এর গিধা পাহাড়ে। পরবর্তীকালে অনেক সুন্দর পাহাড়ি

বাবা-মার সঙ্গে ১৯৩৫

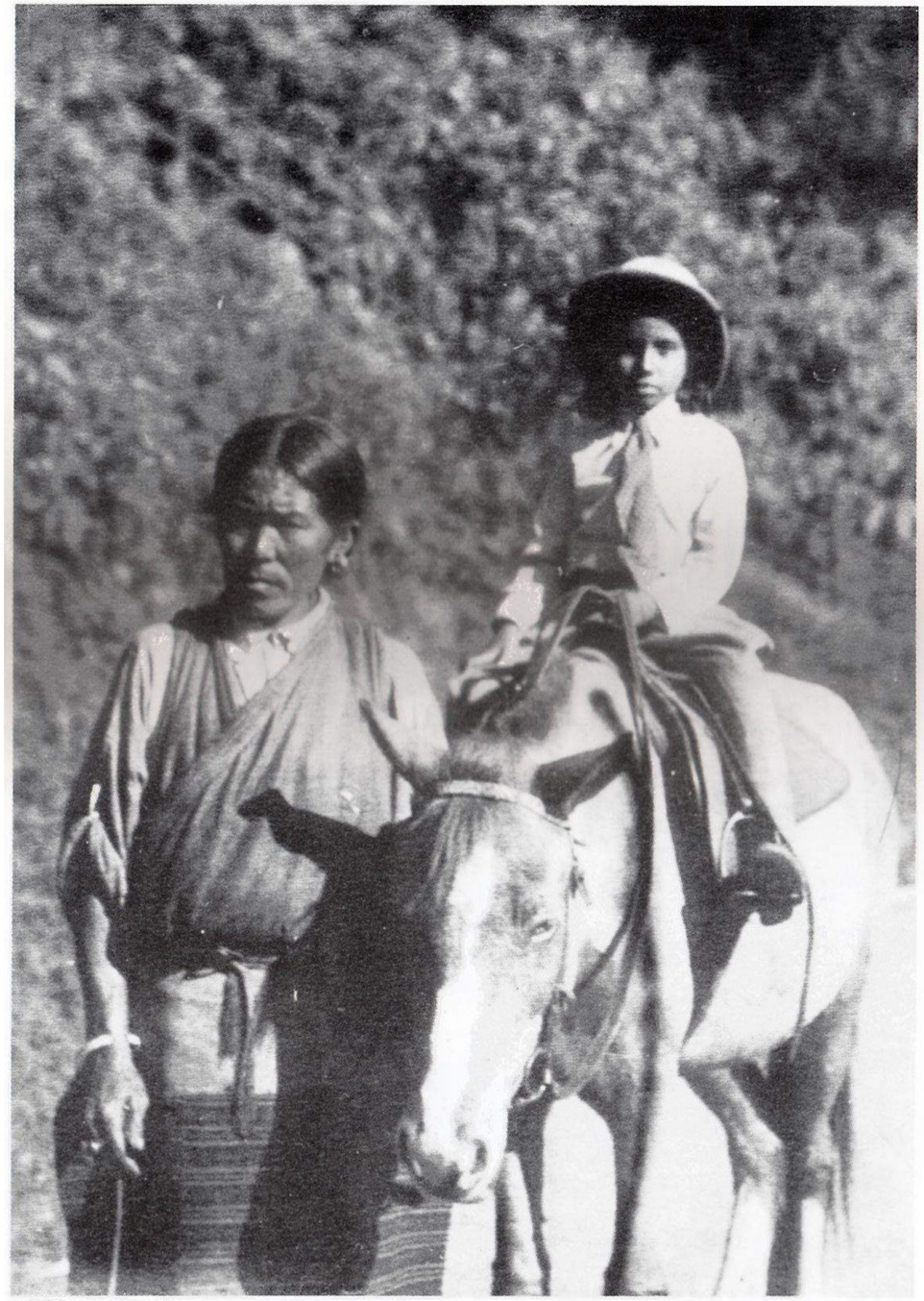

দার্জিলিঙে পনি রাইড

চৌধুরী পরিবার ১৯৪২

ফরেস্ট বাংলো: হিমালয়ে ট্রেকিং

মিহিজামের বাড়িতে

বেণুবন মিহিজাম

কাশ্মীর: পহালগাম

দিল্লির পথে সাইকেলে

তেনজিং ও বাবা, দার্জিলিং

দুর্ভিক্ষ

কলকাতায় দাঙ্গা

কলেজ ছাত্রী

ব্রিটিশ কাউন্সিলে আড্ডা

সেতার শেখা

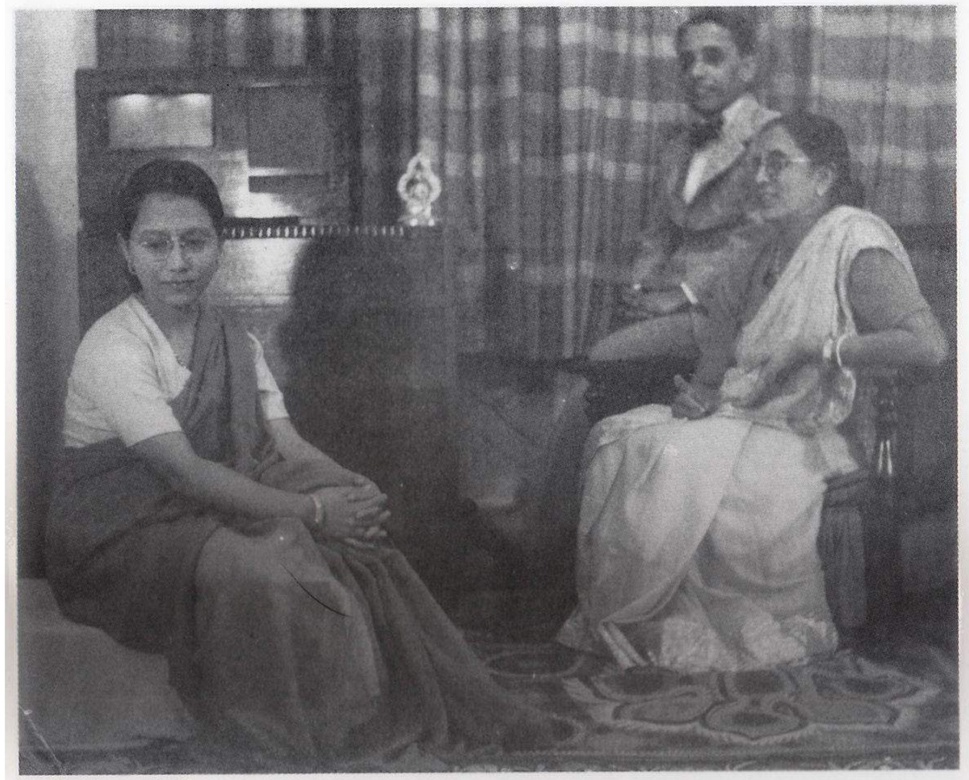

রাসবিহারী অ্যাভিনিউ বসবার ঘরে

আন্ট অ্যানা ও ফুলমামা

সুনীল জানার গৃহে

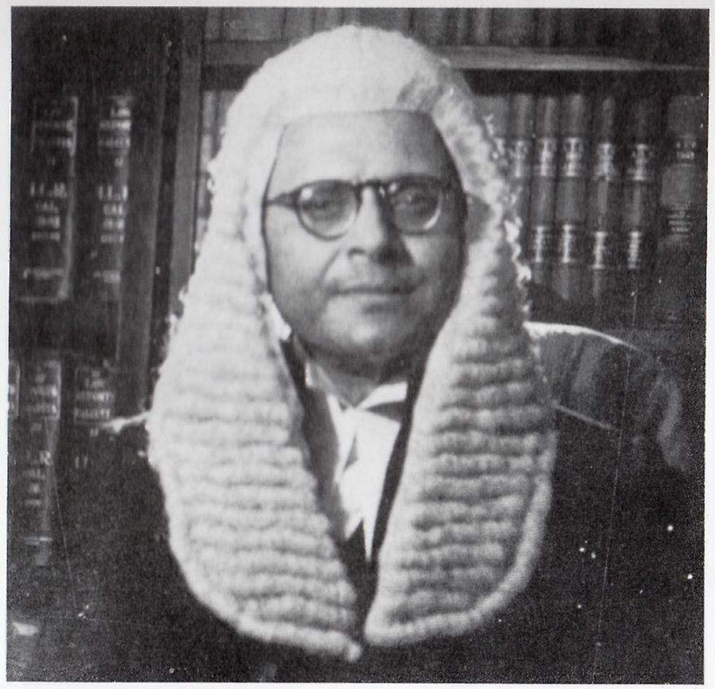

লেখিকার ক্যামেরায় ফণীভূষণ চক্রবর্তী

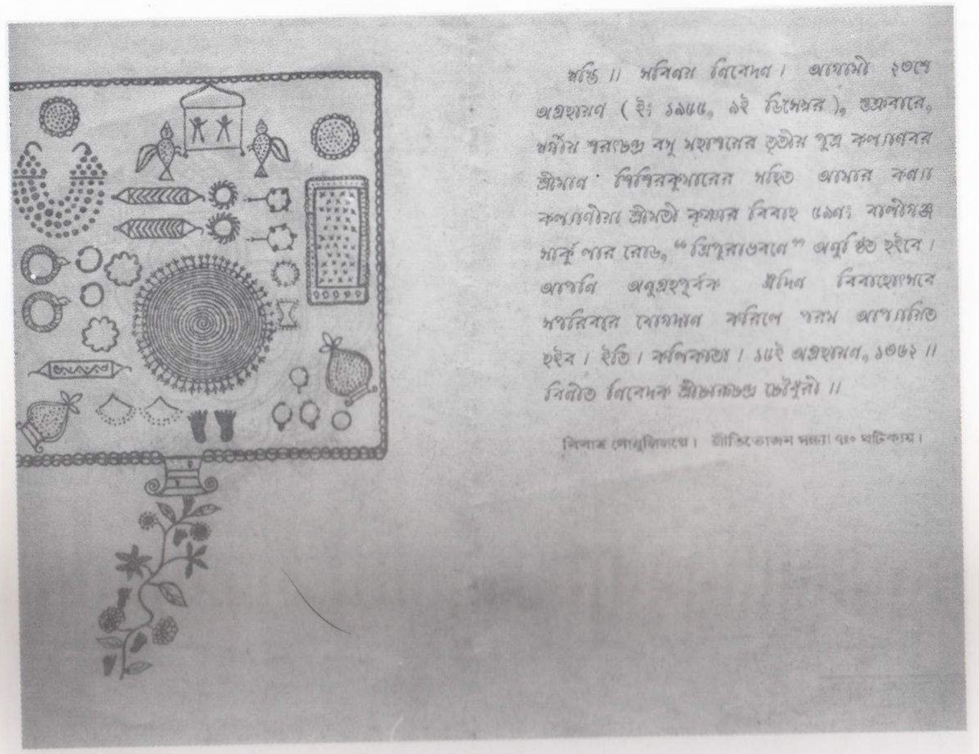

স্বস্তি ।। সবিনয় নিবেদন। আগামী ২৩শে অগ্রহায়ণ (ইং ১৯৫৫, ৯ই ডিসেম্বর), শুক্রবারে, স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র বসু মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র কল্যাণবর শ্রীমান শিশিরকুমারের সহিত আমার কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী কৃষ্ণার বিবাহ ৫৯এ, বালীগঞ্জ সার্কুলার রোড, "ত্রিপুরাভবনে" অনুষ্ঠিত হইবে। আপনি অনুগ্রহপূর্বক ঐদিন বিবাহোৎসবে সপরিবারে যোগদান করিলে পরম আপ্যায়িত হইব। ইতি। কলিকাতা। ১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৬২ ।। বিনীত নিবেদক শ্রীচারুচন্দ্র চৌধুরী ।।

বিবাহ গোধূলিলগ্নে। [illegible] ৭।০ ঘটিকায়।

নিমন্ত্রণ পত্র

শুভদৃষ্টি

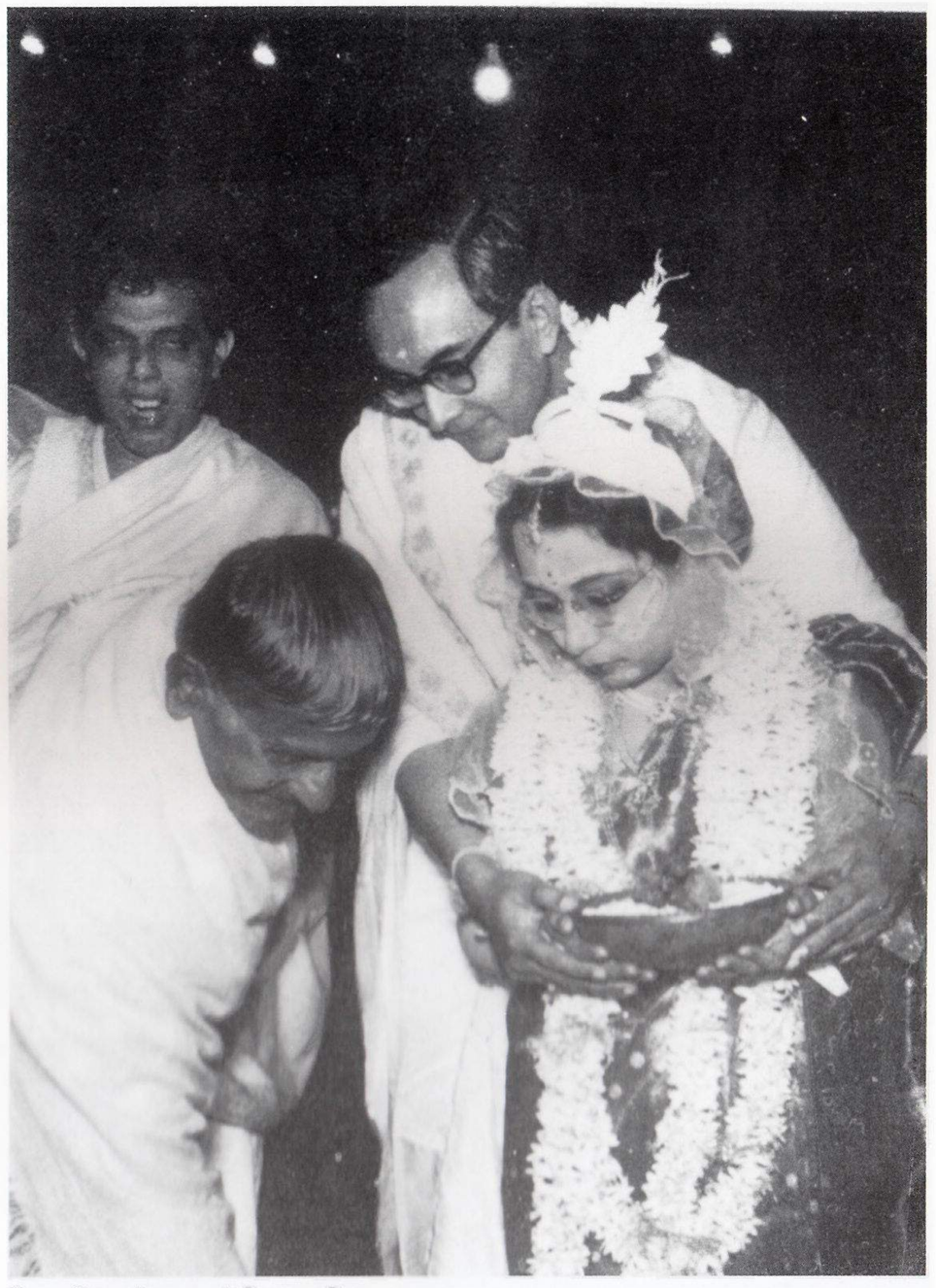

বিবাহ: পিছনে দাঁড়ানো গৌরীনাথ শাস্ত্রী

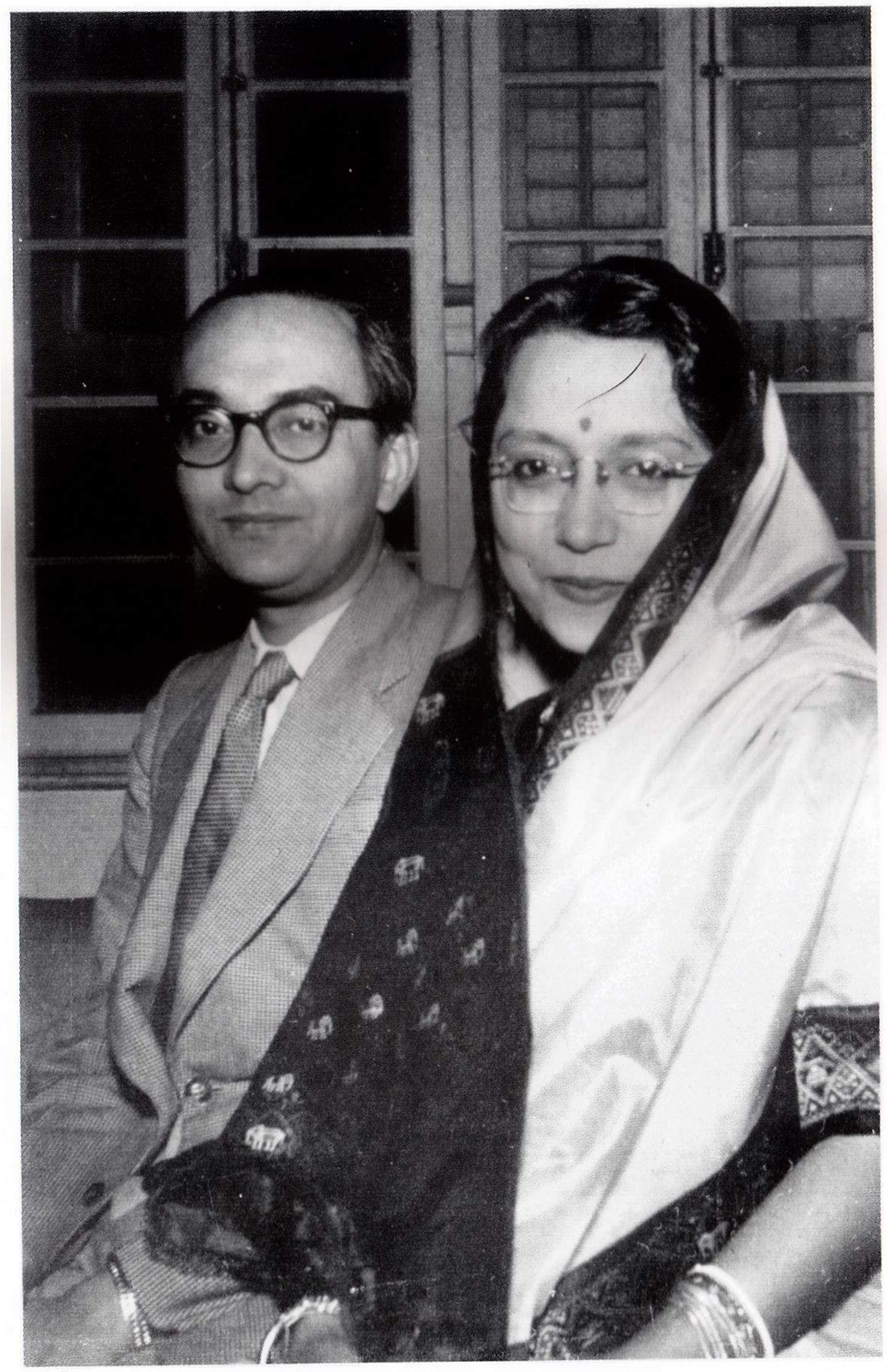

দম্পতি

শহর দেখেছি ইউরোপে। কিন্তু সুইজারল্যান্ড এমনকী কাশ্মীরের পরেও হিমালয়ের এই দার্জিলিং এলাকা রয়ে গেছে আমার সবচেয়ে প্রিয়।

এবার দলবল নিয়ে আসা হয়নি। কিন্তু ফণীকাকা অর্থাৎ ফণীভূষণ চক্রবর্তী আছেন কাছেই সেন্ট্রাল হোটেলে। ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলা চলছে। ফণীকাকা ভাওয়ালের রানির পক্ষে আইনজীবী। রানি বিশ্বাস করেন না যে-সন্ন্যাসী নিজেকে ভাওয়ালের কুমার বলে দাবি করছেন তিনি তাঁর স্বামী। রানির দৃঢ় বিশ্বাস সে রাত্রে তাঁর স্বামীর মৃত্যু হয়েছিল এবং তাঁকে দার্জিলিঙের শ্মশানে রাত্রেই দাহ করা হয়। সন্ন্যাসী দাবি করছেন, ঝড়বৃষ্টির কারণে দাহকারীরা দেহ ফেলে চলে যান। তিনি জ্ঞান ফিরে পান, অজ্ঞাতপরিচয় সন্ন্যাসীরা তাঁকে তাঁদের দলে আশ্রয় দেন। স্মৃতিভ্রষ্ট কুমার ধীরে ধীরে স্মৃতি ফিরে পান। বারো বৎসর বাদে তিনি ফিরে এসেছেন। ঘটনাস্থল দার্জিলিং বলে উভয়পক্ষের আইনজীবীরা তদন্ত করছেন। সেই কাজে ফণীকাকা এসেছেন।

সেই ছেলেবেলায় আমি অত কিছু বুঝিনি। কিন্তু আমার স্মৃতিতে আছে কে যেন হারিয়ে গিয়েছিল আবার ফিরে এসেছে। তাকে নিয়ে বড়দের মধ্যে খুব তর্কবিতর্ক হয়। আমার দাদু ললিত রায়ের সঙ্গে বাবার প্রায়ই তর্ক বেঁধে যেত। ফণীকাকার প্রভাবে বাবা ছিলেন রানির পক্ষে। আর দাদুর সমর্থন সন্ন্যাসীর প্রতি। দু'জনেই যাঁর যাঁর মতে অবিচল।

রিট্রিট কটেজ বাড়ির পাশেই বড় বাংলোতে আছেন এক জজসাহেব। মুসলমান পরিবার। আমাদের 'নাসতা' খেতে নেমন্তন্ন করেন মাঝেমাঝে। ম্যালে আমি ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়াই। খুব ভাল লাগে। ম্যাল-এর রাস্তা, চারপাশে দোকান-পাট খুব ঝকঝক করে। একটু সাহেবি সাহেবি গন্ধ চারিদিকে। পাহাড়ের মানুষেরাও খুব ভাল, অনেক কাঞ্চা-কাঞ্চির সঙ্গে ভাব হয়।

বাইরের পৃথিবীতে কী ঘটছে আমি খুব সচেতন নই। কিন্তু পুজোর ছুটিতে দার্জিলিং এসেছি। ঠিক তার পরের বছর তো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেঁধে গেল। কলকাতার বাড়িতে একদিন মাটিতে পা ছড়িয়ে বসে পুতুল খেলছি বাবা আর বড়রা খুব উত্তেজিত ভাবে বলাবলি করছেন— ইংল্যান্ড ওয়ার ডিক্লেয়ার করেছে। ইংল্যান্ড যুদ্ধ ঘোষণা করেছে তার মানে ঠিক কী

তখনও ভাল বুঝে উঠতে পারিনি। পরের দিকে ব্যাপারটা অনেক পরিষ্কার হয়ে গেল।

পরের পুজোর ছুটিতে রয়েছি পুরীতে। একেবারে সমুদ্রতীরে অসীমাবাস নামে এক বাড়িতে। প্রথম সমুদ্র দেখার অনুভূতি ভারী আশ্চর্য। বিশাল সমুদ্র, বিরাট ঢেউ উঁচু হয়ে উঠে গোল মতো হয়ে বালির উপর আছড়ে পড়ল। আমি বললাম ঠিক আমাদের হোল্ডঅল-এর মতো। আমাদের হালকা সবুজ রঙের হোল্ডঅল তাতে বিছানা বেঁধে গোল মতো হয়ে যেত। আজকাল ও বস্তু আর চোখে পড়ে না। তবে সমুদ্রের ঢেউ-এর সঙ্গে উপমাটা একটু আধুনিক কবিতার মতো হয়ে গেল।

সেবার সঙ্গে আছেন মেজকাকা নীরদচন্দ্র সপরিবার। কিছুদিন বাদে ছোটকাকা বিনোদচন্দ্র এসে যোগ দিলেন। আমি আর দুই ভাই ধ্রুব ও কীর্তি সারাদিন বালুকাবেলায় খেলা করি। আমরা যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলি। ততদিনে যুদ্ধ আমাদের জীবনের একটা অঙ্গে পরিণত হয়েছে। যুদ্ধে দুটো দল আছে। একদল হল অ্যালায়েজ (allies) আর অন্য দলকে বলা হয় অ্যাকসিস (axis)।

কিছুদিন আগে আমাদের জন্য খেলনা কেনা হয়েছিল। দুই ভাইয়ের দুটো এয়ার গান, আমার জন্য ডল্‌জ হাউস। আমার দোতলা পুতুলের বাড়ি, ভারী চমৎকার। শোবার ঘর, খাবার ঘর, বসার ঘর সব আছে। কিন্তু যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলাতে একটা এয়ার গান কম পড়ছে। ফলে দরজার একটা খিল ব্যবহার করতে হয়।

আমি আর ধ্রুব অ্যালায়েজ হই আর কীর্তিকে করে দেওয়া হয় অ্যাকসিস। আমরা রোজই 'গুড়ুম' করে বলি, তুমি মরে গেছ। কীর্তি একদিন ঘোষণা করলে সে কিছুতেই মরবে না। অতঃপর খিল নিয়ে ধ্রুবকে তাড়া করে খিল দিয়ে এক ঘা বসিয়ে দিলে। কান্নাকাটি শুনে বড়রা বাইরে হাজির। মেজকাকা শাস্তি ঘোষণা করলেন, কীর্তি ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে রইল আর তার দুপুরের খাওয়া বন্ধ। আমরা সবাই খেতে বসেছি। সমুদ্রের মাছ, নানারকম পদ। কীর্তির জন্য আমার চোখে জল আসছে। মা আর কাকিমা ভয়ে মেজকাকাকে শাস্তি মকুব করতে বলতে পারছেন না। এমন সময় বাবার পায়ের শব্দ শোনা গেল। চারিদিকে চেয়ে বাবা জিজ্ঞাসা করলেন,

কী ব্যাপার! ঘটনা শুনে বাবা বললেন, ঠিক আছে কীর্তি আর কখনও এ রকম করবে না, এসো আমার সঙ্গে খেতে বসো। দাদা কিছু বললে তার উপর মেজকাকা কোনও কথা বলতে পারেন না।

দেশের মানুষ চান এই যুদ্ধে ইংরেজের পরাজয় হোক। আমরা পরাধীন জাতি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পতন চাইব এ তো স্বাভাবিক। যুদ্ধের প্রথম দিকে জার্মানরা হইহই করে জিতছে, জাতীয়তাবাদী ভারত উল্লসিত। আমাদের এক আত্মীয় শুনেছি হিটলার-এর নাম শুনলেই 'নারায়ণ, নারায়ণ' বলে উঠতেন। অর্থাৎ ভারতবাসীকে উদ্ধারের জন্য নারায়ণ আবির্ভূত হয়েছেন। নাৎসি অত্যাচারের কাহিনি তখনও এ দেশে বিশেষ প্রচারিত হয়নি। বরং তরুণ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উপর অত্যাচার, তাদের ফাঁসিকাঠে জীবন উৎসর্গ ভারতীয় জনমানসে ঢের বেশি সত্য।

ভারতীয়দের বিশেষত বাঙালিদের এই মানসিকতার মধ্যে মেজকাকা নীরদচন্দ্র ছিলেন মূর্তিমান ছন্দপতন। মিলিটারি স্ট্যাটিসটিকস নিয়ে পড়াশুনো করে তিনি সিদ্ধান্তে এসেছিলেন এই যুদ্ধে ইংরেজের জয় অবশ্যম্ভাবী। তাঁর মতের প্রচণ্ড বিরোধিতা তাঁকে আরও ক্ষিপ্ত করে তুলত। আবার অন্যদের খেপিয়ে তিনি বেশ আত্মপ্রসাদ লাভ করতেন। তাঁর চক্রবেড়িয়া রোডের বাড়ির স্টাডিতে এক বেশ বড় চার্চিলের ছবি রাখলেন। সকলের ছি ছি শুনে উনি বেশ খুশি। পরিবারের অন্য সকলেরই ভিন্নমত। কিন্তু একটা কথা বলব এই মতভেদ পারিবারিক সম্পর্কে কোনও ছায়াপাত করেনি। বাবা বলেন প্রশ্রয়ের সুরে, নীরু একটু খামখেয়ালি। তবে ওর লেখা জোরালো, যা বিশ্বাস করে জোর গলায় বলে। সেজকাকা ক্ষীরোদচন্দ্র যখন মেজদার কোনও মন্তব্যে বিরক্ত হন তখন মেজদা না বলে বলেন, 'আজ মেজবাবু তো এই কথা বলেছেন।' বন্ধুবান্ধবের মধ্যে যাঁরা নীরদচন্দ্রের মতের বিরোধিতা করবার সাহস দেখিয়েছেন তাঁদের কিন্তু বন্ধুবিচ্ছেদ হয়ে গেছে।

আমার ছেলেবেলার এক অভিজ্ঞতা মেজকাকার এই ইংরেজপ্রীতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে। খেলার মাঠ থেকে একদিন হাপুস নয়নে কাঁদতে কাঁদতে বাড়িতে ফিরলাম। বাবা-মা জিজ্ঞাসা করছেন, কী হয়েছে। কিছু বলি

না। তারপর ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলি— টুটু আমাকে প্রো-ব্রিটিশ বলেছে। টুটু আমার খেলার সাথি। প্রো-ব্রিটিশ বলতে আমার খুব অপমান বোধ হয়েছে। সে বলেছে, তোর কাকা রেডিয়োতে ইংরেজের পক্ষে বক্তৃতা করে, তুই প্রো-ব্রিটিশ। বাবা হেসে ফেললেন। টুটুর দাদা তো রয়েল এয়ারফোর্সের পাইলট, ইংরেজের হয়ে যুদ্ধ করে, তার বেলা? আমি অতশত বুঝি না। আমি মনেপ্রাণে জাতীয়তাবাদী, আমার মনে আঘাত লেগেছে।

আমাদের দৈনন্দিন জীবন যেমন চলে তেমনি চলছে। কিন্তু চারপাশে এক যুদ্ধের আবহ গড়ে উঠছে। তার খণ্ড খণ্ড ছবি মনের মধ্যে গেঁথে আছে। অন্য আর একদিনের অভিজ্ঞতা। খেলার মাঠে খেলছি, বাড়ি থেকে ডাকতে এল। 'বাড়ি চলো বাবা ডাকছেন।'

'যাচ্ছি-ই, আর পাঁচ মিনিট।'

বাড়িতে ঢুকে দেখি বাবা গম্ভীর মুখে বসে আছেন। এই রে, বোধ হয় দেরি করে ফেলেছি, পড়তে বসার সময় হয়ে গেছে। আমাকে দেখে বাবা বললেন, 'খুকু, প্যারিস ফল করেছে।' ওহ। এই কথা! সেকালের প্যারিস ছিল আর্ট ও কালচারের প্রতীক। বর্বর সেনাবাহিনী প্রবেশ করেছে, সভ্যতার উপর আঘাত নেমে আসবে, হয়তো তছনছ হয়ে যাবে সব এমনি আশঙ্কা।

ডোভার লেনের পাড়ার জীবনে কোনও ছন্দপতন হয়নি। হিন্দুস্থান সংঘের অনুষ্ঠান হয় মাঝেমাঝেই। আমি নাচের দলে আছি। রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে নাচ— 'মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে তাতা থৈ থৈ তা তা থৈ থৈ...'। 'ও চাঁদ তোমায় দোলা দেবে কে' গানের সঙ্গে নাচ বিশেষভাবে মনে আছে কারণ ভুল করে চশমা-চোখে স্টেজে ঢুকে পড়েছিলাম। নাচ শেষ হওয়ার আগে বুঝতেই পারিনি। দাদা-দিদিদের কাছে মৃদু বকুনি খেলাম।

আমার খুব ছেলেবেলায় চোখ খারাপ আর চশমা। শ্যামবাজারে গ্রে স্ট্রিটে মেজকাকার বাড়ি, তার উলটো দিকে একটা টাওয়ারওয়ালা বাড়ি, টাওয়ারে রয়েছে গোল ঘড়ি। এই লেখা লিখবার সময়েও একদিন গাড়িতে যেতে চোখে পড়ল বাড়ি দুটো তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। মুখোমুখি। তবে টাওয়ারের ঘড়িটা অচল।

মেজকাকিমা একদিন বললেন— ওরে, দ্যাখতো টাওয়ারের ঘড়িতে ক'টা বাজল। আমি ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে ঘড়িতে ক'টা বেজেছে দেখতে পেলাম না। মেজকাকিমা হুলুস্থুল লাগিয়ে দিলেন— ওর চোখ খারাপ। ডাক্তারের কাছে একটা অন্ধকার মতো চেম্বারে নিয়ে যাওয়া হল। মায়োপিয়া ধরা পড়ল একেবারে তিন আর সাড়ে তিন। আমার বিবাহের পর ডা. বলাই মিত্র একদিন চোখ দেখতে দেখতে বললেন— আপনার এত পাওয়ার! ছেলেমেয়েদেরও হবে। হাসতে হাসতে বললেন, আগে জানলে শিশিরদাকে বিয়ে করতে মানা করতাম। তা আমার তিন ছেলেমেয়েই ছোটবেলা থেকে চশমাধারী।

পুজোর সময়ে হিন্দুস্থান সংঘে ছোটদের নাটক হবে। রবীন্দ্রনাথ আর ঠাকুরবাড়ি ছাড়া গতি নেই। অবনীন্দ্রনাথের রাজকাহিনী থেকে গল্প বেছে নেওয়া হল। আমাকে দেওয়া হল শোলাংকির রাজকন্যার ভূমিকা। পাড়ার ছোট ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে অভিনয় করবে। ছেলেদের সঙ্গে একসঙ্গে অভিনয়ে বাবা রাজি হলেন না। আমি ভারী হতাশ হলাম। আমাকে অবশ্য বলা হল পুজোর সময়ে আমরা তো বাইরে ছুটিতে যাই তাই থাকব না। সত্যিই বাইরে গেলাম। সেবার রাজগীর যাওয়া হয়েছিল। তবুও বাবার মতামত খুব উদার ছিল। কেন যে এগারো বছর বয়সও হয়নি ছেলেদের সঙ্গে নাটক করা বারণ করলেন ভেবে আশ্চর্য হই।

সমুদ্রের চাইতে পাহাড় আমার বেশি প্রিয়। মুসৌরি পাহাড়ে ছুটি কাটানো বেশ মনে পড়ে। মুসৌরি যাবার পথে আমরা হরিদ্বার আর হৃষিকেশ হয়ে গেলাম।

মুসৌরিতে রামকৃষ্ণ মিশনের দুই সন্ন্যাসীর সঙ্গে আমাদের গভীর পরিচয় হল। আমাদের বাড়ির ঠিক উপরের বাংলোতে থাকেন স্বামী অতুলানন্দ, আমেরিকান সন্ন্যাসী, আশির উপর বয়স। তাঁকে দেখাশুনো করার জন্য কনখল আশ্রম থেকে এসে রয়েছেন স্বামী অনুভবানন্দ। আমি ছুটে ছুটে উপরের বাংলোতে যাই, অতুলানন্দ আমার হাতে দেন আপেল। অনুভবানন্দকে মা নেমন্তন্ন করে খাওয়ান বাড়িতে। বাবা আর অনুভবানন্দ অনেক ধর্ম ও দর্শন নিয়ে আলোচনা করেন। মাঝে মাঝে তর্ক লেগে যায় দু'জনে। বাবা তো ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না। জিজ্ঞাসা করেন, এই যে

সংসার ছেড়ে এলেন কী পেলেন জীবনে? অনুভবানন্দজি চটে যান। মা তাড়াতাড়ি খেতে ডাকেন।

মুসৌরি ছেড়ে যাবার সময়ে ঠিক হল আমরা ট্রেক করে অর্থাৎ হেঁটে নেমে যাব দেরাদুন। শর্ট কাট রাস্তাতে সাত মাইল হাঁটতে হবে। অনুভবানন্দজি বললেন, পাহাড় থেকে নেমে প্রথমেই পড়বে রাজপুর। সেখানে রামকৃষ্ণ মিশন-এর আশ্রমে অতিথিশালায় যেন আমরা একদিন অন্তত থেকে যাই।

যাবার দিন এসে পড়ল। বাড়ির উলটো দিকে পাহাড়ের উপর ছেলেদের বিরাট রেসিডেনশিয়াল স্কুল। সেখানে স্পোর্টস-এর নেমন্তন্ন হল। স্পোর্টস দেখলাম তার পর চা খাওয়া। চা-পেস্ট্রি ইত্যাদি খাবারদাবার।

সাত মাইল পথ বেশ সহজেই হেঁটে নেমে এলাম। অনুভবানন্দজি কিছুদূর আমাদের সঙ্গে হেঁটে এলেন। আমার মতো এক বালিকার সঙ্গে দুই সন্ন্যাসীর চিঠিপত্রে বেশ অনেক দিন যোগাযোগ ছিল।

রাজপুরের রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম ছিল শান্ত, সুন্দর পরিবেশ। বাগানে কত ফুল আর প্রজাপতি। ছোট মেয়ে বলে আশ্রমের সন্ন্যাসী মহারাজদেরও অনেক স্নেহ পেলাম।

জীবনে প্রথম মৃত্যু প্রত্যক্ষ করলাম নয় বছর বয়সে। দাদু ললিত রায় ঢাকাতে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাঁকে কলকাতা নিয়ে আসা হল। পারিবারিক সব বিপদে-আপদে হাল ধরবেন ফুলমামা কিরণ রায়। সেটাই স্বাভাবিক ছিল। ফুলমামা বললেন দাদুকে আমাদের ডোভার লেনের বাড়িতে আনা হবে। দুই মামার মস্ত বাড়ি ছিল যাদবপুরে, বেঙ্গল ল্যাম্পের কাছেই। ফুলমামার চমৎকার ফ্ল্যাট থিয়েটার রোডে। কিন্তু বিভিন্ন ইমার্জেন্সিতে আমাদের বাড়ি ব্যবহার করা পছন্দ করতেন ফুলমামা। শান্ত বাড়ি, বাবা মা আর একটি মাত্র মেয়ে।

কিছুদিন আগে এ রকম একটা এমার্জেন্সি ঘটেছিল। আমার এক মাসতুতো দাদার জীবনযাত্রা কিঞ্চিৎ বোহেমিয়ান। ধরা পড়ে যাবার ভয়ে উডবার্ন রোডে তাঁর প্রণয়িনীর বাড়ির তিনতলা থেকে ঝাঁপ দিয়ে তিনি পা ভাঙলেন। আর পড়বেন তো পড়লেন উডবার্ন পার্কে শরৎচন্দ্র বসুর বাগানে। আমাদের বলা হত ছোটরা বড়দের কথায় থাকবে না। তাই বিশদ জানি না। কিন্তু পা প্লাস্টার

করা অবস্থায় সেই দাদাকে আনা হল আমাদের বাড়ি। নিজের বাড়ি যাওয়া অসম্ভব, কারণ ওঁর বাবা বাকি হাড়গোড় আস্ত রাখবেন না। ফুলমামাই সব ব্যবস্থা করলেন।

ডোভার লেনের বাড়ির সামনে অ্যাম্বুলেন্স দাঁড়াল। আমার স্টাডি খালি করে হাসপাতালের ঘরে পরিণত করা হয়েছে। স্ট্রেচারে করে দাদুকে নামিয়ে আনা হল। স্ট্রেচার থেকেই দাদু আমার মাথায় হাত রাখলেন। কয়েক দিন বাড়িতে বহুলোকের আসা-যাওয়া। ডাক্তার, নার্স, আত্মীয়স্বজন। ছোটদের দিকে নজর দেবার কেউ নেই। পাশের বাড়ির মাসিমা আমাকে তাঁদের বাড়ি খেতে নিয়ে গেলেন। তাঁর ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেতে বসেছি। শেষ পাতে চাটনি দিয়েছেন। চাটনি আমার খুব প্রিয়। সবে আঙুল দিয়েছি চাটনিতে, দরজার ফ্রেমে ছবির মতো এসে দাঁড়ালেন আমার এক মামিমা। বললেন, বাড়ি চলো, বাবা ডাকছেন। দাদুর অবস্থা খারাপ।

বাবা আমার হাত ধরে নিয়ে চললেন আমারই পড়ার ঘরে। সে ঘরে দাদু শুয়ে আছেন। বাবা বলছেন, দাদু চলে যাচ্ছেন, দেখবে এসো। চলে যাওয়া মানে কী? আমি ভাবছি চলে যাওয়া মানে কি মারা যাওয়া! বাবার হাত শক্ত করে ধরে আছি। চারিদিকে অনেকে কাঁদছেন। আমার অপরাধ বোধ হচ্ছে, আমার কান্না পাচ্ছে না কেন? সে তারিখটা ৩১ ডিসেম্বর—বছরের শেষ দিন। ২৬ ডিসেম্বর ছিল আমার জন্মদিন। আমার আর অ্যানা মামিমার জন্মদিন অনেক সময়ে একসঙ্গে পালিত হত। মামিমা জন্মেছেন ক্রিসমাস ডে-তে। ডোভার লেনের বাড়ির বসবার ঘর তখনও সাজানো আছে রঙিন কাগজের শেকল আর চিনা লণ্ঠনে। পাখা থেকে টেনে রঙিন শেকল সারা ঘরে শামিয়ানার মতো রয়েছে। ঘর থেকে খাটে দাদুর দেহ বার করা হবে। ছোটকাকা ব্যস্ত ভাবে ঢুকে পাখাটা চালিয়ে দিলেন। খাট বার করতে অসুবিধা হচ্ছে। শীতের মধ্যে ফুল স্পিডে পাখা ঘুরছে আর ছিঁড়ে পড়ে যাচ্ছে আমার সাধের রঙিন শেকল।

তি ন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

দাদুর মৃত্যুর পর মা আর আমি দিদিমার সঙ্গে ঢাকা আর মা-দের গ্রামের বাড়ি নরসিংদি গেলাম। সেই প্রথম জাহাজে পদ্মা পার হওয়া, নদীর একূল, ওকূল দেখা যায় না, বিস্তীর্ণ জলরাশি। জাহাজ মাঝেমাঝে তীরে ভিড়ছে, আবার ভেসে পড়ছে। নারায়ণগঞ্জ থেকে যখন ট্রেনে উঠলাম স্মৃতিতে আছে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে শোকার্ত মানুষ। দিদিমাকে জানালার ধারে বসানো হল, তারা দিদিমাকে দেখতে চায়। মা বললেন, এরা দাদুর প্রজা।

পরে ব্যাপারটা আমাকে ভাবিয়েছে। পূর্ববাংলা শাসন করতেন হিন্দু জমিদার শ্রেণি। দরিদ্র মুসলমান প্রজা শোষিত, অত্যাচারিত হয়েছেন। সেখান থেকেই তো দেশভাগের বীজ বপন হল। পাঠ্যবইতে এই অর্থনৈতিক বৈষম্য আর অত্যাচারের কথা পড়েছি। তবে দিদিমার জন্য এই দরিদ্র প্রজারা শোক প্রকাশ করছিল কেন? আমাদের কর্তা চলে গেলেন বলে তারা চোখের জল ফেলছিল। দাদু কি ব্যতিক্রমী জমিদার ছিলেন? তিনি একজন স্বদেশপ্রেমিক, সমাজ সংস্কারক, বিরাট মাপের মানুষ ছিলেন। কিন্তু মার কাছে শুনেছি দরিদ্র প্রজা খাজনা দিতে না পারলে নায়েব-গোমস্তারা অত্যাচার করত একথাও সত্য।

নরসিংদি গিয়ে পূর্ববাংলার গ্রাম দেখলাম। বড়মামা নৃপেন্দ্রকুমার রায় আমার হাত ধরে গ্রামের পথে চলেন। 'চল্, তোকে এখানকার ইস্কুল দেখিয়ে আনি।' দাদু প্রতিষ্ঠা করেছেন তাঁর বাবা কালীকুমার-এর নামে ইস্কুল।

বড়মামা ক্লাসে ঢুকে পড়েন। মাস্টারমশাই তটস্থ হয়ে উঠে দাঁড়ান। ইংরেজি বইটা আমার হাতে দিয়ে বড়মামা বলেন, একটু রিডিং পড়ে

শোনা তো। রিডিং পড়া হলে বড়মামা বলেন— 'মাস্টারমশাই, আমাদের ছাত্ররা এত ভাল পড়তে পারে না কেন? কলকাতা থেকে এসেছে, কী সুন্দর পড়ে দেখলেন, আমি অপ্রস্তুত আর লজ্জিত। সেই কারণেই ঘটনাটা মনে আছে নয়তো ভুলে যেতাম।

বাংলাদেশের বন্ধুরা জানিয়েছেন সেই কালীকুমার ইস্কুল এখনও আছে এবং মস্ত বড় হাইস্কুলে পরিণত হয়েছে।

বড়মামিমা ভাল রান্না করেন। বাবুর্চি রেখে শেখানো হয়েছে। উঠোনের ওপাশে নিরামিষ রান্নাঘর। দিদিমার রান্না সেখানে হয়। বড়মামিমার রান্নাঘরে কেক তৈরি হয়, বিস্কিটও বেক করেন। ফুলমামা আর অ্যানামামিমা এসে রয়েছেন। মেম মামিমার জন্যই কিঞ্চিৎ বিলিতি ধাঁচের রান্না হয় কিনা ঠিক মনে নেই।

পরের বছরও ঢাকা-নরসিংদি এসেছিলাম। হয়তো দাদুর বাৎসরিক ছিল। পদ্মা পারাপার আমার মনে বেশ প্রভাব ফেলেছিল। আমার জন্মদিন ২৬ ডিসেম্বর জাহাজে পালিত হল। জাহাজের বিখ্যাত মুরগির কারি আর ভাত ছাড়াও জন্মদিনের কেক অর্ডার দেওয়া হল।

সেবার বাবা-মা আর আমি ফিরতি পথে ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জে গেলাম। কিশোরগঞ্জে বাবাদের ছেলেবেলা কেটেছে। কিন্তু তারপর আর তেমন কোনও সম্পর্ক নেই। আমরা গেলাম ছোটপিসিমা সরোজবালার সঙ্গে দেখা করতে। তিনি তালজাঙ্গার জমিদার মহিম রায়ের পুত্রবধূ। ছোটপিসিমা অত্যন্ত মধুর স্বভাবের ছিলেন। মার সঙ্গে তাঁর বেশ বন্ধুত্ব ছিল। ছোট পিসেমশাইকে বাবারা তাঁর ডাক নাম গুলু বলে ডাকতেন। তিনিও ছিলেন চমৎকার মানুষ। কিশোরগঞ্জে ওঁদের বাড়ির বসবার ঘরে ঢুকেই বাবা বসে গেলেন অর্গ্যান বাজিয়ে গান করতে। কয়েকটা দিন খুব হইহই করে কেটে গেল।

ঘটনাচক্রে আমার জন্ম হয়েছিল ঢাকা শহরে। আর এই ন'-দশ বছরের বালিকার জীবনে দু'বার ঢাকা-ময়মনসিংহ আসা। এ ছাড়া পূর্ববাংলার সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আর কিছু নেই।

অবশ্য আমাদের কলকাতার বাড়িও পূর্ববাংলারই যেন একটুকরো ছিল। মা-বাবা, কাকারা, মামারা সবাই বাড়িতে কথা বলতেন 'বাঙাল' ভাষায়

অর্থাৎ পূর্ববাংলার চলিত ডায়ালগ। ঢাকা আর ময়মনসিংহে আবার ভাষায় একটু পার্থক্য আছে। বাবা বলতেন— ময়মনসিংহের ভাষায় মিষ্টত্ব বেশি, ঢাকার ভাষা একটু রুক্ষ। মা সে-কথা শুনে খুব চটে যেতেন। মার রান্নায় ছিল পূর্ববাংলার অপূর্ব স্বাদ, ধনেপাতা আর নারকোল কোরার প্রাচুর্য। বহু বহু দিন পরে একবার ঢাকায় শ্রদ্ধেয়া শেখ হাসিনা মধ্যাহ্নভোজে তাঁর গৃহে আমন্ত্রণ করেছিলেন তখন আবার মায়ের হাতের রান্না মনে পড়েছিল।

কিশোরগঞ্জ ছেড়ে আসার সময় রাতের স্টেশন প্ল্যাটফর্মে কে যেন কাকে ডেকে বলল— আপনার টুফলাটা ফালাইয়া গ্যালেন, আপনার টুফলাটা—। বাবা আমাকে বুঝিয়ে দিলেন টুফলা মনে পুঁটুলি। আমি মনে মনে টুফলাতে করে কিছু পূর্ববাংলার স্মৃতি নিয়ে এলাম।

যুদ্ধের আবহ কলকাতাকে ধীরে ধীরে গ্রাস করে ফেলছে। পাড়ার দাদারা ARP নামে কিছুতে যোগ দিয়েছেন। গলায় ফিতে থেকে হুইসল ঝুলছে। চারিদিকের নিরাপত্তা দেখাশুনো করছেন। 'ব্ল্যাক আউট' নামে একটা নতুন শব্দের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। বাড়ির আলো যেন রাস্তায় না পড়ে। সব আলোতে ঢাকনি পরানো হল। বসবার ঘরের বড় আলোর নীচে বাবা কায়দা করে একটা পেতলের গামলা ঝুলিয়ে দিলেন। বেশ ফ্যাসনেবল হল। বড় বড় কাচের দরজায় ক্রস চিহ্নের মতো ব্যান্ডেজের মতো দেখতে কাপড় সেঁটে দেওয়া হল। কোনও বিস্ফোরণে কাচ ভেঙে না-পড়ে। আরও অনেক নতুন বাক্যবন্ধ শিখলাম। সাপ্লাই ডিপার্টমেন্ট নামে এক জায়গায় অনেকে চাকুরি পেল।

সরকারি অফিস সাপ্লাই ডিপার্টমেন্ট সেনাবাহিনীকে সব কিছু সাপ্লাই করে। কিন্তু বেসরকারি ভাবে ব্যাবসা করেও অনেকে রাতারাতি বড়লোক হয়ে গিয়েছিল। একজনকে জানি সেনাবাহিনীর জন্য শোলার টুপি সরবরাহ করে সামান্য অবস্থা থেকে লাখপতি হয়ে গেলেন।

১৯৪১ সালের ১৬-১৭ জানুয়ারির রাত্রে সুভাষচন্দ্র কলকাতার এলগিন রোডের বাড়ি থেকে মহানিষ্ক্রমণ করলেন। গাড়ি চালিয়ে নিয়ে গেলেন আমার স্বামী শিশিরকুমার বসু। সে সময়ে তরুণ মেডিকেল স্টুডেন্ট, বয়স কুড়ি। আমার দশ বছরের বালিকাজীবনে এই ঘটনার কোনও প্রবল স্মৃতি

নেই। চারপাশে কোনও উত্তেজিত আলোচনা তেমনও মনে পড়ে না। আমার স্মৃতিশক্তি প্রখর। তাই একটু আশ্চর্য লাগে। আমার যে কথা স্পষ্ট মনে পড়ে তা আর একটু পরে। বাবা-মা দরজা-জানলা বন্ধ করে রাতের দিকে রেডিয়ো শুনছেন। 'সুভাষবাবু' বক্তৃতা করছেন জার্মানি থেকে। সেকালে সবাইর বাড়িতে রেডিয়ো ছিল না। কখনও পাশের বাড়ির লোকেরাও যোগ দিয়েছেন। কিন্তু সব কিছু ঘিরে গোপনীয়তা। ইংরেজ সরকারের চোখে অপরাধ।

উডবার্ন পার্কের বাড়ির সঙ্গে আমার ছেলেবেলার যোগাযোগ এই সময়ে। মেজকাকার সেটা কর্মস্থল। বাবা আর আমি কখনও যাই। ছবির মতো চোখে ভাসছে গাড়িবারান্দায় গাড়ি দাঁড়ানো। রাশভারী চেহারার একজন গাড়িতে উঠছেন। বাবাকে দেখে থেমে গেলেন, দু'জনে কথাবার্তা হল। বাবা খুব সশ্রদ্ধ হয়ে আছেন, 'শরৎবাবু' অর্থাৎ শরৎচন্দ্র বসু বাবার কাছে খুব বড়মাপের মানুষ। মেজকাকার চক্রবেড়িয়া রোডের বাড়ি থেকে মাঝে মঝে বিশ্বস্ত পুরাতন ভৃত্য ধনু আমাকে আর ধ্রুব-কীর্তিকে বিকেলে ওবাড়ি নিয়ে যায়। বাগান আলো করে হরেকরকম ফুল ফুটে থাকে। আর আছে পাখি, দাঁড়ে বসে কর্কশস্বরে ডাকাডাকি করে। বিশেষ করে মনে আছে এক ছিপছিপে চেহারা গ্রেট ডেন কুকুরের কথা। মেজকাকা তাকে নিয়ে হাঁটতে বেরিয়ে উডবার্ন পার্ক থেকে ডোভার লেনের বাড়িতে হাজির হতেন। তার নাম ছিল 'ফ্ল্যাশ'। কুকুর, পাখি, ফুল নিয়ে আমার উডবার্ন পার্কের স্মৃতি। চক্রবেড়িয়া রোডের যে বাড়িতে মেজকাকা থাকতেন সে বাড়িটি আমার খুব রোমাঞ্চকর মনে হত। একতলায় অনেক অলিগলিতে লুকোচুরি খেলা আর মাঝের উঠোনে কুমির-কুমির খেলা খুব জমত। এক সকালে বাবা আর আমি ও বাড়ি গিয়ে দেখি একতলার সামনের দিকের ঘরের সামনে অনেক বইপত্র আর জিনিস ছড়ানো। সেই ঘরে যিনি থাকতেন তাকে আমরা ত্রিদিবকাকা ডাকতাম। শুনলাম পুলিশ তাঁকে ধরে নিয়ে গেছে। পরে জেনেছি ইনি আর এস পি দলের নেতা ত্রিদিব চৌধুরী। এই বাড়িটি ছিল আমার বড়ননদ মীরা ও তার স্বামীর। পরবর্তীকালে দিদি-জামাইবাবুর কাছে ও বাড়িতে অনেক গিয়েছি। ছেলেবেলাকার দিনগুলি মনে পড়েছে।

বাড়িতে এক আনন্দ উৎসব। ন'কাকা মন্মথচন্দ্রের বিবাহ ঠিক হয়ে গেল ব্যারিস্টার শান্তি রায়চৌধুরীর ভাগনি পদ্মালয়ার সঙ্গে। বেশ শিক্ষিত, সংস্কৃতিবান পরিবার। পড়াশুনো, গানবাজনা, বাড়িতে পারিবারিক নাটক এ সবের মধ্যেই বড় হয়েছেন ন'কাকিমা। আমাদের ডোভার লেনের বাড়ি লোকজনে ভরে উঠল। বিয়ের ক'দিন কাকা-কাকিমারা সব একসঙ্গে এ বাড়িতে।

বাবা খুব আধুনিকমনস্ক ছিলেন, সময়ের আগেই জন্মেছিলেন। বললেন, বউ-ভাত নয় বউ-চা হবে। পিছন দিকে ইন্দু জ্যাঠাইমাদের লন-এ সুন্দর শামিয়ানা হল। ছোট ছোট টেবিল ঘিরে চারিদিকে চেয়ার। উৎকৃষ্ট চা ও খাবারদাবারের ব্যবস্থা। ফেব্রুয়ারি মাস, গরম পড়েনি, তবুও একপাশে আইসক্রিমের ব্যবস্থা। অতিথিরা প্রীত হতেন। অ্যানা মামিমা ঢাকাই শাড়ি পরে এসে তাক লাগিয়ে দিলেন। সেকালে এ ধরনের রিসেপশন সাধারণ বাঙালি বাড়িতে চল ছিল না।

বাবা বলেছিলেন, বধূবরণ ইত্যাদির সময়ে শাঁখ বাজানো আর হুলুধ্বনি করা চলবে না। অ্যানথ্রোপোলজিতে বলেছে ও সব আওয়াজ করা হত ভূত তাড়াবার জন্য। সেজকাকিমা নীলিমাকে পাঠানো হল বড়ভাসুরের সঙ্গে নেগোশিয়েট করতে। উনি বললেন, 'উলু না-হয় দেব না, শাঁখটা অ্যালাও করে দিন। ওটা তো মঙ্গলধ্বনি।' শেষপর্যন্ত শঙ্খধ্বনি ছাড় পেয়ে গেল।

সেকালের প্রথামতো সমগ্র চৌধুরী পরিবারের ফটোগ্রাফ তোলা হল। তুললেন যিনি তাঁর নাম পেরেরা, শ্রীলঙ্কার মানুষ। এর আগে ছেলেবেলার পারিবারিক সব ছবি তুলতেন পরিমল কাকা অর্থাৎ পরিমল গোস্বামী।

ডোভার লেন ৭/১ বাড়িতে এই জমজমাট অনুষ্ঠান মনের মধ্যে ছাপ রেখে গেছে। বিশেষ করে কাকা-কাকিমা ভাই-বোন সব মিলে ক'দিন একসঙ্গে কাটানো। এর অল্পদিনের মধ্যে আমার জীবনে একটা নতুন ঠিকানা যোগ হল। বাবা সাঁওতাল পরগনার ছিমছাম, সুন্দর জায়গা মিহিজামে একটা বাংলো কিনলেন। অনেকখানি জমির মধ্যে একতলা বাংলো। পাঁচিলের গায়ে আগুন রঙের ফুলের গাছ। কুয়োর ধারে আতাগাছ ফলের ভারে নুয়ে পড়েছে। আমার নতুন পাওয়া কোডাক বক্স ক্যামেরাতে আমি

ি তুললাম বাবা-মা আতাগাছের নীচে চেয়ার টেবিল পেতে চা খাচ্ছেন। ট করে তার নাম দিলাম 'আন্ডার দ্য কাস্টার্ড অ্যাপেল ট্রি।'

শিগগিরই আরও নানান গাছপালায় বাড়ি সেজে উঠল। মিহিজামের গালাপ ফুল বিখ্যাত। গোলাপ ফুলের বেড-এ নানান রঙের গোলাপ ুল বাগান আলো করে রাখল। বোগেনভিলিয়ার ঝাড়ে রাস্ট কালার, লা যায় ইটের মতো লালচে রঙের ফুলের বাহার। বাবা বৌদ্ধবিহারের ামে বাড়ির নাম দিলেন 'বেণুবন'। ফণীকাকা, জাস্টিস ফণীভূষণ চক্রবর্তী আমাদের সঙ্গে ছুটি কাটাতে এসে কবিতা লিখলেন 'বেণুবিহীন বেণুবনে খুঁজে বেড়াই বেণু—' নানারকম গাছপালা থাকলেও বেণু ছিল না। এরপর আমাদের ছুটিতে পাহাড়ে সমুদ্রে যাওয়া কমে গেল। ছুটি হলেই মিহিজাম বেণুবন গন্তব্য। কেয়ারটেকার নিযুক্ত হল গোকুল। তার মতো বিশ্বস্ত ও কাজের মানুষ দুর্লভ।

মিহিজামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ছিল চোখ জুড়োনো। একদিকে কেলেহি পাহাড়। তার কোল ঘেঁষে সাঁওতাল গ্রাম 'মহুলবনা'। মিহিজাম থেকে অল্প দূরে অজয় নদী। সেখানে পিকনিক করতে যাওয়া হত। সপ্তাহে একদিন হাট। নানারকম কাচের চুড়ির দিকে চোখ পড়ত। হাটের শেষে সাঁওতাল মেয়েরা গান গেয়ে ঘরে ফিরত— 'তুর কানে গোঁজা ধুতুরারি ফুল...'।

মিহিজামের বেণুবন বাড়ি আমাদের আর এক ধরনের পরিতৃপ্তি দিয়েছিল। বাবা-কাকাদের প্রজন্ম পূর্ববাংলা ছেড়ে পড়াশুনো ও জীবিকার কারণে কলকাতা চলে এসেছিলেন। এ পারে তাঁদের কোনও নিজস্ব বাসভূমি ছিল না। বেণুবন বাবা যখন কিনলেন সব চৌধুরীদেরই যেন একটা নিজস্ব ঠিকানা হল। মাঝেমাঝেই সদলবলে বেণুবনে যাওয়া হত।

মিহিজামে কলকাতার বনেদি পরিবারের অনেকের বাড়ি ছিল। সব বাড়ির নানান সুন্দর সুন্দর নাম। একবার একদল ছাত্র কলকাতা থেকে বেড়াতে এল। তারা কাঠকয়লা দিয়ে এটা-সেটা লিখে সব বাড়ির নাম হাস্যকর করে দিয়েছিল। যথা, যে বাড়ির নাম 'ধর্মধাম' তা হয়ে গেল 'অ-ধর্মধাম' অথবা 'শান্তিকুঞ্জ' পরিণত হল 'অশান্তিকুঞ্জ'-এ। কয়েক দিন উৎপাত চলল কিন্তু 'বেণুবন' কেউ বদলাতে পারল না। আমরা যখন ভাবছি, কেমন জব্দ হঠাৎ একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখি কাঠকয়লার

আঁচড়ে আমরা হয়ে গেছি ধেনুবন। ব হয়েছে ধ-তে রূপান্তরিত। বুদ্ধি আছে বটে!

মিহিজামের সঙ্গে জড়িয়ে অনেক আনন্দের স্মৃতি। প্রকৃতির কাছাকাছি আসার সুযোগও পেলাম মিহিজামে। এমন চাঁদের আলো, শাল আর ইউক্যালিপটাস গাছের মাথায় থালার মতো চাঁদ, কোথাও দেখিনি।

আমরা যখন পারিবারিক বিবাহ উৎসব অথবা সাঁওতাল পরগনার নতুন বাড়ির আরও পাঁচটা কাজে ব্যস্ত রয়েছি তখন জাতীয় আর আন্তর্জাতিক স্তরে বেশ ঘোর ঘনঘটার মেঘ আকাশে দেখা দিয়েছে। ১৯৪২-এর ফেব্রুয়ারিতে ইংরেজদের তথাকথিত দুর্ভেদ্য দুর্গ সিঙ্গাপুরের পতন হয়েছে। প্রায় তিন দশক পরে উডবার্ন পার্কের বাড়িতে বসে জেনারেল ফুজিয়ারার কাছে যখন সিঙ্গাপুর-মালয়েশিয়ার সেসব দিনের গল্প শুনতাম তখন মনে মনে ভাবতে চেষ্টা করতাম সে সময়ে কলকাতায় আমাদের দিন কেমন কাটত। ফারার পার্ক-এ পঁয়তাল্লিশ হাজার ব্রিটিশ- ইন্ডিয়ান আর্মির সারেন্ডার গ্রহণ করছেন ফুজিয়ারা। সকলকে বিস্মিত করে ঘোষণা করছেন— তোমরা চাইলে তোমাদের দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করতে পারো। আকাশের দিকে টুপি ছুড়ে দিলেন সৈনিকেরা। আর তার পরের বছর যখন সুভাষচন্দ্র ইউরোপ থেকে এসে পৌঁছলেন তখন তো আজাদ হিন্দ আন্দোলন শীর্ষে পৌঁছল। বন্দি ব্রিটিশ-ইন্ডিয়ান আর্মির সৈনিকেরা ছাড়াও প্রবাসী ভারতীয়রা শামিল হলেন সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে দেশের বাইরে দেশের জন্য মুক্তিযুদ্ধে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যখন শুরু হব হব তখন থেকে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস নেতৃত্বকে বলছিলেন ব্রিটিশরা নিজেদের সমস্যায় এখন ব্যতিব্যস্ত এই সুযোগ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নেওয়া উচিত। গাঁধীজি এবং কংগ্রেস হাই কম্যান্ড বললেন— এখনও সময় হয়নি। একক সত্যাগ্রহের মতো এক দুর্বল আন্দোলন গাঁধীজির আহ্বানে হল। একজন করে নেতা যুদ্ধের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করে জেলে যাবেন। কিন্তু যে সিদ্ধান্তে গাঁধীজি ১৯৩৯-১৯৪০ সালে আসতে পারেননি সেই সিদ্ধান্ত তিনি নিলেন ১৯৪২ সালে। ইংরেজকে বললেন— ভারত ছাড়ো, কুইট ইন্ডিয়া। ভারত তার নিজের ভাগ্য ঠিক করে নেবে। ইংরেজ একবার ভারতবাসীর মন ফেরাবার শেষ চেষ্টা করেছিল।

স্যর স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস এলেন তাঁর ক্রিপস প্রস্তাব নিয়ে। কিন্তু এ ব্যাপারে গাঁধীজির বিখ্যাত উক্তি— ফেল হয়ে যাওয়া ব্যাংকে আগামী দিনের তারিখ দেওয়া চেক। ক্রিপস মিশন ব্যর্থ হল। সুভাষচন্দ্র বার্লিন থেকে বেতার বক্তৃতায় ক্রিপস মিশন প্রত্যাখান করার জন্য বারবার আবেদন করছিলেন। ঐতিহাসিকেরা মনে করেন দেশত্যাগের পর বিদেশে সুভাষচন্দ্রের কার্যকলাপ গাঁধীজিকে প্রভাবান্বিত করেছিল।

বয়স কম হলেও এই ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় থেকে আমি বেশ মন দিয়ে খবর কাগজ পড়ি। বাড়িতে আসে স্টেটসম্যান, তবে সেটা সাহেবদের কাগজ। আর আছে আনন্দবাজার, দেশের খবর সেখানে থাকে। একদিন খবর কাগজ থেকে চোখ তুলে দেখলাম বাবা কাজে বার হবার জন্য তৈরি হয়েছেন। আমাদের কারুকাজ করা ড্রেসিংটেবিলের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে টাই পরছেন। আমি বললাম— বাবা, খবর কাগজে লিখেছে রাস্তায় জনতা টাই-পরা লোকের টাই খুলে নিচ্ছে, আগুনে ফেলে দিচ্ছে। বাবা বললেন, 'আমার টাই পিওর খাদি, বুঝলে।' খদ্দরের টাই, ক্রিম কালারের উপর ছোট ছোট নীল তারা।

বাবা বেরিয়ে গেলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই প্রত্যাবর্তন, টাই-বিহীন অবস্থায়।

১৯৪২-এর ৯ আগস্ট 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব কংগ্রেসের অধিবেশনে গৃহীত হওয়া মাত্র সব নেতারা জেলে গেলেন। আন্দোলনের রাশ চলে গেল জনতার হাতে। আন্দোলন অহিংস রইল না সর্বত্র। যে যা পারল হাতিয়ার করল। মেদিনীপুরে মেয়েরা রান্নাঘরের বঁটি নিয়ে সরকারি পুলিশের অত্যাচারের মোকাবিলায় নেমেছিলেন। সরকারি অট্টালিকা, পোস্টাপিস, থানা জনতার আক্রমণের শিকার হল। বহু জায়গায় বিদ্রোহীরা রেললাইন উপড়ে ফেলল। বিহার, ওড়িশা, মহারাষ্ট্রের কিছু জেলা নিজেদের মুক্ত ঘোষণা করল। বাংলায় মেদিনীপুর স্বাধীনতা ঘোষণা করল। মেদিনীপুরের শোভাযাত্রায় নেতৃত্বে থাকার সময়ে পুলিশের গুলিতে শহিদ হলেন মাতঙ্গিনী হাজরা।

যুদ্ধের মধ্যে এ রকম পরিস্থিতি ইংরেজ সরকারকে খুবই বেকায়দায় ফেলেছিল। কিন্তু সরকারও সর্বশক্তি দিয়ে আন্দোলন দমনে নেমে

পড়েছিল। একদিকে সৈন্যবল, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অন্যদিকে নিরস্ত্র জনতা। অসম যুদ্ধে যা হবার তাই হল। বিয়াল্লিশের আন্দোলন স্বতস্ফূর্ত ভাবে সারা দেশ জুড়ে হয়েছিল। সংগঠিত নেতৃত্ব দেবার কেউ ছিল না। দু'মাসের মধ্যেই আন্দোলন স্তব্ধ করে ফেলতে সমর্থ হল বিদেশি শাসক।

পুজোর সময়ে যখন মিহিজামে তখন বিশ্বস্ত পরিচারক গোকুল জানাল রেল লাইন অনেকখানি উপড়ে ফেলেছে ছেলেরা। লাইন ধ্বংস করার পর স্থানীয় কংগ্রেস নেতা বিলুদা তার দলবল নিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে পাঁচিল টপকে বেণুবনে আশ্রয় নেয়। স্টেশনের দিক থেকে পুলিশ তাড়া করে এলেও ঠিক কোথায় গেল ধরতে পারেনি। বাইরের পাঁচিলের পর ভিতরের উঠোন ঘিরে আরও একটা প্রাচীর ছিল, সেখানে লুকিয়ে ছিল ছেলেরা।

আগস্ট আন্দোলন স্তিমিত হয়ে এল। জয়প্রকাশ নারায়ণ, অরুণা আসফ আলি তখনও আন্ডার গ্রাউন্ড। একদিন ফুলমামা এসে বাবার সঙ্গে কী সব ফিসফিস করে কথা বললেন। অরুণা আসফ আলির আন্ডার গ্রাউন্ড আশ্রয়ের অসুবিধা হচ্ছে ফুলমামার ইচ্ছা তাঁকে আমাদের বাড়ি রাখেন। শুনে আমি খুব উৎসুক। বাবা সবদিক বিবেচনা করে বললেন চারপাশে এমন দু'-একজন আছেন যে আমাদের বাড়ি খুব নিরাপদ হবে না। অরুণা আসফ আলি আসবেন না জেনে আমি হতাশ।

এদিকে রাশিয়া ইংরেজদের পক্ষে যোগ দেওয়া মাত্র ভারতীয় কমিউনিস্টদের কাছে এই যুদ্ধ হয়ে পড়ল পবিত্র জনযুদ্ধ— পিপলস ওয়ার। স্বাধীনতা সংগ্রামের তারা বিপক্ষে। গাঁধীজির ভারত ছাড়ো আন্দোলনের তারা বিরোধী। আর সুভাষচন্দ্র বসু তাদের চোখে দেশদ্রোহী 'কুইসলিং'। এই ভ্রান্ত নীতি চিরদিনের মতো স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধী বলে ছাপ দিয়ে গেল তাদের চরিত্রে। দেশের ক্ষতিও কম হল না।

আমাদের উডবার্ন পার্কের জীবনে আমার স্বামী শিশিরকুমার বসু একে একে নেতাজির সহকর্মীদের আহ্বান করে নিয়ে আসতে লাগলেন। তাঁদের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করা হত ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য, যাকে বলে অর‍্যাল হিস্ট্রি। নেতাজি রিসার্চ ব্যুরোর সংগ্রহশালা গড়ে উঠছে ধীরে ধীরে। সেই সময়ে প্রথম যিনি অতিথি হয়ে এলেন আমাদের বাড়ি তাঁর

নাম ভগতরাম তলোয়ার। রহমৎ খান নাম নিয়ে তিনি নেতাজির সাথি হয়েছিলেন পেশোয়ার থেকে কাবুল। কাবুলে যে চল্লিশ দিন নেতাজি যথেষ্ট বিপজ্জনক অবস্থায় ছিলেন তখনও সঙ্গী তিনি।

শিশিরকুমার আমাকে বললেন, 'যিনি আসছেন এক সময়ে তাঁর আনুগত্য ছিল নেতাজির প্রতি। কিন্তু আমরা জানি পরবর্তীকালে তিনি আমাদের বিট্রে করেছিলেন। আমরা অনেকে ধরাও পড়ে যাই সেই কারণে। কিন্তু সেসব পুরনো কথা থাক। পেশোয়ার থেকে কাবুল, আর কাবুলের দিনগুলো আমি রেকর্ড করতে চাই।'

ভগতরাম আমাদের খুব আদরণীয় অতিথি হয়ে রইলেন। একসঙ্গে মাছ ভাত খেলেন, আমার বালক পুত্রের সঙ্গে খেলা করলেন। পাঞ্জাবের কীর্তি-কিষাণ পার্টির সদস্য ভগতরাম কমিউনিস্ট ছিলেন। তাঁর আনুগত্য পালটে গিয়েছিল। কতখানি পালটেছিল তা পরে চেক স্কলার মিলান হাউনার-এর বই পড়ে জানতে পারি। উনি একই সঙ্গে ইংরেজ সরকার, সোভিয়েট রাশিয়ার সরকারকে সব খবরাখবর সরবরাহ করছিলেন। জার্মান সরকার এবং নেতাজি স্বয়ং অনেক দিন ব্যাপারটা বুঝতে পারেননি এবং ওঁর সঙ্গে বিশ্বাস করে যোগাযোগ রেখে চলছিলেন। নেতাজির মহানিষ্ক্রমণ ঠিক কীভাবে হল বেশ কিছুদিন ইংরেজরা ধরতে পারেনি। এই ঘটনায় জড়িত থাকা ও সাহায্য করার জন্য পেশোয়ারে মিঞা আকবর শাহ, আবাদ খান, কলকাতায় শিশির বসু ধরা পড়লেন, জেলে গেলেন। ভগতরাম একদিনের জন্যও জেলে যাননি। ইংরেজদের খবর পাচার করার মতো গুরুতর অপরাধ সত্ত্বেও শিশিরকুমার তাঁর সঙ্গে মোটের উপর সম্পর্ক অটুট রেখেছিলেন। কাবুলের দিনগুলির কথা ভগতরাম বলতেন আর শিশিরকুমার টাইপ রাইটারে তুলে নিতেন।

বর্মা থেকে অনেক বাঙালি উদ্বাস্তু হয়ে কলকাতায় চলে এলেন। জাপানিরা রেঙ্গুন (ইয়াংগন) অধিকার করে নিয়েছে। আমাদের আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের মধ্যে এমন বেশ কয়েকটি পরিবার ছিল। আবার অন্যদিকে জাপানিরা শহরে বোমা ফেলবে সেই ভয়ে সবাই কলকাতা ছেড়ে চলে যেতে লাগলেন। একটা নতুন কথা আবার শিখলাম। ইভাকুয়েট করা। আমরা অনেক দিন ইভাকুয়েট করিনি। এই ডামাডোলের মধ্যে বাবা

আমাকে গোখেল স্কুলে ভরতি করে দিলেন। বোধহয় বুঝেছিলেন আমাকে স্কুলে না-দেওয়াটা ভুল হয়েছে। কিন্তু মাস দুয়েকের মধ্যে গোখেল স্কুল সুদ্ধ ইভাকুয়েট করে বাইরে চলে গেল রাঁচি না হাজারিবাগ এমনি কোনও জায়গায়। আমার ভাগ্যে স্কুলের ফর্মাল এডুকেশন নেই।

'টু ইভাকুয়েট অর নট টু ইভাকুয়েট' এই দোলাচলে আমরা পুরো পরিবার। মেজকাকা নীরদচন্দ্র তখন দিল্লিতে অল ইন্ডিয়া রেডিয়োতে কাজ করছেন। আমি ও বাবা-মা একবার দিল্লি ঘুরে এসেছি। প্রথমবারের দিল্লি দেখার স্মৃতি আমার মনে পড়ে। টাঙ্গায় চড়ে ঘুরতে বেরিয়েছি। একটা বিশাল চত্বরের মতো জায়গায় চারপাশে বিরাট অট্টালিকা— নর্থ ব্লক, সাউথ ব্লক, পার্লামেন্ট, রাষ্ট্রপতির প্রাসাদ। বাড়ি সব যত না বড় ছোট মেয়ের চোখে বিরাটতর। বহুকাল বাদে পার্লামেন্টের সদস্য থাকার সময়ে বিজয়চক দিয়ে গাড়িতে আসতে যেতে আমার এক টাঙ্গায় বসে থাকা বিস্মিত বালিকার মুখ মনে পড়ত।

ইভাকুয়েট করার কথা বলছিলাম। মেজকাকা দিল্লি থেকে বিরুদ্ধে মত দিলেন। বাবা আর সেজকাকার মনে হয়েছিল কলকাতা বিপজ্জনক হয়ে উঠছে, কিছুদিন বাইরে যাওয়া ভাল। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল মেয়েদের আর ছোটদের মিহিজামে বেণুবন বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। মা আর আমি, সঙ্গে যাবেন সেজকাকিমা নীলিমা। ন'কাকা মন্মথচন্দ্র জামশেদপুরে টাটানগরে ইঞ্জিনিয়ার। টাটানগর নাকি জাপানিদের টার্গেট। তাই ন'কাকিমা পদ্মালয়াকেও পাঠিয়ে দেওয়া হল। আমাদের দেখাশুনো করার জন্য ছোটকাকা বিনোদচন্দ্র ছুটি নিলেন অফিসে। তিনি কলকাতার বিশ্বভারতীতে পুলিনকাকা অর্থাৎ পুলিন সেন মহাশয়ের সঙ্গে কাজ করতেন। বিশ্বভারতী থেকে কী সুন্দর সব বই বার হত— হলুদ মলাট, লাল রঙে বইয়ের নাম। ছোটকাকা নতুন কবিতার বই বার হলেই আমাকে উপহার দিতেন। একবার দিলেন জাপানে-পারস্যে। রবীন্দ্রনাথ খুব কাছের মানুষ এমনিতেও ছিলেন, হলুদ মলাটের বই আরও কাছে এনে দিত তাঁকে।

এপ্রিলের এক সকাল, সাল ১৯৪৩। সেজকাকা ডা. ক্ষীরোদ চৌধুরীর ক্রিক রো-র বাড়ি থেকে গাড়িতে মিহিজাম রওনা হলাম। সেজকাকা গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাবেন। আগের রাত্রে আমার ভাল ঘুম হয়নি। আমি খাঁচায়

করে আমার দুই পোষা খরগোশ নিয়ে এসেছি। সেজকাকা বলে দিয়েছেন ওদের সঙ্গে নেওয়া চলবে না। কিন্তু কার্যকালে সেজকাকা তাদের সিটের পায়ের কাছে বসিয়ে দিলেন। গ্র্যান্ড ট্রাংক রোড ধরে গাড়ি চলেছে। শহর ছাড়িয়ে গ্রামের দিকে ধানখেত, পুকুরের চারপাশে তালগাছ। মা বললেন, তালপুকুর। পথে গাড়ি থামিয়ে তালপুকুরের ঘাটে বসা হল। আমি আমার খরগোশদের ঘাস খাওয়ালাম। বর্ধমানে থেমে এক বন্ধুর বাড়িতে ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থা। পরের স্টপ একেবারে আসানসোলে। সেখানে লাঞ্চ আর একটু বিশ্রাম। বেলা তিনটের পর গাড়ি ঢুকল মিহিজামে।

আমাদের পৌঁছে দিয়ে সেজকাকা ফিরে গেলেন। আমাদের যুদ্ধকালীন ইভাকুয়েশনের জীবন শুরু হল। মিহিজামের সব বাড়ি লোকে লোকারণ্য। কলকাতা ছেড়ে সবাই আশ্রয় নিয়েছে। আমাদের বাগানের অন্য পাশে ব্যাডমিন্টন কোর্ট বানানো হয়েছে। মা ছোটকাকার সঙ্গে ব্যাডমিন্টন খেলেন। উত্তর কলকাতার রক্ষণশীল বনেদি বাড়ির লোকজন আছে বেশ কিছু। শুনলাম তাঁরা মার খুব নিন্দে করছেন দেবরের সঙ্গে ব্যাডমিন্টন খেলা— ছি, ছি!

দেখতে দেখতে রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন এসে পড়ল। এতজন বাঙালি থাকতে রবীন্দ্রজয়ন্তী হবে না তাও কি হয়। হোক না যুদ্ধবিগ্রহের আবহ। ধুমধাম করে রবীন্দ্রজয়ন্তী হল। কাকিমা পদ্মালয়া গান গাইলেন, 'তোমার আসন শূন্য আজি হে বীর পূর্ণ করো—' একজন গুণমুগ্ধ দর্শক মেডেল ঘোষণা করলেন।

বাবা চিঠিপত্রে ইংরেজি পড়াচ্ছেন। আমি জবাব দিচ্ছি, সংশোধন করে পাঠাচ্ছেন। দুর পাল্লার পড়াশুনো ছাড়া বিশেষ কিছু হচ্ছে না। সেজকাকিমার উপর পড়ানোর ভার। মাঝেমাঝে বলছেন পড়তে বসো। আমি মুরগির পিছনে ছুটতে ব্যস্ত। দুটো বেশ সুন্দর মুরগি, নাম দিয়েছি রুমকি ঝুমকি। ডিম পাড়লে ডিমের গায়ে তারিখ লিখে রাখছি। ক'দিন পরে ফুটে ছানা বার হবে প্রতীক্ষায় থাকি। কাজের বা অকাজের কি অন্ত আছে! কলকাতার প্রতিবেশী মিনুর মা মাসিমাও রেললাইনের ধারে একটা বাড়িতে উঠেছেন। দু'বাড়িতে যাওয়া আসা চলছে। ন'কাকা মন্মথচন্দ্র মাঝেমাঝে জামশেদপুর থেকে এসে হাজির হন। সামনের রোয়াকে তখন গানের আসর বসে।

া'কাকা হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান ধরেন— 'আজি আমারি কথা, ওগো বিমনা সাঁঝে, তব স্মরণ বীণে যেন বারেক বাজে—'।

অসম্ভব গরম পড়ে যায় সাঁওতাল পরগনায়। বাড়িতে পাখা তো নেই। রাতে লণ্ঠনের আলো। লণ্ঠনের আলোয় দেওয়ালে নানারকম ছায়া, গা হমছম করে। গরম থেকে পরিত্রাণ পেতে রাতে বাগানে সার সার বিছানা পাতা হয়। চাঁদের আলোয় ভেসে যায় চারিদিক। সার দেওয়া ইউক্যালিপটাস গাছ পাতা নেড়ে হাওয়া দেয়। আঃ কী আরাম! এমন সময় এক এক রাতে ধেয়ে আসে আঁধি, ধুলোর ঝড়। যে যার বিছানা নিয়ে দৌড়ে ঘরে আশ্রয় নিতে হয়। গরমে মা-কাকিমাদের হাতের সোনার চুড়ি আর রাখা যাচ্ছে না, খুলে ফেলেছেন। এমনি এক সময়ে আকাশ অন্ধকার মেঘে ছেয়ে গেল। বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নামল। আকাশ ভাঙা সেই বৃষ্টিতে আমরা বাগানে হইহই করে ভিজতে লাগলাম। প্রথম বর্ষণধারায় স্নানের আনন্দই আলাদা। এই অভ্যাস আমার পরে উডবার্ন পার্কের বাড়িতে এমনকী বসুন্ধরা গৃহেও ছিল।

বৃষ্টির সঙ্গে জড়িয়ে আছেন রবীন্দ্রনাথ। সকলে মিলে বর্ষামঙ্গলের আয়োজন। মিনুর দিদি থুবলুদি আমাদের নাচ শেখাচ্ছেন। সমবেত নৃত্য হল 'ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে' গানের সঙ্গে। আমরা সবাই লতাপাতার ছাপ দেওয়া জংলা ছাপা শাড়ি পরেছি। আমার একটা একক নৃত্যও ছিল। প্রায় চল্লিশ বছর বাদে কলকাতায় নির্বাচনী প্রচারে বার হয়ে ভবানীপুরের এক বাড়িতে গিয়েছি, বাড়ির কর্তা বললেন— অনেক কাল আগে আপনার নাচ দেখেছিলাম, কোন গানের সঙ্গে নেচেছিলেন তাও মনে আছে— 'পথিক মেঘের দল জোটে ঐ শ্রাবণ গগন অঙ্গনে।' আমার স্বামী ডা. শিশিরকুমার বসু চৌরঙ্গির বিধানসভা নির্বাচন কংগ্রেসের প্রার্থী। সেই নির্বাচনী প্রচারে এমন অভিজ্ঞতায় আমি অভিভূত আর কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুতও বটে। এদিকে জাপানিদের কলকাতায় বোমা ফেলার কোনও বাসনা আছে কি না বোঝা যাচ্ছে না। মিহিজাম প্রবাসীদের সকলেরই মন শহরে ফেরার জন্য আনচান করছে। কতদিন এভাবে বসে থাকা যায়। মা একবার বাবা কীরকম আছেন দেখবার জন্য কয়েক দিন কলকাতা ঘুরে এলেন। আমি সেই প্রথম মাকে ছেড়ে থাকলাম। মা ব্যাকুল চিঠি লিখতেন— ব্যাডমিন্টন

খেলিবার পরে তৎক্ষণাৎ স্নান করিবে না। একটু বিশ্রাম করিয়া ঘাম ঝরিয়া গেলে গা ধুইবে। তাহার পর গায়ে পাউডার দিবে... ইত্যাদি। অন্য খবরও থাকত। বাবা-মা সিনেমা দেখেছেন, নাম 'ঝুলা'। যদি ঠিক মনে থেকে থাকে অশোককুমার আর লীলা চিটনিশ। অনেক গান হিট হয়েছিল। এই ফিল্মের গানের সুরে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির সৈনিকেরা অনেক যুদ্ধের গান বেঁধেছিলেন। 'চল রে নওজওয়ান' খুব জনপ্রিয় হয়েছিল।

ভরা মনসুন, ঝমঝম বৃষ্টি, রাতের অন্ধকারে কোনও কোনও বাড়িতে ডাকাতি। মিহিজামে সব বাড়ি একে একে খালি হয়ে যেতে লাগল।

চার

রাসবিহারী অ্যাভিনিউ

জুলাই মাসে আমরাও কলকাতায় ডোভার লেনের বাড়িতে ফিরে এলাম। তখনও কলকাতার কিছু বাড়ি খালি। ডোভার লেনও যেন আগের মতো জমজমাট নেই। বছরের শেষে ডিসেম্বরে কলকাতায় সত্যিই বোমা পড়ল। বাবার মনে হল ৭/১ ডোভার লেনের পুরনো দিনের ইংলিশ প্যাটার্নের বাংলো খুব নিরাপদ নয়। বড় বড় কাচের দরজা জানলা সাইরেন বাজলেও ঝনঝন করে ওঠে। দিনের বেলায় আমি আর মা একলা থাকি, বাবা কাজে যান। নতুন বাসস্থানের সন্ধান শুরু হল।

এই সময়ে একটা পারিবারিক বিপর্যয় হল। কাকা মন্মথচন্দ্র গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। একটা নতুন অসুখের নাম শুনলাম আমি— নার্ভাস ব্রেকডাউন। বাবার মুখ গম্ভীর, ডাক্তারকাকা রোজ আসছেন, পরামর্শ হচ্ছে। এই অসুস্থতার সময়ে ন'কাকিমা পদ্মালয়া আমাদের কাছে ছিলেন। পরে তাঁকে দিল্লিতে পাঠানো হল মেজকাকা নীরদচন্দ্রের কাছে। তিনি সন্তানসম্ভবা ছিলেন, কলকাতার যুদ্ধজনিত পরিস্থিতি থেকে তাঁকে দূরে পাঠানো উচিত মনে হল। ন'কাকার চিকিৎসা আমাদের বাড়ি থেকে হতে লাগল। ওকে দেখছেন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ গিরীন্দ্রশেখর বসু। মনে পড়ে ছোটকাকা বিনোদচন্দ্র নিয়ে যেতেন ওঁর চেম্বারে। মাথায় ইলেকট্রিক শক দেওয়া হত। সেটাই নাকি তখন ট্রিটমেন্ট ছিল। আমার খুব অমানবিক চিকিৎসা মনে হত। ছোটকাকা ধরে ধরে নিয়ে ফিরে আসতেন। এসেই শুয়ে পড়তেন। আমার তখনও মনে হত, এখনও মনে হয় ভুল চিকিৎসা হচ্ছিল। আমি ডাক্তার নই, এ আমার নিজের মনের ধারণা। ওই চিকিৎসায় নয়, সময়ে ধীরে ধীরে ভাল হলেন, ব্রিলিয়ান্ট ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন, জাপানে

গিয়ে উচ্চতর শিক্ষা নিলেন পরবর্তীকালে। ন'কাকার এই অসুখের সময়ে আমার খুব মন খারাপ হত। কাকারাই আমার বন্ধু ছিলেন। আবার সব কাকাদেরই আমি ছিলাম প্রিয় ভাইঝি— ফেভারিট নিস— বলতেন কাকার বন্ধুরা। সন্ধ্যাবেলা ডোভার লেনের আশেপাশের বাড়িতে শাঁখ বেজে উঠত। আমাদের বাড়িতে এসব প্রথা নেই, বাবা ঘোর নাস্তিক। ঈশ্বর নিয়ে আমি বরাবর দোলাচলে। কখনও বাবাই ঠিক পথে আছেন মনে হয়। কিন্তু আমার অন্তরে কোথাও একটা গভীর বিশ্বাস আছে, কোনও এক অজানা মঙ্গলময় শক্তির উপর। সন্ধ্যায় শাঁখ বাজলে দেখেছি মা-মাসিমারা হাতজোড় করে কপালে ঠেকান। আমিও হাত কপালে ঠেকিয়ে ন'কাকা যেন ভাল হয়ে ওঠেন, প্রার্থনা করি।

বাইরের পৃথিবীতে কত কিছু ঘটছে। বিশ্বযুদ্ধ আছে, স্বাধীনতা সংগ্রাম চলছে, তার সঙ্গে শুরু হয়েছে বাংলার দুর্ভিক্ষ— দলে দলে মানুষ গ্রাম ছেড়ে খাবারের সন্ধানে শহর কলকাতার পথে রওনা হয়েছে।

ঘরেবাইরে নানারকম ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে কবে যেন মনে হয় বেশ বড় হয়ে গেলাম। যাকে বলে টিন-এজ-এ পৌঁছে গেলাম।

রাজনীতি আর সাহিত্য দুটোতে আমার বেশ উৎসাহ। রাজনীতিতে প্রত্যক্ষ ভাবে কিছু করবার আমার অন্তত সুযোগ নেই। মন দিয়ে সব পর্যবেক্ষণ করি, খবর কাগজ পড়ি, রেডিয়ো শুনি। গাঁধীজি কারাগারে অনশন করছেন শুনে আমি বললাম আমিও অনশন করব। বাবা উৎসাহ দিয়ে বললেন, বেশ তো আমিও তোমার সঙ্গে অনশন করব। একদিনের প্রতীক অনশন, রাতেই মা ফলমুল দিলেন। ইংরেজরা সেবার ভেবেছিল গাঁধীজি সত্যিই মারা যাবেন। শুনেছি তাঁর মৃত্যুসংবাদ কীভাবে প্রচার করা হবে অল ইন্ডিয়া রেডিয়োতে তা লিখে ফেলে ইংরেজ সরকার তৈরি হয়ে পড়েছিল। গাঁধীজি তাদের হতাশ করলেন।

নতুন বাড়ির সন্ধান পাওয়া গেছে। রাসবিহারী অ্যাভিনিউর উপর চারতলার ফ্ল্যাট। নীচের ফ্ল্যাটগুলিতে বেঙ্গল ল্যাম্পের অফিস। দিনের বেলায় লোকজনে পূর্ণ। রাতেও দারোয়ানরা রয়েছে পাহারা দেয়। সাইরেন বাজলে অবশ্য চারতলা থেকে নীচের তলার শেলটার-এ আসতে হবে। বাবার মনে হল নিরাপদ বাসস্থান। বেঙ্গল ল্যাম্প আমার মামাদের প্রতিষ্ঠান।

কারখানা যাদবপুরে, অফিস বালিগঞ্জে। বাবা হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করেন, বেঙ্গল ল্যাম্প-এর অন্যতম ডিরেক্টর আর আইনের পরামর্শদাতা। সব দিক থেকেই ১৯০সি রাসবিহারী অ্যাভিনিউ আদর্শ বাসস্থান।

পিছনে পড়ে রইল ডোভার লেনের বাড়ির দেয়াল ঘেঁষে পেয়ারাগাছ। আমরা সঙ্গীসাথি মিলে পেয়ারাগাছে চড়তাম। ইন্দু জ্যাঠাইমার বাগানে স্থলপদ্ম গাছ। আর কোণের দিকের অশ্বত্থগাছের তলায় একটা কুকুর আর তার চারটি ছানা। আমি একটাকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে পুষেছিলাম। ডোভার লেনের পথে মিলিটারি ট্রাক চাপা পড়ল সে। আমার গভীর শোক। সেই শোক থেকে আমার জীবনের প্রথম লেখার জন্ম। 'পথের কুকুর' নামে এক লেখা লিখে ফেললাম। সেই দিন থেকে আজ পর্যন্ত দেখে আসছি গভীর শোক বা দুঃখের সময়ে সে-কথা লিখে ফেললে মনের ভার লাঘব হয়ে যায়। সৃষ্টিশীল লেখার মধ্য দিয়ে একধরনের ক্যাথারসিস হয়।

এই লেখাটি প্রকাশিত হল আমাদের হাতে লেখা পত্রিকা 'লেখন'-এ। বাড়িতে আমার জন্য ছোটদের পত্রিকা 'মৌচাক' আসত। আমার প্রিয় লেখক হয়ে দাঁড়ালেন হেমেন্দ্রকুমার রায়। তাঁর গোয়েন্দা জয়ন্ত আর সহকারী মানিক অর্থাৎ কিনা শার্লক হোমস আর ওয়াটসন নানান রহস্যের সমাধান করেন। আর আছেন পুলিশ অফিসার সুন্দরবাবু যিনি সব কথায় বলেন 'হুম'। আমার শখ হল আমি হাতে লেখা পত্রিকা বার করব। আমাদের পারিবারিক পত্রিকা। দিল্লিতে মেজকাকার ছেলেরা ধ্রুব ও কীর্তি, কলকাতায় নতুন কাকা হিরণ্ময়-এর ছেলেমেয়েরা চিন্ময়, উত্তরা, সবিতা সব ভাইবোনদের ধরলাম।

আমার সব চাইতে বড় সহায় ছোটকাকা বিনোদচন্দ্র। ন'কাকা আর ন'কাকিমা লেখক হিসেবে যোগ দিলেন। তাঁরা ছদ্মনাম নিলেন 'শ্রীহীন' আর 'শ্রী'। ঠিক হাতে লিখতে হল না, ছোটকাকা গৌরাঙ্গ প্রেস থেকে লেখাগুলো ছেপে দিলেন। প্রথম সংখ্যা বার হল ডোভার লেনে আর দ্বিতীয় ও শেষ সংখ্যা বেশ অনুষ্ঠান করে রাসবিহারী অ্যাভিনিউর বাড়িতে। মামার বাড়ি রায় পরিবার আর চৌধুরীরা সব সপরিবার উপস্থিত। সঙ্গে মায়ের জলযোগের ব্যবস্থা। বাংলা বুঝবেন না তবু অ্যানামামিমা এক কপি নিলেন।

পেয়ারাগাছ নেই, নেই স্থলপদ্ম। কিন্তু রাসবিহারী অ্যাভিনিউর ফ্ল্যাট বাড়ির চারপাশে শিল্প-সংগীত-সংস্কৃতির এক অভূতপূর্ব আবহ। পিছনে হিন্দুস্থান পার্কে নরেন্দ্র দেব ও রাধারানী দেবীর 'ভালোবাসা' বাড়ি। এই দম্পতিকে বলা হয় ইংরেজ কবি ব্রাউনিং দম্পতির মতো। এঁদের সঙ্গে আমাদের অনেক দিনের পারিবারিক চেনা। শুনেছি রাধারানী দেবী আমার দাদু ললিত রায়কে বাবা ডাকতেন। ওঁর বিধবাবিবাহ হয়েছিল। দাদু ছিলেন সমাজ সংস্কারক ও বিধবাবিবাহের প্রবল সমর্থক। আমার ছেলেবেলার এক মধুর স্মৃতি হল এঁদের কন্যা নবনীতার এক বছরের জন্মদিনের পার্টি। তখন ডোভার লেনে থাকি, আমার বয়স হয়তো ছয়। চিলড্রেন পার্টি ব্যাপারটা তো সেকালে ঠিক ছিল না। কতরকম খেলা হল, আমরাও নানারকম প্রেজেন্ট নিয়ে বাড়ি ফিরলাম। আমাদের বাড়ি ছাড়িয়ে একটু গেলে ২০২ নম্বরে 'কবিতা ভবন', বুদ্ধদেব বসু ও প্রতিভা বসু আছেন। আমাদের বাড়ির একতলায় ভাস্কর প্রদোষ দাশগুপ্ত স্টুডিয়ো করলেন। থাকতেন কাছেই সর্দার শংকর রোডে। তিনি ও তাঁর দক্ষিণ ভারতীয় স্ত্রী আমাদের নিকট হয়ে পড়লেন। উলটো দিকের সরু গলি এসে বড় রাস্তায় পড়েছে। গলির নাম রমণী চ্যাটার্জি রোড বা অমনি কিছু। ওই মোড়ে প্রায়ই দেখা যায় শচীন দেব বর্মন ও স্ত্রী মীরা, তখনও বোধহয় তাঁরা মুম্বাই চলে যাননি। শিল্পী গোপাল ঘোষ বাবার খুব ঘনিষ্ঠ। নিত্য যাতায়াত আমাদের বাড়ি। বাবা বলেন, জিনিয়াস কিন্তু ড্রিংক করা কমানো দরকার। প্রদোষ দাশগুপ্ত, গোপাল ঘোষ এঁরা 'চারুদা, চারুদা' বলতে বলতে প্রায়ই উপস্থিত হতেন। এঁদের সূত্রে 'ক্যালকাটা গ্রুপ'-এর সব শিল্পীদের সঙ্গে আমাদের হৃদ্যতা হয়ে গেল। অন্যদিকে বন্ডেল রোডে আছেন অতুল বসু, পোর্ট্রেট আঁকিয়ে হিসেবে খুব নাম। ওঁদের বাড়ি প্রায়ই যাই আমরা। বাবার হাত ধরে যামিনী রায়ের শ্যামবাজারের স্টুডিয়োতে যাবার ঝাপসা স্মৃতি আছে আমার। তখনও তিনি ইউরোপিয়ান ইমপ্রেশনিস্ট ধাঁচের ছবি আঁকা ছেড়ে দেননি। পরে তাঁর বালিগঞ্জের স্টুডিয়োতে কত যে গিয়েছি বলতে পারি না। যামিনী রায়েরও বিশেষ ঘনিষ্ঠ ছিলেন 'চারুবাবু' অর্থাৎ বাবা। হিন্দুস্থান রোডে 'সুধর্মা' বাড়িতে আছেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। তিনি মেজকাকার বিশেষ বন্ধু। তখন

অত বুঝবার বয়স হয়নি। আজ বুঝি কত গুণীজনের স্নেহের সান্নিধ্য পেয়েছিলাম।

এই বাড়িতে আসার পর আমার আর এক ধরনের করুণ অভিজ্ঞতা হল। বাংলায় যে অভূতপূর্ব দুর্ভিক্ষে তিরিশ থেকে চল্লিশ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়েছিল সেই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের কিছু ছবি নিজের চোখে দেখলাম। সেই সব দৃশ্য চিরদিনের মতো ছাপ রেখে গেছে মনে। ১৯৪৩ সালে বাংলার গ্রামাঞ্চলে দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস ছড়িয়ে পড়েছিল। গ্রাম থেকে দলে দলে বুভুক্ষু মানুষ একটু খাদ্যের আশায় শহরে আসতে লাগল। ডোভার লেনের বাড়ি একটু ভিতর দিকে হওয়ার কারণে কি না জানি না আমার দুর্ভিক্ষের প্রত্যক্ষ স্মৃতি নেই। রাসবিহারী অ্যাভিনিউতে এলাম ১৯৪৪ সালের গোড়ায়। রাসবিহারী অ্যাভিনিউ বিরাট চওড়া রাস্তা, মাঝখান দিয়ে গেছে ট্রাম লাইন, দু'ধারে বড় বড় বাড়ি। রাস্তা থেকে কাতর আর্তনাদ ভেসে আসে যখন তখন— একটু ফ্যান দাও মা একটু ফ্যান...। কেউ খাবার দাও, ভাত দাও বলে না, বলে ফ্যান দাও।

উলটো দিকের বাড়ির সামনে শীর্ণ চেহারা মানুষের লাইন, শিশু কোলে মেয়েরা, কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে। মা বললেন, ওবাড়ি থেকে পাঁউরুটি বিলি করছে। ফুটপাথে মানুষের মৃত্যু হচ্ছে। নবজাতকের কান্নাও শোনা যায় ফুটপাথে। রমণী চ্যাটার্জি রোডের গলির মুখে 'দেশপ্রাণ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার', থরে থরে সাজানো আছে— সন্দেশ, রসগোল্লা, অমৃতি। মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়ছে না, লুটপাট করছে না। শীর্ণ চেহারা, অবসন্ন শরীর মন, ধুঁকতে ধুঁকতে লুটিয়ে পড়ছে ফুটপাথে।

একে বলা হয়েছে 'ম্যান মেড' মানুষের তৈরি দুর্ভিক্ষ। কারণ সত্যি কোনও খাদ্যাভাব ছিল না। ব্রিটিশ সরকার তাদের সেনাবাহিনীর খাদ্য সরবরাহে মন দিয়েছিল। শহরে আর শিল্পাঞ্চলেও নজর ছিল। যুদ্ধের কারণে চালের দাম হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে। গ্রামের দরিদ্র মানুষের হাতে চাল কেনার পয়সা নেই। সরকারি কোনও ত্রাণকার্যের দেখা নেই।

বহুদিন পর লন্ডনে ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে সুভাষচন্দ্র বসুর উপর কাগজপত্র দেখছি। ১৯৪৩ সালের অক্টোবরে অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার গঠিত হয় সিঙ্গাপুরে। তার আগেই আগস্ট মাসে বাংলায় দুর্ভিক্ষের খবরে

উদ্বিগ্ন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ভারতের ব্রিটিশ সরকারকে প্রস্তাব পাঠাচ্ছেন বর্মা থেকে জাহাজে চাল পাঠাবেন। আশ্বাস চাইছেন অপরদিকে গ্রহণ করা হবে, জাহাজ আক্রান্ত হবে না। ব্রিটিশ-ভারতীয় সরকারের নোট দেখছি— সুভাষ বোস যে চাল পাঠাতে চাইছেন এ খবর যেন কিছুতেই প্রকাশ হয়ে না পড়ে, খবর চেপে দাও। খবর চেপে দেওয়াতে সত্যিই ওস্তাদ ছিলেন ব্রিটিশ সরকার। ভারতের পূর্ব সীমান্তে নেতাজি সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে স্বাধীনতা সংগ্রামের খবর দেশের সাধারণ মানুষ যুদ্ধ শেষ হবার আগে জানতেই পারেনি।

ডা. শিশিরকুমার বসু তাঁর 'গ্রেট এসকেপ' বইতে লিখেছিলেন দিল্লির লালকেল্লার আন্ডারগ্রাউন্ড সেল থেকে বার করে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে লাহোর ফোর্টের জেলে। তখন হাত পিছমোড়া করে বাঁধা, দু'দিকে বন্দুক হাতে সিপাই, হেঁটে চলেছেন দিল্লি স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম দিয়ে আর ভাবছেন দু'ধারে জনস্রোত এরা তো জানে না আজাদ হিন্দ সরকার গঠিত হয়েছে, মুক্তি ফৌজ নিয়ে সীমান্তের দিকে অগ্রসর হয়েছেন নেতাজি, এরা তুচ্ছ দৈনন্দিন কাজে দিন কাটাচ্ছে। ধরা পড়ার ঠিক আগে নেতাজির পাঠানো দূত যারা সাবমেরিনে কচ্ছ উপকূলে নেমেছে তাদেরই একজন টি কে রাও কলকাতায় এসে সব খবর দিয়ে গেছে। এই মুক্তি যুদ্ধের খবর অল্পসংখ্যক বিপ্লবী ছাড়া আমজনতা জানতে পারেনি। খবর ব্ল্যাক আউট করে দেওয়াতে একান্ত সার্থক হয়েছিল ব্রিটিশ সরকার। ১৯৪৩-৪৪ সালের ভয়ংকর দুর্ভিক্ষের খবরও বাইরের পৃথিবী তেমন ভাবে জানতে পারেনি। নিজেদের সাম্রাজ্যের সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে গিয়ে ইংরেজ সরকার লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনের কোনও মূল্যই দেয়নি। আজকাল holocaust কথাটা খুব শুনি। বাংলায় যা ঘটল তা কম দুর্ভাগ্যজনক ছিল না। কিন্তু তা প্রচার পায়নি কোনও।

আমার জীবনে বেশ বড়রকম ঘটনা ঘটল সেই সময়ে। আমি স্কুলে ভরতি হলাম। পাড়াতে যে বালিগঞ্জ গার্লস হাইস্কুল তার হেডমিস্ট্রেস হয়ে এলেন মনোরমা বসু। তিনি মার ঢাকার জীবনের বন্ধু। মনোরমা মাসিমা বাবাকে বোঝালেন ষোলো বছর বয়সে ক্লাস টেনের শেষে ম্যাট্রিক পরীক্ষা অর্থাৎ স্কুলের শেষ পরীক্ষা দিতে হয়। ক্লাস নাইন আর ক্লাস টেন

ম্যাট্রিক পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমার তো স্কুলজীবনের কোনও অভিজ্ঞতাই নেই। সব দিক বিবেচনা করে আমাকে এখনি ক্লাস এইটে ভরতি করা উচিত। প্রথম বছরটা তো স্কুলের রীতিনীতি বুঝতেই কেটে যাবে। বাবা বুঝলেন।

রাসবিহারী অ্যাভিনিউর বাড়ি থেকে আমার স্কুল যাত্রা শুরু হল। রাস্তা পার হয়ে দেশপ্রাণ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের পাশের গলি দিয়ে হিন্দুস্থান রোড ধরে চলতে থাকি, হেমজ্যাঠামশাই-ইন্দুজ্যাঠাইমার বাড়ি পার হয়ে যাই। সুন্দর সুন্দর দোতলা বাড়ি পরেশলাল সোম, প্রিয়নাথ সেন এমনই কত শিক্ষিত উচ্চবিত্ত বাঙালি ভদ্রলোকের বাস। উলটোদিকের একটা বাড়িতে থাকেন সুনয়নী দেবী। তিনি ঠাকুরবাড়ির মেয়ে, ছবি আঁকেন। আমার ছেলেবেলার পরিচিত পাড়া। আর একটু এগিয়ে গেলেই আমাদের স্কুল। প্রথম দিকে রামলগিন দারোয়ান পিছন পিছন আসত। তারপর আমি একাই যেতে শুরু করলাম।

হেডমিস্ট্রেস মনোরমা বসু দৃঢ়চেতা হলেও শান্ত প্রকৃতির ছিলেন। খুব মেজাজি ও দোর্দণ্ডপ্রতাপ ছিলেন ডেপুটি হেডমিস্ট্রেস সুমতিদি। সবাই বাঘের মতো ভয় করত। প্রথম কয়েক দিনের মধ্যে ঘটনাচক্রে আমি তাঁর সুনজরে পড়ে গেলাম। উনি ইংরেজি পড়ান, আদেশ করেছেন ইংরেজি ক্লাসে ইংরেজিতে কথা বলতে হবে। ফলে ক্লাস একেবারে নীরব। বাংলা স্কুলে ইংরেজি ভাল জানলেও কথাবার্তা চালানোতে কোনও মেয়েই পারদর্শী ছিল না। আমিও যে খুব স্বচ্ছন্দে বলতে পারি তা নয় যদিও বাবার লাইব্রেরির দৌলতে প্রচুর ইংরেজি বই পড়ে ফেলেছি, মোটের উপর লিখতেও পারি। কথা বলায় কিঞ্চিৎ আড়ষ্ট। সুমতিদি পায়চারি করে গ্রামার পড়াচ্ছেন। পায়চারি করতে করতে ক্লাসের পিছন দিকে এলেন। আমি নতুন মেয়ে পিছনের একটা বেঞ্চিতে বসে আছি। আমার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে রাগতভাবে ইংরেজিতে বললেন— তোমার সামনে গ্রামার বই নেই কেন?

ক্লাসসুদ্ধ সবাই কিঞ্চিৎ তটস্থ। আমার অভিজ্ঞতার অভাবের ফলেই আমি তত ভীত নই। উঠে দাঁড়িয়ে গড়গড় করে ইংরেজিতে বলে গেলাম— বইটা তো আউট অফ প্রিন্ট। আমি পাবলিশার্সদের কাছে খোঁজ করেছি বইটা

পেতে দেরি হবে। আমার বাবা কথা বলেছেন ওদের সঙ্গে, তাড়াতাড়ি দেবার জন্য।

গম্ভীর মুখে সুমতিদি বললেন, তোমার বইপত্র নিয়ে উঠে এসো। এবার আমি কিঞ্চিৎ ভীত। উনি আমাকে ফার্স্ট বেঞ্চে বসিয়ে দিলেন। ওঁর চোখে আমি ভাল মেয়ের স্বীকৃতি পেলাম। মাঝেমাঝে বেশ বোকার মতো কাজও করে ফেলতাম। হাফ ইয়ার্লি পরীক্ষার সময়ে ইতিহাস পরীক্ষাতে তিনটি কোশ্চেনের উত্তর লেখার পর হাত ব্যথা করল। তাই শেষ প্রশ্নের জবাবটা আর লিখলাম না। বাড়িতে পড়ার সময়ে তো তাই করতাম। পরে জানলাম পরীক্ষার সময়ে হাত ব্যথা করলেও লিখতে হয়।

আর একজন খুব রাগী টিচার ছিলেন ইতিহাসের মালতিদি। কালিদাস নাগ-এর লেখা ইতিহাসের বই 'স্বদেশ ও সভ্যতা' আমাদের পাঠ্য। মালতিদি দাগ দিয়ে দেন, এই চার পাতা কাল মুখস্থ করে আসবে। এ তো কবিতা নয় গদ্য! প্রাণ বেরিয়ে যায়। মালতিদি জনে জনে পড়া ধরেন, পালাবার কোনও উপায় নেই। তখন খুব বিরক্ত বোধ হত। এখন মনে হয় ভারতবর্ষের পুরো ইতিহাস 'স্বদেশ ও সভ্যতা'-র হাত ধরে মাথার মধ্যে গেঁথে গেছে। ভুল হবার কোনও উপায় নেই। মোগল সাম্রাজ্য মন্দ না লাগলেও আমার প্রিয় ছিল ব্রিটিশ পিরিয়ড। পর পর সব গভর্নর জেনারেলের কথা। লর্ড কার্জনকে মনে হত দুষ্ট লোক, বঙ্গভঙ্গের কল্যাণে। আর লর্ড বেন্টিঙ্ক ভাল, সতীদাহ রদ করায় ভূমিকা আছে।

হাফ ইয়ার্লির রেজাল্ট বার হল। ক্লাস টিচার হাতে রিপোর্ট দিলেন— আমার নামের পাশে লেখা 3rd। আমি অবাক থার্ড— ফার্স্ট-সেকেন্ড হওয়াকে তো স্ট্যান্ড করা বলে, তাই না? অ্যানুয়াল পরীক্ষাতে ফার্স্ট-হলাম। তারপর থেকে প্রথম স্থানটা আমার বরাবরের জন্য বাঁধা রইল। আত্মীয়স্বজন পারিবারিক বন্ধুরা সবাই বললেন, আরে, এ যে দেখছি পড়াশুনোয় বেশ ভাল। আমি চিরদিনই বইয়ের পোকা, বাবার লাইব্রেরির বইয়ের মধ্যে মুখ গুঁজে পড়ে থাকি। কিন্তু স্কুলে যাবার আগে পর্যন্ত পড়াশুনোর কোনও তুলনামূলক বিচার সম্ভব হয়নি। মনে হয় পাস-ফেল প্রথা, পরীক্ষার গ্রেড স্থির করার বোধহয় একটা ভূমিকা আছে।

স্কুলে যাবার সবচাইতে বড় লাভ হল অনেক সমবয়সি বন্ধু পেলাম। আমার 'ওনলি চাইল্ড' জীবনের খোলস থেকে ধীরে ধীরে বাইরের পৃথিবীতে আসা। আমি নিজে থেকে খুব ভাব করতে পারি না। যারা এগিয়ে এসে কথা বলে তাদের সঙ্গে ভাব হয়ে যায়।

এমন নয় যে আমার বন্ধুবান্ধব ছিল না। মামাতো মাসতুতো আর খুড়তুতো জ্যাঠতুতো মিলে অনেক ভাইবোন। মামাবাড়ির দিকে ভাইবোনদের মধ্যে আমি ছোটদের দিকে কারণ মা ছোট মেয়ে। আমার বাবা সবচেয়ে বড় ভাই সেই সূত্রে আমি ওদিকে সকলেরই দিদি। তবে তাদের সঙ্গে তো নিত্য দেখা বা বসবাস নেই। পারিবারিক অনুষ্ঠানে মিলিত হওয়া।

ফুলমামা আর অ্যানামামিমার থিয়েটার রোডের ফ্ল্যাটে বছরে একবার পুরো মামাবাড়ি একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া হয়। আন্ট অ্যানা বসবার ঘরের সোফা সেট সরিয়ে দেন। মেঝেতে আসন পেতে খাওয়া হত। মাছের মাথা দিয়ে মুগের ডাল আর চাটনিটা মনে পড়ছে। দই দেবার সময়ে ওপরের জমাট অংশ কে পাবে তাই নিয়ে কাড়াকাড়ি। আন্ট অ্যানা বলেন দইয়ের আপার পোর্শন (upper portion) নিয়ে এরা এ রকম করছে কেন!

বড়মাসিদের পাঁচ মেয়ের মধ্যে ছোট লেবুদি আমার চেয়ে চার বছরের বড় হলেও আমার বেশ বন্ধু। সে বলে, আচ্ছা একটু ভেবে দ্যাখ কুড়ি বছর বাদে আমরা এ রকম একসঙ্গে হয়েছি। কল্পনা কর, তখন কেমন হবে!

তাই তো! কল্পনা করার চেষ্টা করি। লেবুদি বলে, তোর তখন বিয়ে হয়ে গেছে। তিনটে ছেলেমেয়ে আছে। আর খুব মোটা হয়ে গেছিস।

শুনে আমি হি-হি করে হাসতে থাকি। লেবুদি বলে চলে— আমার বিয়ে-টিয়ে হয়নি। রোগা জিরজিরে চেহারা আর খুব খিটখিটে, অবিবাহিত স্পিনস্টার যেমন হয় আর কী!

আরও একপ্রস্থ হা-হা, হি-হি! এখানে বলে রাখা ভাল, লেবুদি যার ভাল নাম শোভা ডাক্তার হয়েছিলেন। বিবাহ করেছিলেন খ্যাতনামা ফটোগ্রাফার সুনীল জানাকে। তাঁদের একটি ছেলে, একটি মেয়ে। কালে আমিও বিবাহ করলাম, তিনটি ছেলেমেয়েও আছে। তবে খুব বেশি মোটা হয়ে যাইনি।

ফুলমামা কিরণ রায়ের অকালমৃত্যু থিয়েটার রোডের বাড়ির এই

আনন্দের হাট বেশিদিন ধরে রাখতে পারেনি। অনেক কাল পরে ছোটমামা বিমল আর তাঁর স্ত্রী ডলি মামিমা ওবাড়িতে সংসার পাতলেন। দিদিমাকেও নিয়ে এলেন তাঁদের কাছে। তখন আবার হাসিখুশির দিন ফিরে এসেছিল। আজও থিয়েটার রোড অধুনা শেকসপিয়র সরণি দিয়ে যেতে-আসতে ১৪ নম্বর বাড়িটার দিকে চেয়ে দেখি আমার ছেলেবেলার মামাবাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

স্কুলে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু হল কুমকুম। সে গায়ে পড়ে এসে আমার সঙ্গে ভাব করল। আমি তো নিজে থেকে কিছু করতে পারি না। ওর মনটা ছিল খুব সরল আর সুন্দর। আমি পরীক্ষায় ভাল করলে ও আনন্দে আত্মহারা। ও নিজে পড়াশুনোতে তত ভাল ছিল না। আমি রাগ করতাম। পড়াতে আর একটু মন দিতে বলতাম। চোখে ভাসে বারান্দা দিয়ে কুমকুম ছুটতে ছুটতে আসছে— জানিস ইংরেজির রেজাল্ট বেরিয়েছে। তুই সাতাত্তর পেয়ে ফার্স্ট এসেছিস। আর তুই? আমি জিজ্ঞাসা করি। চল্লিশ না কত যেন পেয়েছে। রাগ করে বলি, তবে অত লাফাচ্ছিস কেন?

একগাল হেসে কুমকুম বলে, তুই তো ফার্স্ট হয়েছিস। ও মনে রাখবে কবে আমার জন্মদিন। হাতে করে ছোটখাটো কিছু নিয়ে আসবে। কলেজে পড়ার সময়ে ওর বিয়ে হয়ে যায়। নিতান্ত অসময়ে সে দুরারোগ্য ক্যানসারে মারা যায়।

আমাদের মেয়েদের মধ্যে একঝাঁক বন্ধু আমরা একসঙ্গে ঘুরি। আবার দু'জন দু'জন করে সখীর মধ্যেও গভীর সখ্য। নাম করতে লোকে একসঙ্গে বলে কৃষ্ণা- কুমকুম, মীরা-ইলা ইত্যাদি। কুমকুম, মীরা, ইলা বন্ধুত্ব প্রথম থেকে স্কুলের পরেও বজায় ছিল। একটু পরে বোধহয় ক্লাস টেন-এ বন্ধু হল জয়ন্তী, মাধবী আরও অনেকে। জয়ন্তী অসুস্থ হয়ে পড়ে অনেক দিন কোথায় যেন স্যানেটরিয়ামে ছিল। আমার সঙ্গে দীর্ঘ পত্রালাপ চলত। মাধবীর দাদু ছিলেন অধ্যাপক বেণীমাধব বেজবরুয়া। সেও তার মা দাদুর কাছেই থাকত। আমি ক্ষুদ্র জাগতিক ব্যাপারে বরাবর নিস্পৃহ। আমি কখনও তাকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিনি। অন্য মেয়েরা বলত, হ্যাঁ রে কেন তুই মামাবাড়িতে থাকিস? শুনেছিলাম সে বলেছে তার বাবা ইউরোপে গিয়েছিলেন, যুদ্ধের জন্য আটকে পড়েছেন। আর ফিরতে পারেননি। স্কুল

ছাড়ার পর মাধবীর সঙ্গে আমার তেমন যোগাযোগ ছিল না। অনেক কাল পরে আমি কলকাতার একটি কলেজের প্রিন্সিপাল, আর সে প্রিন্সিপাল অন্য আর একটি কলেজের। তখন আবার ঘন ঘন দেখা হত।

অন্য একটি কারণে মাধবীর কথা মনে পড়ছে। আমার বিবাহের পর শিশিরকুমার বসুর সঙ্গে সঙ্গে আমি নেতাজি গবেষণার কাজে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে পড়ি। নেতাজি রিসার্চ ব্যুরোতে শিশিরকুমার সব নেতাজি সহযোগীদের ডেকে নেন। ইউরোপে যাঁরা কাজ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে নাম্বিয়ার, ব্যাস, আবিদ হাসান, স্বামী, গিরিজা মুখার্জি সকলে আমাদের একান্ত আপনজন হয়ে পড়েন।

গিরিজা মুখার্জির সঙ্গে আমার প্যারিস, মুম্বাই, কলকাতা অনেকবার দেখা হয়। উনি তাঁর জার্মান পত্নী ও কন্যাকে নিয়ে প্রবাসে থাকতেন। আমার সঙ্গে যখনই ওঁর দেখা হত অন্যান্য নানা কথার মধ্যে প্রায়ই বলতেন— বাঙালি মেয়েদের কোনও তুলনা হয় না। এমন লাবণ্য, এমন কোমলতা— 'গ্রেস' ইংরেজি কথাটাও ব্যবহার করতেন— পৃথিবীর আর কোথাও পাবেন না। আমি শিশিরকুমারকে বলেছিলাম, বহুদিন দেশের বাইরে থাকার ফলে ওঁর মনে বাঙালি মেয়েদের প্রতি একধরনের দুর্বলতা আছে।

একবার 'নেতাজি অরেশন' দিতে আমরা ওকে নেতাজির জন্মদিনে কলকাতায় নিয়ে এলাম। অতি চমৎকার 'অরেশন' দিলেন। পরদিন কাগজে খবর, ছবি ছাপা হল। এর এক-দু'দিন পর চেম্বার থেকে বার হয়ে শিশিরকুমার একটু চিন্তিত মুখে আমাকে বললেন— আজ এক ভদ্রমহিলা তাঁর স্বামীকে নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। মহিলা একবার গিরিজাবাবুর সঙ্গে দেখা করতে অত্যন্ত ব্যাকুল কিন্তু— আমি ওঁর কথার মাঝখানে জিজ্ঞাসা করলাম, কে এসেছিল? মাধবী?

উনি বিস্মিত হয়ে বললেন, তুমি চেনো নাকি! তবে কি তুমি ঘটনাটা জানো? উনি বললেন, উনি গিরিজা মুখার্জির মেয়ে, একবার তাঁর বাবাকে দেখতে চান।

আমি জানতাম, মাধবী বলত ওঁর বাবা নেতাজির সঙ্গে কাজ করেছেন। কিন্তু আগে আমি দুটো সূত্র এক করে কখনও ভাবিনি। একটা মহাযুদ্ধ

কত মানুষের কত পরিবারের জীবনে কতরকম ট্র্যাজিক অভিজ্ঞতা বয়ে আনে!

পড়াশুনো ছাড়াও স্কুলজীবনে নানারকম অনুষ্ঠান হয়। প্রাইজ বিতরণের দিন তো খুবই বড় উৎসব। আমার এক ক্লাস ওপরে পড়েন সুমিত্রাদি। স্কুলের ফাংশন হলেই সুমিত্রাদি খুব সুন্দর রবীন্দ্রসংগীত করেন। ইনি আজকের সুমিত্রা সেন, রবীন্দ্রসংগীত জগতে সুপরিচিত। দুই গায়িকা কন্যা ইন্দ্রাণী ও শ্রাবণীর জননী।

আমার ওপর সব সময়ে ইংরেজি অভিনয় বা কবিতা আবৃত্তির ভার পড়ে। প্রথমবার অ্যান্টনির স্পিচ— জুলিয়াস-সিজার থেকে আবৃত্তি করে সকলের প্রশংসা পেলাম। বাবার কথায় একটা সাদা চাদর গায়ে জড়িয়ে একটু রোমান টাচ দেওয়ার চেষ্টা হল। ড্রেস রিহার্সালের দিন অধ্যক্ষা সুজাতা রায় ইংরেজি অনুষ্ঠান ঠিকঠাক হচ্ছে কি না দেখতে এলেন। তখন স্কুলের সঙ্গে কলেজ শুরু হয়েছে। সুজাতা রায়ের অ্যাকাডেমিক জগতে বেশ খ্যাতি। কলেজের প্রিন্সিপাল হয়ে এসেছেন। তাঁর সামনে রোমান কায়দায় কাঁধে চাদর ফেলে আমি Friends, Romans, Countrymen lend me your ears. I come to bury Ceaser not to praise him... আবৃত্তি করে চলি। উনি যেন আশ্চর্য এবং খুশি হন। বাবা শিখিয়েছেন শুনে জিজ্ঞাসা করেন, উনি বুঝি অনেক দিন বিলেতে ছিলেন? আমার বাবা চারুচন্দ্র চৌধুরী, মেজকাকা নীরদচন্দ্র এবং অন্যান্য ভাইরাও ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জে ছেলেবেলা কাটিয়েও কী করে চমৎকার ইংরেজি শিখেছিলেন সে তো আমার কাছেও একটা রহস্য।

একবার 'ম্যাকবেথ' নাটকে ম্যাকবেথ হলাম। রক্তমাখা ছুরি অর্থাৎ কিনা আলতা লাগানো রাংতার ছুরি নিয়ে প্রবেশ করে বললাম— I have done the deed. দর্শকের আসনে আমার মায়ের কোলে বসা ন'কাকা মন্মথচন্দ্রের শিশুপুত্র 'দিদি, দিদি' বলে এক চিৎকার। দর্শকদের মধ্যে মৃদু হাসির ঢেউ।

যতই স্টেজে নেমে নাটক ইত্যাদি করি না কেন আমার চিরদিনের আড়ষ্টতা, নার্ভাসনেস কোনওদিনও আমাকে ছেড়ে গেল না। একমাত্র সন্তান হওয়া আর স্কুলে না-যাওয়াকে আমি এর জন্য দায়ী করি। পরীক্ষা

দেবার ভীতিও আজীবন। পরীক্ষার আগে বা লোকের সামনে গান-টান করতে বললে আমার হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যায়। এই দুর্বলতার কারণে জীবনে অনেক ভুগতে হয়েছে। স্কুলের উৎসবে স্টেজে গানও করেছি মনে পড়ছে। 'গাগরি মোরি ভরনন দে'— রাগ আড়ানা।

আমার গান শেখার ব্যাপারটা বেশ এলোমেলো। মানে ফরম্যাল গানে তালিম নেবার কথা বলছি। আমাদের তো রবীন্দ্রসংগীতের বাড়ি। বাবার কাছে ছেলেবেলা থেকে গান শিখছি। ন'কাকাও শিখিয়েছেন। কিছুদিন শেখাতেন বিনয়কাকা। তিনি দেশের অর্থাৎ ময়মনসিংহের মানুষ। কেন তিনি বিনয়কাকা ঠিক ব্যাখ্যা করতে পারব না। অর্গ্যান বাজিয়ে চুল ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বিনয়কাকা শেখাচ্ছেন— 'আমের মঞ্জরী, ও আমের মঞ্জরী' পরবর্তীকালে দেখা হলে বিনয়কাকা বলতেন— 'তোকে আমি গান শিখিয়েছি অনেক, মনে আছে তো?' ওঁর নিজের ছেলেমেয়েরাও নাচে-গানে পারদর্শী। ছেলে চন্দ্রোদয়, তার বউ হয়ে এল আমাদের মম অর্থাৎ মমতা শংকর। আত্মীয়তা বন্ধুত্ব সব কেমন যেন জড়িয়ে যায়।

বাবার কেন যেন ধারণা ছিল গান আমার খুব একটা হবে না। নাচের জন্য ছেলেবেলায় অনেক প্রশংসা পেয়েছিলাম। কিন্তু মেয়েদের পক্ষে নাচ বজায় রাখা সম্ভব নয়— এমনি কী একটা ব্যাখ্যার ফলে নাচ নিয়ে বেশি অগ্রসর হওয়া যায়নি। মায়ের দিকে চেয়ে বাবা বলতেন, 'গানটা ওর খুব হবে না। মামাবাড়ির দিকটা পেয়েছে।' মা তো শুনেই বেজায় ক্ষিপ্ত।

এলাহাবাদ থেকে আমার এক দূর সম্পর্কের মামিমা কলকাতায় আমাদের কাছে এলেন। কুন্তলামামিমা চমৎকার গান গাইতেন। আমার তো ধারণা হয়ে গিয়েছিল এলাহাবাদে সকলেই গান করেন। এলাহাবাদের সঙ্গে নানারকম মিউজিক কনফারেন্স জড়িত ছিল।

কলকাতায় কুন্তলামামিমা মাকে নিয়ে সিনেমা দেখতে যাবেন। আমাকে সঙ্গে নেবার জন্য বাবার অনুমতি চাইলেন। বাবা তৎক্ষণাৎ না বলে দিলেন। বললেন, বড়দের সিনেমা আমাকে নেওয়া যাবে না। সিনেমার নাম 'শেষ উত্তর' প্রধান ভূমিকায় প্রমথেশ বড়ুয়া আর কাননদেবী। বাবাকে অনেক বোঝানো হল এ ছবিতে তেমন বড়দের ব্যাপার কিছু নেই। শেষ পর্যন্ত অনুমতি মিলল। 'শেষ উত্তর' আমার দেখা প্রথম বাংলা ছবি। আমার যে

কী ভাল লেগেছিল। বিশেষ করে কাননদেবী ও তাঁর গান। পরবর্তীকালে কাননদেবীর জীবনের শেষ লগ্নে তাঁর টালিগঞ্জের বাড়িতে গিয়েছি, তাঁকে নিয়ে এসেছি নেতাজি ভবনে। তখনও আমার মুগ্ধতাবোধ ছিল। 'শেষ উত্তর' দেখে আসার পর আমি সবগুলি গান আপন মনে গেয়ে যাই। 'আমি বনফুল গো', 'তুফান মেল, তুফান মেল'— তবে আমার সবচেয়ে প্রিয় গান— 'যদি আপনার মনে মাধুরী মিশায়ে এঁকে থাকো কারো ছবি—'।

কুন্তলামামিমা বাবাকে বললেন, 'তবে যে আপনি বলেন ওর গান তেমন হবে না। এ যে একবার শুনে সব গান নিখুঁত গলায় তুলে ফেলেছে।' কথা নিয়ে সমস্যা নেই। সিনেমা হল-এ চটি বই পাওয়া যেত, সব গান আছে তার মধ্যে। বাবা স্বীকার করলেন আমার মধ্যে গান আছে। বাবার আবার সব কিছুতেই বাড়াবাড়ি। কোথাও বাংলা গান শেখার ব্যবস্থা করে দেবেন তা নয় বললেন, 'ক্ল্যাসিক্যাল ভিত্তি না থাকলে ভাল গান হবে না।' অতএব সংগীতশিক্ষক হয়ে এলেন গিরিজাশংকর চক্রবর্তী। তখন তাঁর যথেষ্ট বয়স হয়েছে। আজ বুঝতে পারি এ আমার পরম সৌভাগ্য, প্রথম গানের তালিম হল ওঁর মতো শিক্ষকের হাতে। কাফি রাগে ধরলেন— 'মুঝে বাতিয়া বানাউ নহি বারবার। তেরে মিনতি কর তো গয়ি হার্‌হার্'। তারপর বৃন্দাবনী সারং— 'বনবন ঢুড়ানা যাঁউ, কিত হু ছুপ গয়ে কৃষ্ণ মুরারী—'। রাসবিহারী অ্যাভিনিউর চারতলাতে বয়সের কারণে উনি উঠতে পারবেন না। ছেদ পড়ে গেল।

গিরিজাবাবু বললেন, 'আমার এক ছাত্র আজকাল বেশ তৈরি হয়েছে, তাকে ঠিক করে দিই। তার নাম তারাপদ চক্রবর্তী।' রাসবিহারী অ্যাভিনিউর বাড়ি থেকে স্কুলে যাওয়া, পড়াশুনো— নানাকারণে গান বন্ধ রইল। অবশ্য আমাদের রবীন্দ্রসংগীতের পারিবারিক আসর চালু আছে। তারাপদবাবুর কাছে গান শেখা শুরু হল আমার কলেজ জীবনে। তিনি তখন নিজেই খ্যাতনামা।

মিহিজামে বেণুবন বাড়ি হবার পর থেকে আমরা পুজোর ছুটিতে আর অন্য কোথাও যেতাম না। প্রতিবারই গন্তব্য সাঁওতাল পরগনা। ছুটিতে বাবার হাতে সময় থাকত। আমাকে পড়াতেন। বেণুবনের বারান্দায় বসে

সংস্কৃত শিখেছি নরঃ নরৌ নরাঃ। আরও পরে বাবার কাছে গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় পুরো পড়লাম ওই বারান্দাতেই। ইংরেজি সাহিত্যও বাদ নেই। ওয়ার্ডসওয়ার্থের 'লুসি' কবিতার মেয়েটি মনের মধ্যে মোহজাল বিস্তার করেছিল।

কিন্তু সে বছর ফুলমামা কিরণ এসে বাবাকে ধরলেন, চলুন এ বছর আমার বাড়ি। দার্জিলিঙের আগের শহর ঘুম-এ ফুলমামা বাড়ি কিনেছেন। নাম বালাক্লাভা। কলকাতার গরমকালে সত্যি অ্যানামামিমার বেশ কষ্ট হত। ওঁর কল্যাণেই তো আমরা সেই কোন ছেলেবেলা থেকে জানি পৃথিবীর কোথাও নিউ ইংল্যান্ড বলে একটা জায়গা আছে। সেখানে খুব ঠান্ডা। সেই দেশ থেকে এসেছেন আমাদের মেমমামিমা। তখন কে জানত আমার জীবনে আমি বারবার ফিরে যাব নিউ ইংল্যান্ডে। আর কলকাতার পরেই বস্টন হয়ে পড়বে আমার প্রিয় শহর। এই বস্টন শহরেই অ্যানামামিমা বড় হয়েছেন। কলেজে পড়ার সময়ে আলাপ হল চার্লস নদীর অপর পাড়ে কেমব্রিজের এম আই টি-তে পড়ুয়া এক ভারতীয় ছাত্রের সঙ্গে। কে জানে কী ছিল বিধাতার মনে। বিবাহসূত্রে এসে পড়লেন সুদূর ভারতে। ১৯৩২-৩৩ সালে ইংরেজ বউ অনেকের ছিল। কিন্তু আমেরিকান বউ ছিল না।

সে বছর পুজোর ছুটি ঘুম-এ বালাক্লাভা বাড়িতে। ঘুম রেলস্টেশনের মতো মিষ্টি চেহারার স্টেশন ভূভারতে কেউ খুঁজে পাবে না। টিনের চালার নীচে ছোট্ট এক টুকরো প্ল্যাটফর্ম। ঝিকঝিক করে টয় ট্রেন আসে-যায়। পথঘাট বেশির ভাগ সময়ে কুয়াশার চাদরে ঢাকা। মাঝে মাঝে ছোট ট্রেনে চেপে বাতাসিয়া লুপ পার হয়ে দার্জিলিং চলে যাই। সারাদিন বেরিয়ে, কেনাকাটা সেরে ম্যাল থেকে ক্যালকাটা রোড ধরে হেঁটে বাড়ি ফিরে আসা। অবশ্য অকল্যান্ড রোড ধরেও আসা যায়। ক্যালকাটা রোডই বেশি সুন্দর মনে হয়। আবার রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছোটগল্পে অমর করে রেখে গেছেন এই পথ। ক্যালকাটা রোডের কুয়াশার মধ্যে বসেছিলেন বেগমসাহেবা, যার জীবন থেকে প্রেম হারিয়ে গেছে।

অকল্যান্ড রোডে একটা বাড়িতে রয়েছেন পারিবারিক বন্ধু হুমায়ুন কবীর ও তাঁর স্ত্রী শান্তি কবীর। তাঁরা মাঝেমাঝেই ব্রেকফাস্ট খেতে আসেন আমাদের বাড়ি। অ্যানামামিমা ব্রেকফাস্ট তৈরি করেন, কিচেন থেকে

ভেসে আসে ডিম আর সসেজ ভাজার গন্ধ। কবীরদের দুটি ছেলেমেয়ে সঙ্গে আসে। আমার চাইতে ছোট। তাদের নাম পাশা আর লায়লা। লায়লা খুবই ছোট, বাগানে চেরি কুড়িয়ে বেড়ায়। পাশা আর আমি গল্প করি। পাশা জিজ্ঞেস করল— আচ্ছা হোরাইজনের হাইট কত বল তো? মানে দিগন্তের উচ্চতা? এ আবার কেমন প্রশ্ন! পাশা বলল, পারলে না তো। হোরাইজনের উচ্চতা হল তোমার চোখের যা উচ্চতা তাই। জবাব দিতে না পেরে আমি অপ্রস্তুত। এমনি অপ্রস্তুত যে আজও ঘটনাটা মনে রয়ে গেছে।

বালাক্লাভা বাড়ির উলটো দিকে একটু নীচে একটি ছোট কটেজ। তাতে রয়েছেন সুহৃদচন্দ্র সিংহ ও তাঁর স্ত্রী। সুহৃৎ সিংহমশাই ময়মনসিংহের সুসং-এর রাজপরিবারের আর তাঁর স্ত্রী শান্তিনিকেতনে পড়াশুনো করেছেন। চমৎকার দম্পতি, আমাদের বেশ ভাব হল। তাঁদের একটি বাচ্চা মেয়ে, সে আমার খুব ভক্ত। আমি তাকে গল্প শোনাই। প্রথমদিন সে বলেছিল আমার নাম সুছন্দা সিংহ, তোমার নাম কী? আমি বললাম, তুমি সিংহ তা হলে আমি পিঁপড়ে। সে আমার কথা বিশ্বাস করল। সে আমাকে ডাকে 'পিঁপড়ে, ও পিঁপড়ে শোন—'

বালাক্লাভাতে আমাদের দিন বেশ আনন্দে তরতর করে কেটে যেত। দু'-এক রাতে অসুবিধা হত, বাড়িটা টাইগার হিল যাবার রাস্তার উপর। দার্জিলিং থেকে টাইগার হিল যাবার বা ফিরতি পথে গেস্ট হাউস মনে করে টুরিস্টরা কখনও কখনও দরজায় নক করতেন। হঠাৎ একদিন কলকাতা থেকে সেজকাকা ক্ষীরোদচন্দ্র— ডা. কে সি চৌধুরী নামেই যিনি অধিক পরিচিত— ঘুম-এ হাজির। সেজকাকা আর ফুলমামা দু'জনেই খুব ট্রেকিং-এ উৎসাহী। ঠিক হল দু'দলে ভাগ হয়ে দু'দিকে ট্রেকিং-এ যাওয়া হবে। ফুলমামা, অ্যানামামিমা আরও দু'-একজনের দল যাবেন নাথুলা পাস-এ। সেজকাকার নেতৃত্বে বাবা-মা সেজকাকার ডাক্তার বন্ধু শচীন সর্বাধিকারী যাবেন ফালুট, সন্দকফু। আমাকে নিয়ে হল মুশকিল। আমি কী করব। আমাদের শেরপা গাইড কিরকিন বললে আমার মতো ছোট লেড়কি ট্রেকিং-এ নেওয়া ঠিক হবে না। আমার পাহাড়ে চড়া মিস হয়ে যায় আর কী! বয়স তখন তেরো, দেখতে বরাবরই যেমন ছোটখাটো। রেখে

যাবার জায়গা নেই তাই শেষ পর্যন্ত আমায় নিতেই হল। কিরকিন জানে না আমি হাঁটাতে খুব পটু। বাবা মা-র চিরদিনের বাতিক মর্নিংওয়াকের আমি সঙ্গী।

সারাদিন পার্বত্য পথে হাঁটা, রাতে নির্জন বাংলোয় নিদ্রা। ঘুম থেকে মণিভঞ্জন। আজকাল শুনি মোটরগাড়িতে অনেকদূর যাওয়া যায়। সেকালে এমনকী মণিভঞ্জনও পায়ে হেঁটে যাওয়া। পরদিন অনেক চড়াই-উতরাই পার হয়ে পৌঁছলাম টংলু। হাঁটা পথে প্রথমে কোনও পাহাড়ের প্রায় চূড়ায় পৌঁছে যাই, তারপরই পাহাড় থেকে পথ নেমে যায় উপত্যকায়— সেখানে দু'-চার ঘর মানুষজন বসবাস করে। বাইরে গোরু চড়ছে, বাড়ির লাগোয়া কড়াইশুঁটির খেত। মা ভাব জমিয়ে ফেলেন বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে। তারা খেত থেকে তুলে কড়াইশুঁটি দেয় আমাদের। এত মিষ্টি আর টাটকা কড়াইশুঁটি কখনও খাইনি। আবার চড়াই উঠতে শুরু করি। এ রকম বেশ কয়েকবার ওঠানামার পর টংলুর বাংলোতে পৌঁছলাম। সেজকাকা দলনেতা ঘোষণা করলেন আজ আমরা দশহাজার ফিটের উপরে, কারও মাউনটেন সিকনেস হয়নি তো? মাথা ধরেছে, কোনওরকম অস্বস্তি? আমার মাথার ভিতর দপদপ করছে। ভয়ে কিছু বলি না।

কিন্তু কতক্ষণ চেপে রাখব? মাথার ভিতর যেন ঘোড়দৌড় শুরু হয়েছে। দশ হাজার ফিটের উপরে উঠলে মাউনটেন সিকনেস হওয়া স্বাভাবিক। আমার চেপে রাখার চেষ্টায় হিতে বিপরীত। আমি ভাবছি এখুনি কেউ বলবে কিরকিন বলেছিল ছোট লেড়কি না-নিয়ে আসতে। শয্যা নিলাম। পরে কিরকিন খুব যত্ন করল। সে সব জানে। বিছানায় এনে দিল গরম কড়াইশুঁটির স্যুপ। পায়ের কাছে হটওয়াটার বটল ভরতি গরম জল। বললে, একটু শুয়ে থাকো ঠিক হয়ে যাবে।

টংলুর বাংলোর জানালা থেকে সোজা দেখা যায় অনেক দূরে বালাক্লাভা। অন্ধকার নেমে এলে জানালা দিয়ে টর্চের আলোর নিশানা করি আমরা। সুহৃদ সিংহরা ওদিক থেকে আলো ফেলবেন আগেই ঠিক করে রাখা আছে। ওদিকে আলো দেখা গেল বটে তবে সত্যিই টর্চ ফেলছে কেউ, নাকি কার্ট রোডে গাড়ির হেডলাইট কিছু বোঝা গেল না।

পরদিন টংলু থেকে ফালুট। প্রকৃতির চেহারা পালটে যাচ্ছে, গাছপালা

কমে আসছে, ন্যাড়া মতো পাহাড়। অবশ্য যখন নীচের দিকে নেমে আসছি তখন আবার বিশাল পাইনগাছ। পাহাড়ের গায়ে বড় বড় যাকে বলে হেয়ারপিন বেন্ড, দুই পাহাড়ের মাঝে বেগে নীচে নেমে যাচ্ছে পাগলা ঝোরার মতো ঝরনা। কোথাও জলের উপর সাঁকো। সেজকাকা বসে পড়ে বলেন, দাঁড়া একটু জিরিয়ে নিই। ফ্লাস্ক থেকে মিল্ক কফি ঢেলে চুমুক দেন। আমাদের বাড়িতে সবাই গান করতে পারে, এস্রাজ বাজায়, অর্গ্যান বাজায়। একমাত্র সেজকাকা সংগীতরসে বঞ্চিত। কিন্তু পাইনগাছের ছায়ায় ঝরনার ধারে সাঁকোর উপর বসে কফিতে চুমুক দিয়ে সেজকাকাও কিঞ্চিৎ বেসুরো গলায় গেয়ে ওঠেন— 'এই তো ভাল লেগেছিল আলোর নাচন পাতায় পাতায়—'

আমাদের সঙ্গে দুটো ঘোড়া আছে। পরিশ্রান্ত হলে চড়তে হয়। মা মাঝেমাঝেই ঘোড়ায় চড়ছেন। দক্ষিণ ভারতীয় কায়দায় কাছা দিয়ে শাড়ি পরে মা বেশ অবলীলায় ঘোড়ায় চড়ে পাহাড়ে ওঠেন। খুব স্মার্ট দেখাচ্ছে মাকে। অনেকটা উতরাই নেমে একটা ছোট চায়ের দোকানের মতো পেয়ে আমরা বসে পড়ে চা খাচ্ছি। উলটোদিকের চোরা বাটো অর্থাৎ শার্ট কাট দিয়ে তিন-চার জন ইউরোপিয়ান ট্রেকার নেমে এল। আমাদের দিকে চেয়ে হেসে বললে, হোয়াট আর ইউ এনজয়িং? আরক? আরক লাগবে না। প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যেই আছে মাদকতা।

ফালুট বাংলোতে পৌঁছেই মা রান্নাঘরে ঢুকে পড়েন। ডিনার টেবিলে গরম চিকেন কারি আর পোলাও দেখে সেজকাকা বলেন, কী ভাগ্যিস বউদিকে সঙ্গে এনেছিলাম।

সন্দকফুর পথে সত্যিই গাছপালা খুব কমে গেল। পাথুরে পথ। পাহাড়ের এদিকে যদি মেঘ তো অপরদিকের চূড়া রোদে ঝলমল। মেঘ ও রৌদ্রের খেলার মধ্য দিয়ে পৌঁছে গেলাম বাংলোতে। মা বাংলোর কিচেনে। কিরকিন মাকে সাহায্য করছে। সব বাংলোতে ভিজিটর বই আছে। সবাই নাম সই করেছে, অনেকে মন্তব্য লেখে। আমার বাতিক সেগুলো পড়া। বেশির ভাগ ভিজিটরই ইংরেজ বা অন্য ইউরোপীয় দেশের। ইন্ডিয়ান খুব কম তখনও। একজন ইংরেজ লিখেছে ফালুটের বাংলোর ফার্নিচার মোটেই ভাল নয়। তার পরদিন আর এক ইংরেজ লিখেছেন Fool, did

you expect Grand Hotel here? মূর্খ, তুমি কি এখানে গ্র্যান্ড হোটেল আশা করেছিলে?

পরদিন ভোরে সন্দকফুতে বরফে ঢাকা যে পাহড়ের চূড়ার সার আকাশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে দেখলাম তা জীবনে ভুলব না। মাউন্ট এভারেস্টের চূড়ায় প্রভাতের প্রথম আলোক এসে পড়ল, মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে গেল শিখর থেকে শিখরে, শুভ্র চূড়ায় রক্তিম ছোঁয়া। চরাচর ব্যাপী সেই অপার্থিব দৃশ্যের দিকে চেয়ে কোনও নাম-না-জানা শক্তির উদ্দেশে মন থেকেই বলতে হয়— 'মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধূলার তলে'।

এবার ফিরতি পথে। রমাম্, রিম্বিক হয়ে মণিভঞ্জন, ঘুম। অনেক পথ নেমে এসেছি। চারিদিকে গভীর জঙ্গল। পাহাড়ে চড়াই উঠতে গান গাওয়া যেত না। এখন পথ চলতে চলতে আমি গান করি— 'পথের শেষ কোথায় কী আছে শেষে'। মা আর ড. সর্বাধিকারী মাঝে মাঝে এখনও ঘোড়ায় চড়েন। আমরা পুরো পথই হেঁটে চলি। ফরেস্ট বাংলোগুলি বনের মধ্যে কী সুন্দর। শীত কম, আমরা বারান্দায় বসি। ডা. সর্বাধিকারী বললেন, গান করো। পাইনগাছের মাথায় চাঁদ। আমি গান ধরি— 'ভরি দিয়া পূর্ণিমা নিশা অধীর অদর্শন তৃষা—'।

আমাদের মতোই নাথুলা পাস থেকে ফুলমামারা নিরাপদে ফিরে এলেন। সভ্য জগতে ফিরে এলাম। সত্যিই সভ্যজগৎ? চারিদিকে যুদ্ধের দামামা। ম্যালে ইংরেজ আর আমেরিকান সৈনিকের ভিড়। অ্যানামামিমা আমার মতোই সৈন্য দেখলে ভয় পান। অনেক আমেরিকান অফিসার বিদেশে এক আমেরিকান মহিলাকে দেখে খুশি হয়ে আলাপ করতে চান। আন্ট অ্যানা ভয়ে অস্থির। তবু ওরই মধ্যে একজন দু'জনকে ডেকে চা খাওয়াতে হয়। এরই মধ্যে টয় ট্রেন চড়ে ঝিকঝিক করে পাহাড় থেকে নেমে পড়ি।

টয় ট্রেনের প্রতি আমার চিরদিনের দুর্বলতা। বিশেষ করে শেষের কাচে ঢাকা সেলুনে যদি চড়তে পারি, চারিদিকের পাহাড় খাদ, ঝরনা, পাইনের জঙ্গল দেখতে দেখতে নামা-ওঠা। উঠবার সময়ে ট্রেনের চাকায় যেন ধ্বনিত হয় টুং-সোনাদা ঘুম— দার্জিলিং। নব্বুইর দশকে টয় ট্রেন বন্ধ

হয়ে পড়েছিল অনেক দিন। আমি যখন পার্লামেন্টে, রেলমন্ত্রী রামবিলাস পাসোয়ান একদিন সাংসদদের মিটিং ডেকে কার কী চাই জিজ্ঞাসা করলেন। আমি অনুরোধ করলাম দার্জিলিঙের টয় ট্রেনটা আবার চালু করে দিন। আর একটা ছোট্ট অনুরোধ ছিল কলকাতার পাতাল রেলে 'ভবানীপুর' বলে যে স্টেশনটা আছে সেটার নাম 'নেতাজি ভবন স্টেশন' করে দিলে ভাল হয়। তা রামবিলাস পাসোয়ান বললেন, হো যায়গা। রাজনীতিকরা কথা রাখেন বলে শোনা যায় না। কিন্তু বেশ অল্পদিনের মধ্যে দুটো 'হো যায়গা' ঠিকঠাক হয়ে গিয়েছিল।

যুদ্ধের মধ্যে শুধু দার্জিলিঙের ম্যাল তো নয় কলকাতার পথঘাটও সৈন্যে ছেয়ে গেছে। বেশির ভাগ আমেরিকান সেনা, সাদা আছে কালোও আছে। রাসবিহারী অ্যাভিনিউর বাড়ির পিছনে লেকের ধারে সৈন্যদের বিশাল ব্যারাক। লেকের পথে আমাদের নিত্য যাতায়াত। বাবার সঙ্গে হেঁটে চলেছি, কখনও বা সঙ্গে আছে চেনে বাঁধা আমার পোষা কুকুর জিমি। ওদিক থেকে আসা কোনও সৈনিক হ্যালো বলে হাত বাড়িয়ে দিতেই আমি একেবারে রাস্তার অপর দিকে। বাবা হয়তো মাথা ঝাঁকালেন একটু। সন্ধ্যার পর সৈন্যদের সব ব্যারাকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, চারিদিকে লোহার রেলিং-এ ঘেরা। আমি আর লেবুদি পাশের রাস্তা দিয়ে চলেছি, লেবুদির হাতে একটা মোটা বই। সে মেডিকেল কলেজে ঢুকেছে। রেলিং-এর ওপার থেকে এক সৈন্য বললে— Hi, let me have a look at your book— আমার তো ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেছে। লেবুদির খুব সাহস। সে দাঁড়িয়ে পড়ে জবাব দিল— go and buy one!

আমার স্কুলের কোনও এক বন্ধু বলত, তাদের পাশের বাড়িতে অনেক আমেরিকান অফিসার থাকে। তারা খুব ভদ্র। ওদের বাড়ি খেতে আসে। ছবি দেখায় দেশে ফেলে এসেছে স্ত্রী, শিশুসন্তান। অন্যরকম দৃশ্যও চোখে পড়ে। সাদার্ন অ্যাভিনিউর মাঝখানে ঘাসের ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে বিদেশি সৈন্য ও একধরনের দিশি স্ত্রীলোককে অশোভন অবস্থায় চোখে পড়ে। দেখি না, দেখি না ভাব করে লোকে হেঁটে চলে যায়।

আমরা যখন কলকাতার পথেঘাটে ইংরেজ আমেরিকান সৈন্যের ভিড় দেখছি তখন দেশের পূর্ব সীমান্তে কিন্তু প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছে। দেশের ভিতর

স্বাধীনতা সংগ্রাম কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়েছে। ৪২-এর আন্দোলন ইংরেজ সরকার সর্বশক্তি দিয়ে দমন করে ফেলার পর আর সব নেতৃবৃন্দকে জেলে বন্দি করে ফেলার পর থেকে কেমন যেন সব স্তিমিত হয়ে পড়েছে। কিন্তু পূর্ব সীমান্তে যে নেতাজি সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজ ইম্ফল আর কোহিমার রণাঙ্গনে মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস রচনা করেছে সে খবর আমাদের কাছে পৌঁছয়নি।

এপ্রিল ১৯৪৪-এ আই.এন.এ-র সৌকত মালিক ইম্ফলের অদূরে ময়রাং-এ তেরঙা পতাকা উত্তোলন করেছেন। ময়রাং-এর কাছে একটা পাহাড়ে প্রবল যুদ্ধ হয়েছে। চারিদিকে 'দিল্লি চলো' ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। পাহাড়ের ওপর টেগনুপোল পাস-এ আই এন এ-র ঘাঁটি গেড়ে চার মাস ছিলেন প্রথম ডিভিসনের অধিনায়ক মহম্মদ জমান কিয়ানি। জুলাই মাসে প্রবল বর্ষণের মধ্যে এল রিট্রিট করবার অর্ডার। ইম্ফল থেকে সেই রিট্রিট সামরিক ইতিহাসের এক বিপর্যয়। কিন্তু তারপরও পুনর্গঠিত আর্মি নিয়ে মাউন্ট পোপাতে প্রেম সাহ্গল, ইরাবতী নদীর তীরে নেহরু ব্রিগেড নিয়ে গুরুবক্স সিং ধীলন বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন। কোহিমা ফ্রন্টে আছেন শাহ নওয়াজ খান। এসব খবর অবশ্য আমাদের জানা নেই। খবর কাগজে যুদ্ধের খবর পড়ি। চার্চিল, রুজভেল্ট, স্ট্যালিনের খবর পড়ি। সব যুদ্ধেই ইংরেজরা জিতছে, অন্তত খবর কাগজে, রেডিয়োতে তাই পড়ি বা শুনি।

আমাদের নিস্তরঙ্গ পারিবারিক জীবনে ফুলমামা মাঝেমাঝেই ঝড় তুলে দেন। একদিন এসে বললেন আমাদের এই ছোট ফ্ল্যাটে একটা বিবাহ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে হবে। বাবার স্টাডি আর মাঝের বসবার ঘর টেবিল চেয়ার সোফা পিছনে টেনে ফরাশ পেতে ফেলা হল। ঘটনা হল আমার এক মাসতুতো দিদিকে এক যুবক বিয়ে করতে চেয়েছেন। বাড়ির এক ছেলের বন্ধু তিনি, আসা-যাওয়াতে কন্যাকে দেখেছেন। বরপক্ষের সম্মতি আছে। বরের পিতার নাম আদিনাথ সেন, থাকেন বালিগঞ্জ প্লেসে। কিন্তু কন্যার পিতার আপত্তি হবার সমূহ সম্ভাবনা। সেন মানে বৈদ্য, তিনি রক্ষণশীল, বৈদ্য-কায়স্থ বিবাহে নিশ্চয় ঘোর আপত্তি করবেন। একেবারে সব ঠিক করে বিবাহসভায় তাঁকে আনা হবে। ফুলমামা এইসব ষড়যন্ত্রের নায়ক। মাসিমা মেয়েদের নিয়ে আমাদের কাছে থাকছেন। হবু বর

মাঝেমাঝে গাড়ি চালিয়ে এসে কন্যাকে নিয়ে বেড়াতে যান। বেশ বাংলা সিনেমার ছবির মতো ঘটছে।

দেখতে দেখতে বিয়ের দিন এসে পড়ল। বরকর্তা আদিনাথ সেন, বর দেবনাথ— আমরা ডাকি ছোকনদা— আর বরের ছোটভাই আর বোন, তুতুদা ও সোনাদি বলে তাদের পরিচয় করানো হল— সকলে উপস্থিত হলেন। ম্যারেজ রেজিস্ট্রার এসেছেন— বর কন্যা ও অন্যান্যরা সইটই করছেন। একপাশে আমি গানের দলের সঙ্গে গান ধরেছি— 'প্রেমের মিলন দিনে সত্যসাক্ষী যিনি অন্তরযামী নমি তারে আমি নমি নমি—'

এমনি সময়ে কন্যার পিতা আমার বড় মেসোমশাইর প্রবেশ। তিনি ডাক্তার, বেশ নামকরা সিভিল সার্জন। তখন আছেন বর্ধমানে কাজের স্থলে। শুনেছি আমার জন্মও তাঁরই হাতে, ঢাকাতে মায়ের পিতৃগৃহে। কন্যার পিতার মুখ গম্ভীর, থমথমে। একটু হুমহাম করলেও অতিথিজনের উপস্থিতিতে ক্রোধ প্রকাশ করতে পারছেন না। খবর পেয়ে ট্রেনে বর্ধমান থেকে সোজা পৌঁছেছেন।

সিনেমার গল্পের মতোই সব শেষ হল। সেকালে সিনেমার বাবার চরিত্র বাঁধাধরা ছিল। তিনি সিল্কের হাউসকোট পরতেন, মেয়ের নিজের পছন্দর বিয়েতে প্রবল আপত্তি, প্রচণ্ড রাগারাগি করতেন। শেষ পর্যন্ত মেনে নিতেন, মধুরেণ সমাপয়েৎ। এইসব সিনেমার বাবারা বাস্তবজীবনেও আমাদের সমাজব্যবস্থায় বহুদিন ছিলেন।

সেনদের বালিগঞ্জ প্লেসের বাড়িতে কিছুদিন খুবই যাতায়াত ছিল। বাড়ির মধ্যে বিরাট পুকুর। মা খুব সাঁতার কাটতে ভালবাসতেন, পূর্ববাংলার মেয়ে। বাড়ির মধ্যে পুকুর পেয়ে মা আমাকে নিয়ে প্রায়ই সাঁতার কাটতে চলে যান। আমাদের দিদি সুধা, আমরা ডাকি কুটিদি, ওরাও আসে যায়। ততদিনে ছোকনদার ছোটভাই বিয়ে করেছেন রমা নামে একটি সুন্দরী মেয়েকে। তাঁদের ফুটফুটে ছোট্ট মেয়েটিকে কোলে নিয়ে কুটিদি মাঝেমাঝে হাজির হন। পরে ছোকনদা কার্শিয়াং-এর কাছে চা-বাগানে কাজ নিয়ে চলে যান। বালিগঞ্জ প্লেসের বাড়িতে আমাদের যাতায়াত তেমন রইল না। কিছুকাল পরে আত্মীয়ামহলে আলোচনার বিষয়বস্তু হয়েছিল যে রমা সিনেমায় নেমেছেন। সেকালে ওই ধরনের

বাড়ির মেয়ে বা বধূর 'সিনেমায় নামা' আলোচ্য হবার মতোই ঘটনা। কালে রমা সুচিত্রা সেন নামে খ্যাতনামা অভিনেত্রী হন। সেদিনের ফুটফুটে ছোট্ট মেয়েই পরবর্তীকালে মুনমুন সেন।

আমি ক্লাস নাইনে পড়ছি। সাল তখন ১৯৪৫। আমাদের জাতীয় জীবনে এবং পারিবারিক জীবনেও সে বছর বেশ গুরুত্বপূর্ণ। যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি ঘুরে গিয়েছে। অ্যাংলো-আমেরিকানদের জয় সুনিশ্চিত। ইউরোপে যুদ্ধ তো শেষ হয়ে গেছে। নাৎসি জার্মানির পতনের পর এখন জাপানের পরাজয়ের অপেক্ষা। জাপানিরা বেশ একগুঁয়ে। হারতে থাকলেও চালিয়ে যাচ্ছে, শিগগির পরাজয় স্বীকার করবে মনে হয় না। ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দেশের অভ্যন্তরে একেবারে স্তব্ধ।

আন্ট অ্যানা সেই যে বিবাহের পর ভারতে এসেছেন আর বাপের বাড়ি আমেরিকা যেতে পারেননি। ইউরোপে যুদ্ধ শেষ হয়েছে, উনি মাকে দেখার জন্য আমেরিকা যাবেন ঠিক হল। মায়ের বয়স হয়েছে। জাহাজে যাবেন সব বন্দোবস্ত হল। সেকালে জাহাজই তো ভরসা। কত সপ্তাহ যেন লাগত পৌঁছতে? আজকের দিনে সকালে রওনা হয়ে বিকেলে পৌঁছে যাই। যাবার আগে বারবার ফুলমামাকে নিষেধ করে গেলেন যেন ট্রেকিং-এ না যান। ডা. বিধান রায় একটা চেক আপ করেছেন। বলেছেন, 'ওহে, পাহাড়ে চড়াটড়াটা কমাও। একটা লাং— ফুসফুস তত সুবিধের নেই।' ডা. বিধান রায় তখন দেশের বিশিষ্ট ডাক্তার। তিনি কংগ্রেস নেতাও বটে। উনি শিল্পোদ্যোগ খুব পছন্দ করেন। তরুণ শিল্পোদ্যোগী কিরণ রায় ওঁর স্নেহের পাত্র। বেঙ্গল ল্যাম্প বাঙালিদের প্রতিষ্ঠিত শিল্প। ফুলমামাও জড়িত তার সঙ্গে।

ফুলমামা একদিন এসে বললে, 'কী রে আমার সঙ্গে ট্রেক করতে যাবি। আমি যাব গ্রিন লেক, কাঞ্চনজঙ্ঘার পাদদেশে, উচ্চতা আঠারো হাজার ফিট।' আমি তো যাবার জন্য লাফিয়ে উঠলাম। কিন্তু বাবা উৎসাহে জল ঢেলে দিলেন। এ বছর ছুটিতে মিহিজাম যেতেই হবে। মাঝে মাঝে না-গেলে বাড়ি ঠিকঠাক রাখা যায় না। বেজায় মন খারাপ হয়ে গেল।

আমরা মিহিজাম চলে গেলাম। অ্যানামামিমা বস্টনের পথে জাহাজে।

ফুলমামাকে বারণ করার কেউ রইল না। ফুলমামা দুই বন্ধু— মি. পান্ডিয়া আর মি. অরিন্দম সেনকে নিয়ে গ্রিন লেক চললেন। আমাদের কাছে শেরপা কিরকিনের খুব প্রশংসা শুনেছিলেন। সে পাহাড় বোঝে আর একান্ত বিশ্বস্ত। গাইড হিসেবে কিরকিনকে ডেকে নিলেন। মিহিজামে গিয়ে মুরগি আর খরগোশ-এর পিছনে ছুটে বেড়াই, আতাগাছ থেকে ফল পেড়ে নিই, বরাখাম্বা দিয়ে গোকুল কুয়োর জল তুলছে, দেখি গোলাপ ফুলের বেড— আলো করে ফুল ফুটে আছে। গ্রিন লেক যেতে না পারার দুঃখ ভুলে যাই।

একদিন সকালে এক টেলিগ্রাম এল। বাবা একঝলক দেখেই পকেটে পুরে বাড়ি থেকে হনহন করে বার হয়ে গেলেন। একটু পরে ফিরে এলেন কলকাতাগামী যে ট্রেন আসছে তাতে ফিরে যাবার টিকিট কিনেছেন। মাকে বললেন, অফিস থেকে খবর দিয়েছে, জরুরি দরকার। মা শুধু বললেন, তুমি সত্যি কথা বলছ তো?

কলকাতার বাড়িতে প্রবেশ করতেই অনেক দিনের পরিচারিকা সহচরী আমাকে বললে, শুনেছ তো সাহেব মামাবাবু পাহাড়ে মারা গেছেন। চমকে চারিদিকে চেয়ে দেখলাম মা ঘরে নেই। বাবা বললেন, এখনি বোলো না, একটু সময় দাও। বাবাই ধীরে দুঃসংবাদ দিলেন। মা একেবারে ভেঙে পড়লেন। আদরের ছোটভাই, অল্প ছোট, যাকে বলে পিঠোপিঠি। আর বিদেশিনী ভাইবউও খুব আপনজন। ততক্ষণে বাড়ি আত্মীয়স্বজনে ভরে গেছে। সেজকাকা ক্ষিরোদচন্দ্র মাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন— বউদি, আমি রেসকিউ পার্টি নিয়ে কালই রওনা হয়ে যাব। আমি ওকে ফিরিয়ে আনবই।

কিন্তু রেসকিউ পার্টির আর তো প্রয়োজন নেই। কাকে ফিরিয়ে আনবেন? খবর এল হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট থেকে রেসকিউ দল রওনা হয়েছিল। তারা হতাশ হয়ে ফিরে এসেছে। প্রচণ্ড তুষারপাতে রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে। পরের গ্রীষ্মকালের আগে আর কিছু করা সম্ভব নয়।

ধীরে ধীরে কী ঘটেছিল তা আমরা জানতে পারলাম। মি. পান্ডিয়া, মি. সেনের মুখে কিছু শুনলাম। ফুলমামার ডায়েরি ওঁরা নিয়ে এসেছিলেন তার থেকেই কিছু খবর পাওয়া গেল। এবার পাহাড়ে উঠতে ফুলমামা খুব

হাঁপিয়ে পড়ছিলেন। আর মাঝেমাঝেই পিছিয়ে পড়ছিলেন। যেদিন গ্রিন লেকে পৌঁছে ক্যাম্প করবার কথা সেদিন ওই উচ্চতায় বেশ কষ্ট করে উঠছিলেন। অত শীতেও চড়াই ওঠার সময়ে বেশ গরম লাগে। পুলওভার খুলে কাঁধে ফেলে হাঁটছিলেন। সেটা পথে কোথায় পড়ে গেল। আবার অনেকখানি নেমে এসে কুড়িয়ে নিলেন।

ফুলমামা তাঁর ডায়েরিতে লিখেছেন, 'আর কখনও কিরকিনকে নিয়ে আসব না। সে কেবলি রোজ বলে, সাহেব তোমার শরীর ঠিক নেই, ফিরে চলো। আরও বলে, আকাশের অবস্থা ভাল নয়। মনে হয় তুষার ঝড় উঠবে, চলো নেমে যাই। গাইড যদি সবসময়ে এ রকম বলে তা হলে কীরকম লাগে।'

গ্রিন লেকে তাঁবু খাটানো মাত্র ক্লান্ত ফুলমামা শুয়ে পড়লেন। পরদিন সকালে উঠে ফিরতি পথ ধরার কথা। সকালে উনি বিছানা থেকে উঠে দাঁড়াতে পারছেন না। কিরকিনের মতে এটা একধরনের অলটিটিউড সিকনেস। কয়েকশো ফুট নামিয়ে নিলেই ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু দাঁড়াতে পারছেন না, হাঁটা দূরস্থান। কিরকিন দু'জন শেরপাকে নীচে পাঠিয়ে দিলে লম্বা কাঠ জোগাড় করে আনবে। স্ট্রেচার বানিয়ে তাইতে শুইয়ে কাঁধে করে নামানো হবে। অতএব সেদিন ক্যাম্পে থেকে যাওয়া হল। বিকেলের দিকে ঝোড়ো হাওয়া আর বরফ পড়া শুরু হল। বিকেলে এক সাহেবের সঙ্গে একজন কুলি মালবাহক ওঁদের ক্যাম্পের সামনে দিয়ে হেঁটে গেলেন। তাঁরা বললেন, আর একটু ওপরে ক্যাম্প করবেন। 'তারা এগিয়ে যাবার পরেই সে কী প্রচণ্ড তুষার ঝড় শুরু হল কী বলব!' বলেছেন সহযাত্রীরা। পাশাপাশি দুটো ক্যাম্প। একটাতে পান্ডিয়া আর সেন। অন্যটাতে ফুলমামা শুয়ে আছেন। অতি বিশ্বস্ত কিরকিন বসে আছে পাশে। দু'-একবার মা, মা, বললেন উনি। আর একটা কী নাম সাহেব বলছিলেন কিরকিনের তেমন বোধগম্য হল না— হিন্দোলে বা ওইরকম কিছু। অ্যানা না ডেকে উনি স্ত্রীকে ওঁর ডাকনাম হিন্ডলে বলে ডাকতেন। রাত আটটা নাগাদ কিরকিন দৌড়ে অন্য ক্যাম্পের দু'জনকে ডেকে আনল। বললে, সাহেবের নিশ্বাস পড়ছে না। ১৯ অক্টোবর ১৯৪৫, কাঞ্চনজঙ্ঘার পাদদেশে, প্রচণ্ড তুষারপাতের মধ্যে হিমালয়ের নির্জনতায় ফুলমামা কিরণ রায় শেষ নিশ্বাস ফেললেন।

পরদিন সকালে স্ট্রেচারের কাঠ নিয়ে দুই শেরপা হাজির। তারা নিজেদের প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে এক দিন এক রাতের মধ্যে ডবল মার্চ করে নীচে নেমে গিয়ে কাঠ জোগাড় করে এনেছে। দুই বন্ধু আর শেরাপারা মিলে সেই কাঠের চিতা সাজালেন। বরফ পড়ে চলেছে ঝুপঝুপ করে। পান্ডিয়া সাহেব পরে আমাদের বলেছিলেন— আমাদের যে কী মনের অবস্থা, নিজেরাও প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারব মনে হচ্ছে না। কোনওমতে চিতায় অগ্নি সংযোগ করেই ওরা নীচে নামার পথ ধরলেন। এমন ভাবে প্রাণভয়ে দ্রুত নামতে লাগলাম মনে হল মৃত্যু আমাদের তাড়া করে আসছে। বরফ পড়েই চলেছে, আর কিছুক্ষণের মধ্যে পথ বন্ধ হয়ে যাবে। সেই যে এক ইংরেজ আর তাঁর মালবাহক শেরপা আগে ক্যাম্প করবে বলল তারা গেল কোথায় কে জানে! তখন নিজেদেরই জীবনমরণ প্রশ্ন।

পাঁচ

কদম্ কদম্ বঢ়ায়ে যা

বস্টনে পৌঁছেই আন্ট অ্যানা জানলেন তাঁর মা ক'দিন আগে, উনি যখন সমুদ্রপথে, তখন মারা গিয়েছেন। কয়েক দিন পরে খবর এল স্বামীর ট্র্যাজিক মৃত্যু। চিঠি যেতেও তো লাগত অনেক দিন। টেলিগ্রাম কতদিনে যেত, কীভাবে খবর পেলেন, মনে নেই। ফিরবার জাহাজে রওনা হলেন। আবার কয়েক সপ্তাহ সমুদ্রযাত্রা, নিঃসঙ্গ, শোকস্তব্ধ এক নারীর। মনে পড়ে বাবা-মা সান্ত্বনা দিয়ে চিঠি লিখতেন, ওঁরও চিঠি এল। সেকালে বন্দরে নেমে চিঠি পোস্ট করা বা এসে থাকলে নিয়ে নেওয়া হত।

আমাদের পারিবারিক জীবনে যখন দুঃখ ও শোক, জাতীয় জীবনে কিন্তু তখন নতুন উদ্দীপনা। বেয়াল্লিশের আন্দোলন দমন করা এবং নেতৃবৃন্দকে কারাগারে বন্দি করার পর জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে একেবারে ভাটা পড়ে গিয়েছিল।

১৯৪৫ সালের শেষদিকে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ও তাঁর মুক্তি বাহিনী আজাদ হিন্দ ফৌজের কথা দমকা হাওয়ার মতো সারা দেশের উপর দিয়ে বয়ে যেতে লাগল। সিঙ্গাপুর, রেঙ্গুন (ইয়াংগন), কুয়ালালামপুর সব শহর থেকে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি বা আজাদ হিন্দ ফৌজের যুদ্ধবন্দিদের দেশে এনে কারাগারে রাখা হচ্ছে। অনেকেরই ঠাঁই হয়েছে দিল্লির লালকেল্লার কাঁটাতারে ঘেরা বন্দিশালায়। ইংরেজ শাসকেরা এত বুদ্ধিমান, এতদিন দক্ষতার সঙ্গে সাম্রাজ্য রক্ষা করে এসেছেন। কিন্তু এই সময়ে তারা এক মস্ত বড় ভুল সিদ্ধান্ত করে বসলেন। স্থির হল তিনজন আই এন এ অফিসারের বিচার হবে। লালকেল্লায় বসবে বিচারশালা। দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে

এদের এ-বিষয়ে তারা নিঃসন্দেহ। হাজার হাজার সৈনিকের তো সেভাবে বিচার সম্ভব নয় তাই বেছে নেওয়া হল তিনজন অফিসার। ঘটনাচক্রে তাদের মধ্যে একজন হিন্দু, একজন মুসলমান ও একজন শিখ।

প্রেমকুমার সাহগল, শাহ নওয়াজ খান ও গুরুবক্স সিং ধীলনের বিচার শুরু হলে পর সারা ভারত উত্তাল হয়ে উঠল। প্রতিবাদে গর্জন করে উঠল সমস্ত দেশ। সে এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতি। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজের বীরত্ব ও আত্মত্যাগের কাহিনি যতই দেশময় ছড়িয়ে পড়তে লাগল ততই ভারতবাসীর মনে একধরনের নতুন গর্ববোধ জেগে উঠল। আমরা দেখেছি আমাদের রাজনীতিক নেতারা কারাবরণ করেছেন, তাঁদের প্রতি আমরা শ্রদ্ধাশীল। কিন্তু এই প্রথম আমরা এমন একজন নেতাকে দেখলাম যিনি একাধারে সমরনায়ক ও রাষ্ট্রনায়ক। আমাদের নিজস্ব সেনাবাহিনী গঠিত হয়েছিল। সেই বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রে জয়ী হয়ে দেশের পূর্ব সীমান্ত দিয়ে দেশে প্রবেশ করেছিল। ইম্ফল, কোহিমা পৌঁছে গিয়েছিল। এসব কি কম গর্বের কথা! এমনকী গাঁধীজিও লালকেল্লায় বন্দি আই এন এ সৈনিকদের দেখতে গিয়ে বললেন, আপ তো হমারা সৈনিক হ্যায়! গাঁধীজি সুভাষের সবচাইতে বড় কৃতিত্ব স্বীকার করলেন মুক্তিযুদ্ধের সৈনিকদের মধ্যে একতার বন্ধন। বিশাল দেশ এই ভারত। তার ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন ধর্ম, ভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের মধ্যে সুভাষচন্দ্র গড়ে তুলেছেন অভূতপূর্ব ঐক্য। ভিন্ন আইডেন্টিটি, ভিন্ন সত্তা অস্বীকার করতে বলেননি সুভাষ। সৈনিকেরা নিজে বলছে আমি প্রথমে ভারতীয় তারপর বাঙালি বা পাঞ্জাবি বা তামিল অথবা হিন্দু, মুসলমান শিখ কিংবা খ্রিস্টান। তাদের সংগ্রাম আদর্শের সংগ্রাম। ইতিহাসের সেই বিশেষ সময়ে নেতাজি তাদের সামনে তুলে ধরেছেন একমাত্র লক্ষ্য— বিদেশি শাসন থেকে দেশের মুক্তি। সুভাষচন্দ্রকে বলা হয় গাঁধীজির বিদ্রোহী পুত্র। সেই পুত্রের কৃতিত্বে 'বাপু' প্রভাবিত হয়েছিলেন।

যতই আই এন এ সৈনিকদের যুদ্ধবন্দি হিসেবে দেশে নিয়ে আসা হতে লাগল ততই মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়তে লাগল তাদের কীর্তির কাহিনি। সামরিক দিক থেকে বিচার করলে নেতাজি ও তাঁর আজাদ হিন্দ ফৌজ অবশ্যই পরাজিত হয়েছিলেন। কিন্তু রাজনীতিক দিক থেকে তাঁরা জয়ের

স্বাদ পেলেন। তাঁদের অবদানের কথা দেশের মানুষ যখন জানতে পারলেন তখন বন্দি অফিসারদের মুক্তির জন্য দেশ জুড়ে শুরু হল বিক্ষোভ আন্দোলন। ইংরেজ শাসকদের কাছে যা নিতান্ত দুশ্চিন্তা ও বিড়ম্বনা হল তা হল ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আর্মিতে বিদ্রোহ। মুম্বাইতে ইন্ডিয়ান নেভি অর্থাৎ নৌবাহিনীতে বিদ্রোহ হল। কলকাতার কাছে ব্যারাকপুরেও সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহ। ইংরেজ সরকার বুঝে গেল ভারতীয় সেনাবাহিনীর সরকারের প্রতি আনুগত্য ভেঙে গিয়েছে। এই বিক্ষুব্ধ বাহিনী দিয়ে সাম্রাজ্য শাসন আর সম্ভব নয়।

যুদ্ধের শেষ লগ্নে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, Roads to Delhi are many— দিল্লিতে পৌঁছবার অনেক পথ আছে, কোনও-না-কোনও পথে আমরা দিল্লি পৌঁছব। দিল্লির লালকেল্লায় আমরা তেরঙা পতাকা উত্তোলন করব। বিজয়ীর বেশে নয় পরাজিত সৈনিকের বেশে মুক্তিযোদ্ধারা লালকেল্লায় বন্দি হিসেবে পৌঁছলেন। সারা দেশে তাঁদের নিয়ে যে উন্মাদনা তাতেই যুদ্ধক্লান্ত, অর্থনীতি বিধ্বস্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত টলমল করে উঠল।

আই এন এ-র বন্দি সৈনিকদের প্রতি দেশবাসীর এই অতুল ভালবাসার কথা নিয়ে অন্য ধরনের একটি কাহিনি বহুদিন পরে শুনেছিলাম। আমার পুত্র সুগত তখন কেমব্রিজে ছাত্র। সে অর্থনীতিক ইতিহাস নিয়ে পড়তে গেছে। বিশেষ করে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় সে বেছে নিয়েছে কারণ তার অধ্যাপক হবেন ইকনমিক হিস্ট্রির খ্যাতনামা স্কলার এরিক স্টোকস।

ছাত্রের সঙ্গে আলাপ হবার পর অধ্যাপক এরিক স্টোকস বলেছিলেন, কোনওদিন একজন বোস আমার ছাত্র হয়ে আসবে জানতাম না। যুদ্ধের সময়ে এরিক ছিলেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। প্রথামতো যুদ্ধে নাম লেখাতে হল। যুদ্ধের শেষের দিকে উনি আসেন কুয়ালালামপুরে। ভার পড়েছে আই.এন.এ. যুদ্ধবন্দিদের দেশে নিয়ে যেতে হবে। মিলিটারি ট্রাক ভরতি বন্দিসেনা। সঙ্গে রয়েছেন অন্য ট্রাকে ভারতীয় বাহিনীর লোকজন। শহরের রাস্তার দু'পাশে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছেন মানুষজন। যখন বিজয়ী বাহিনী প্রবেশ করে তখন মানুষ তাকেই জয়ধ্বনি দেয়। এই প্রথম দেখলেন মানুষ জিন্দাবাদ বলছে আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দিদের,

বিজয়ী দলকে নয়। জাহাজে করে নিয়ে এলেন বন্দিদের কলকাতায়। এবার কলকাতা-দিল্লি নিয়ে যাবেন। ট্রেনে যাত্রা। ঠিক হল বড় বড় স্টেশন দিনের বেলায় এড়িয়ে চলতে হবে। কোথায় এড়িয়ে যাবেন? কী বড় কী ছোট প্রতিটি স্টেশনে হাজার মানুষ জোর করে ট্রেন থামাচ্ছে, বন্দিবীরদের জন্য মালা আর ফুল হাতে দাঁড়িয়ে আছে জনতা।

আমি আমার সমবয়সিদের সঙ্গে সে সময়ে কলকাতার পথে লেফট-রাইট করে মার্চ করছি। সঙ্গে গানও চলছে— 'কদম কদম বঢ়ায়ে যা, খুশিকে গীত গায়ে যা—'। আজাদ হিন্দ ফৌজের জনপ্রিয় সংগীত। হিন্দুস্থান পার্কের ছোট এক টুকরো মাঠে অজিতাদি পাড়ার অল্পবয়সিদের মার্চ করতে শেখাচ্ছেন। অজিতাদি তখন মেডিকেল কলেজের ছাত্রী। পরে তিনি হয়েছিলেন বিশিষ্ট মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. অজিতা চক্রবর্তী।

জাপানের হিরোশিমা আর নাগাসাকিতে অ্যাটম বোমা বর্ষণ করেছে আমেরিকা। আগস্ট মাসে জাপান আত্মসমর্পণ করেছে। নেতাজি ভেবেছিলেন ইম্ফলের মধ্য দিয়ে পূর্ব ভারতে প্রবেশ করলে আসাম, বাংলা, তারপর সারা দেশ বিদ্রোহ করবে বিদেশি শাসকের বিরুদ্ধে। তাঁর স্বপ্ন ছিল কলকাতায় যখন মুক্তিবাহিনী ঢুকবে আগে যাবে রানি অভ্ ঝাঁসি রেজিমেন্টের মহিলা সৈনিকেরা।

নেতাজি সুভাষচন্দ্রের সে স্বপ্ন সত্য হয়নি। কিন্তু বন্দি সৈনিকদের প্রতি সহানুভূতিতে সারা দেশে সেপ্টেম্বরের থেকে পরের বছর অর্থাৎ ১৯৪৬-এর গোড়া পর্যন্ত প্রচণ্ড বিক্ষোভ চলতে থাকে। কলকাতা শহরেও ছাত্রদের উপর পুলিশের গুলি চলে। বড় বড় মিছিল বার হত সেসময়ে। সেইসব মিছিলে কংগ্রেসের তেরঙা পতাকার পাশাপাশি মুসলিম লিগের চাঁদ-তারা-শোভিত সবুজ পতাকাও দেখা যেত। এমনকী কাস্তে-হাতুড়ি চিহ্নিত লাল পতাকাও মাঝেমধ্যে চোখে পড়ত। যদিও কমিউনিস্টরা স্বাধীনতা সংগ্রামে অন্যদিকে ছিলেন। তাঁরা মহাত্মা গাঁধীর 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন সমর্থন করেননি। আর নেতাজি সুভাষচন্দ্র তো তাঁদের চোখে দেশদ্রোহী। সোভিয়েত রাশিয়া যেহেতু ইংরেজ-আমেরিকার সঙ্গে আছে সেকালের আমরা-ওরা বিভাজনে ওরা ওদের সঙ্গেই ছিলেন।

দেশের মানুষের মনের এই নবজাগ্রত দেশপ্রেমের পূর্ণ সদ্ব্যবহার কংগ্রেস

দল করতে পেরেছিল। লালকেল্লায় বিচারাধীন আজাদ হিন্দ ফৌজের তিন অফিসারের সমর্থনে তারা ভুলাভাই দেশাইয়ের নেতৃত্বে আইনজীবী দাঁড় করাল, এমনকী জওহরলাল নেহরুও তাঁর কালো ব্যারিস্টারের গাউন পরে বিচারসভায় হাজির হলেন। সুভাষের মেজদাদা জননায়ক শরৎচন্দ্র বসুকে কংগ্রেস ফিরিয়ে নিল। সে সময়ে খবর কাগজের একটি ছবি, সর্দার প্যাটেল ও শরৎচন্দ্র বসু আলিঙ্গনাবদ্ধ লোকের আলোচনার বিষয় হয়েছিল। ১৯৪৬-এ দেশ জুড়ে যে নির্বাচন হয় তাতে শরৎচন্দ্র বসুর অবদান ছিল। তিনি নিজেও নির্বাচিত হয়ে দিল্লির সেন্ট্রাল অ্যাসেম্বলিতে কংগ্রেস দলের নেতার পদে বৃত হলেন। এত সব ঘটনা বড়দের আলোচনার বিষয়। আমি স্কুলের পড়াশুনো নিয়ে ব্যস্ত, তা ছাড়া দেশাত্মবোধক গান আর লেফট-রাইট করা তো আছেই।

আমাদের বৃহত্তর পারিবারিক জীবনে সেসময়ে একটা ঝড় বয়ে গিয়েছিল। ফুলমামা কিরণ রায়ের মৃত্যুর পর বেঙ্গল ল্যাম্প-এর শিল্প প্রতিষ্ঠানে একটা বড়রকম কর্পোরেট আলোড়ন ঘটে গেল। 'ছোটরা বড়দের কথায় থাকবে না'—এই ধরনের একটা হুকুমনামার ফলে আমাদের এর বাইরে রাখা হত। তবুও জানি যখন জানা গেল ফুলমামা তাঁর সবকিছু অর্থাৎ তার মধ্যে পারিবারিক প্রতিষ্ঠান বেঙ্গল ল্যাম্প-এর শেয়ার ইত্যাদি তাঁর পত্নী অ্যানাকে দিয়ে গেছেন, তখন পরিবারে একটা ভীতি সৃষ্টি হল বিদেশিনী বধূ কী করবেন, কাকে হয়তো বা শেয়ার বেচে দেবেন। এই উইল করেছিলেন আমার পিতৃদেব, অবশ্য তিনি শুধু আইনজ্ঞর কাজটুকু করেছিলেন। কে কাকে তাঁর সম্পত্তি দেবেন তাতে বলার কিছু ছিল না। তবুও অনেকে অপ্রসন্ন হলেন। নানাবিধ ডিরেক্টরদের মিটিংয়ে বাবা একজন ডিরেক্টর এবং কোম্পানির আইন পরামর্শদাতা হিসেবে মত দিলেন অ্যানা ফিরে আসুক, সে তো সমুদ্রে জাহাজে। তারপর তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলে যা হোক কিছু করা যাবে। অন্য ভ্রাতারা রাজি হলেন না। উনি আসার আগেই শেয়ারহোল্ডারদের মিটিং ডেকে নানারকম ব্যবস্থাদি নিলেন। বাবার একাকী কণ্ঠস্বর চাপা পড়ে গেল। বাবা পদত্যাগ করলেন মূলত অ্যানামামিমার প্রতি অকারণ সন্দেহের প্রতিবাদে। দিদিমা বাবাকে খুব আশীর্বাদ করলেন। তিনি বেশ কিছুদিন আমাদের সঙ্গে ছিলেন। সবচেয়ে

ছোটমামা যিনি কুট্টিমামা, কুট্টিকাকু এইসব নামে পরিচিত ছিলেন তখন ছাত্রাবস্থায় আমেরিকাতে। ফুলমামা তাঁর পড়াশুনোর ভার নিয়েছিলেন। পড়াশুনো অর্ধসমাপ্ত রেখে তিনিও দেশে ফিরে এসে আমাদের রাসবিহারী অ্যাভিনিউর ফ্ল্যাটে চলে এলেন। আজ এতদিন বাদে পিছন ফিরে মনে হয় কাউকেই দোষ দেওয়া যায় না। অন্য ভ্রাতারাও একধরনের মানসিক নিরাপত্তাহীনতার শিকার হয়েছিলেন। আমাদের কাছেই একটি ফ্ল্যাটে ছোটমামা ও দিদিমা প্রথমে ছিলেন তারপর ফুলমামার থিয়েটার রোডের বাড়ি তাঁদের বাসস্থান হয়। কালের নিয়মে সাময়িক মতান্তর একসময়ে ঠিক হয়ে যায়। তবে সম্পর্ক একবার আঘাত পেলে আগের মতো আর জোড়া লাগে না। অ্যানামামিমা তাঁর প্রতি—যাঁদের তিনি অত্যন্ত আপনজন মনে করতেন তাঁদের কোনও আস্থা নেই দেখে অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে আমেরিকা ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নেন। উনি চলে যাবার পর দিদিমা আমাদের একটি চিঠিতে গভীর দুঃখের সঙ্গে লেখেন, 'অ্যানা চলিয়া গিয়াছে'—ফুলমামার ডাকনাম ধরে লেখেন, 'উহার কোনও চিহ্ন আমার কাছে আর রহিল না।'

অ্যানামামিমা তখনও ঘুম-এ বালাক্লাভা বাড়িতে রয়েছেন, তখন বাবার কাছে হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট থেকে টেলিগ্রাম এল, 'শীঘ্র আসুন, কিরণ রায়ের দেহাবশেষ পাওয়া গেছে।' বাবা, মা, বড়মামা নৃপেন রায় তৎক্ষণাৎ রওনা হয়ে গেলেন। বরফ গলা শুরু হওয়া মাত্র রেসকিউ পার্টি পাঠানো হয়েছিল। তার নেতৃত্বে ছিল এক তরুণ শেরপা, তার নাম তেনজিং নোরকে। তখন জানা ছিল না এভারেস্ট বিজয়ের পর এডমন্ড হিলারি ও তেনজিং নোরকের নাম একদিন বিশ্ববিখ্যাত হয়ে যাবে।

তেনজিং বললে, সহযাত্রীরা যদি চিতায় আগুন না দিতেন তবে ওঁর অবিকৃত দেহ পেতাম। যেমন পেলাম সেই সাহেব যাত্রীর সঙ্গী শেরপাকে। সে জড়োসড়ো হয়ে একটা বরফের গুহার মধ্যে বসে রয়েছে চিরকালের মতো। সেই ইউরোপিয়ান পর্বত অভিযাত্রীকে পাওয়া গেল না। কোনও অ্যাভালানস হিমবাহ ভাসিয়ে নিয়ে গেছে তাঁকে। তাঁর মা দার্জিলিংয়ে পুত্রের অপেক্ষায় ছিলেন। বড়মামা নৃপেন রায় তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতার শেষ কাজ

দার্জিলিং শ্মশানে করলেন। আমার বাবা উপস্থিত ছিলেন। অ্যানামামিমা আমার মাকে কেবলই বলতে লাগলেন, কেন ওরা ওকে ডিস্টার্ব করল, হিমালয়ের কোলে সে খুব শান্তিতে ছিল। বহুকাল বাদে নিউইয়র্কে ইস্ট ৪৭ স্ট্রিটের অ্যাপার্টমেন্টে বসে এসব দিনের কথা হত। তখন তিনি আমার শিশুপুত্র ও কন্যার দেখাশোনা করতে করতে বলতেন, দেখো কাণ্ড, সব ফুলিশ গ্র্যান্ডমাদারের মতো আমার মনে হয় এরা শুধু আমাকেই চায়!

হঠাৎ কখনও ছলছল চোখে বলতেন, কিরণকে ওরা জেমু গ্লেসিয়ারে, গ্রিন লেকের কাছে রেখে এলে পারত। ও হিমালয় ভালবাসত। কেন যে ডিস্টার্ব করল!

১৯৪৫ সালের শেষদিকে আমি একটা খাতায় ডায়েরি লিখতে শুরু করি। সেই ছিন্ন ডায়েরির পাতা উলটিয়ে আজ একটু আশ্চর্য হচ্ছি। একজন চোদ্দো বা পনেরো বছরের কিশোরীর নিভৃত দিনলিপিতে ব্যক্তিগত কথা বিশেষ নেই। বেশির ভাগ জুড়ে আছে জাতীয় রাজনীতির প্রসঙ্গ। প্রকৃতপক্ষে আমাদের চারপাশের সময়কাল তখন এমন উত্তেজনাপূর্ণ তার প্রভাব জীবনে পড়তে বাধ্য। জওহরলাল নেহরু, বল্লভভাই প্যাটেল, মহাত্মা গাঁধী কে কবে কলকাতায় আসবেন, কবে কাকে প্রথম দেখেছি এইসব কথা। আর সেসময়ে সুভাষচন্দ্র সারা দেশের মানুষের হৃদয় অধিকার করে আছেন। দেশ ধীরে অগ্রসর হচ্ছে স্বাধীনতার দিকে, পথ অবশ্য একেবারেই মসৃণ নয়। ডায়েরির পাতায় কী ধরনের বই পড়ছি তখন তার উল্লেখ পাচ্ছি।

আমার খুব প্রিয় বই অনেক দিন পর্যন্ত ছিল মাদাম কুরির জীবনী। তাঁর কন্যা ইভ কুরির লেখা। মাদাম কুরি বড় হচ্ছেন তাঁর দেশ পোল্যান্ডে। রাশিয়ার অত্যাচারে জর্জরিত পোল্যান্ডে মাথা নিচু করে থাকতে হয়। সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে। উচ্চশিক্ষার জন্য অদম্য আকাঙ্ক্ষা। যখন প্যারিসে এসে বিজ্ঞান সাধনার সুযোগ পেলেন তখন দিনের আহার জুটত না। মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন ক্লাসে। তিনি জানতে পারেননি ক্লাস নাইনে পড়া এক ভারতীয় মেয়ে তাকে রোল মডেল বলে মেনে নিয়েছে।

জওহরলালের আত্মজীবনী পড়ে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছি। উৎসর্গের পাতা থেকে শেষ পর্যন্ত মন দিয়ে পড়ে ফেলেছি। উৎসর্গে লেখা, টু কমলা

হু ইজ নো মোর। তারপর বিদেশে ছাত্রজীবন, দেশে ফিরে গাঁধীজির নেতৃত্বে সংগ্রাম, এক অন্তর্মুখী মানুষ অথচ পাবলিক লাইফে রয়েছেন। সবার উপরে লেখার সাহিত্যগুণ। এর পরপরই গাঁধীজির আত্মজীবনী— এক্সপেরিমেন্ট উইথ ট্রুথ— পড়বার চেষ্টা করছি, ভাল বুঝতে পারছি না ওঁর জীবনদর্শন। কিন্তু গাঁধীজি অবিসংবাদিত নেতা দেশের।

ডিসেম্বরের বড়দিনের সময়ে জন্মদিন, ২৬ তারিখে। পনেরো বছরের জন্মদিন, বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, কী উপহার নেবে? বললাম, চরকা। আজকালকার মতো মডার্ন চরকা নয়, বেশ বিশাল চরকা এসে গেল। ডায়েরিতে রোজ রোজ লিখছি চরকাতে সুতো কাটছি।

আরও অনেক উপহার পেয়েছি জন্মদিনে। গান করেছি। লেবুদি দিয়েছে সুভাষচন্দ্রের লেখা 'তরুণের স্বপ্ন' আর 'নূতনের সন্ধানে'। সুভাষচন্দ্রের লেখা পড়ে মুগ্ধ হয়ে ডায়েরিতে গোটা গোটা অক্ষরে লিখে রেখেছি—

'আমরা পরাধীন হইয়া জন্মিয়াছি একথা সত্য, কিন্তু স্বাধীন দেশে মরিব। দেশকে মুক্ত করিয়া মরিব, আসুন আমরা এই প্রতিজ্ঞা করি। আর যদি বা জীবনে মুক্ত ভারতবর্ষের রূপ দেখিতে না পারি তবে যেন ভারতবর্ষকে মুক্ত করিতে জীবন বিসর্জন করিতে পারি। স্বাধীনতার পথ কণ্টকময় পথ— কিন্তু ইহা অমরত্বের পথও বটে।'

আমি নাইন থেকে টেনে উঠেছি ফার্স্ট হয়ে। প্রথম হওয়ার জন্য ও জন্মদিনের জন্য নানা উপহার। বই ছাড়াও ভাল লেগেছে দুটো উপহার। দুই পরস্পৈপদী অর্থাৎ পাতানো দাদা আছেন। দাদাভাই পাইলট, পেশোয়ার গিয়েছিলেন, দিয়েছেন লাল জরির কাজ করা নাগরা। কিন্তু আমার বেশি পছন্দ ছোড়দার দেওয়া ক্যালেন্ডার, তাতে ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী স্বামীনাথনের সৈনিকের ক্যাপ পরা মুখ। খুব স্মার্ট। বড় হয়ে তবে কি মাদাম কুরি হব না লক্ষ্মী স্বামীনাথন? একটু দ্বিধায় পড়ে যাই!

এখন ভাবলে আশ্চর্য লাগে যে আমার একান্ত সৌভাগ্য পরবর্তীকালে লক্ষ্মী সাহগল, প্রেম সাহগল, গুরুবক্স ধীলন, আবিদ হাসান, এস এ আয়ার সকলে আমার অত্যন্ত আপনজন হয়ে পড়েন। এ এমন এক আত্মার আত্মীয়তার বন্ধন যা রক্তের সম্পর্কের অধিক। আমার ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছে তাদের আঙ্কল প্রেম, আঙ্কল ধীলন, আন্টি লক্ষ্মী সকলের স্নেহের

সান্নিধ্যে। যেসব বীর সৈনিকের সঙ্গে আমার তেমন প্রত্যক্ষ পরিচয়ের সুযোগ হয়নি আজ দেখছি তাঁরা রয়েছেন আমার ছেলেবেলার ডায়েরির ছিন্ন পাতায়।

সেই ১৯৪৬ আর ১৯৪৭ সালে নেতাজি সুভাষচন্দ্রের জন্মদিন ২৩ জানুয়ারি মহা সমারোহে ও স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দে মানুষ পালন করত। ভোরে ঘুম ভাঙত প্রভাতফেরির গানে— এক এক দল এক একরকম গান গেয়ে চলেছে— অবনত ভারতের পদানত অধিবাসী জাগো। দু'পাশের বাড়ি থেকে ফুল আর লাজ বর্ষণ হচ্ছে। আমি বাড়িতে দুটোর একটাও খুঁজে পাচ্ছি না। সব বাড়ির ছাদে পতপত করে উড়ছে তেরঙা পতাকা। মধ্যাহ্নে প্রতি বাড়িতে শাঁখ বেজে উঠছে জন্মমুহূর্তে। ফুল পাইনি কিন্তু একটা শাঁখ জোগাড় করে জোরে জোরে ফুঁ দিচ্ছি।

বিকেলে বিভিন্ন পার্কে ছোট, বড় নানা জনসভা। সেই সভায় কাদের বক্তৃতা শুনছি লিখে রাখছি ডায়েরির পাতায়। নেতাজি বলেছিলেন, এসো আমরা ইতিহাস সৃষ্টি করি, ইতিহাস লেখার ভার অন্যদের। সেইসব ইতিহাস সৃষ্টিকারী মানুষদের বিস্ময়ের সঙ্গে দেখি দেশপ্রিয় পার্কে, ত্রিকোণ পার্কে। একদিন বক্তৃতা শুনলাম কর্নেল স্ট্রেসি আর কর্নেল থিমায়া। কর্নেল সিরিল জন স্ট্রেসির সঙ্গে পরে আমার আলাপ হয়েছে কুনুরে। চমৎকার এক অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান অফিসার। সিঙ্গাপুরে সমুদ্রতটে আই এন এ-র অজানা সৈনিকদের স্মরণে শহিদ স্তম্ভটি গড়ে তুলবার ভার তাঁকে দিয়েছিলেন নেতাজি। যুদ্ধে তখন পরাজিত তাঁরা, যে-কোনও মুহূর্তে অ্যাংলো-আমেরিকান সেনাবাহিনী নামবে সিঙ্গাপুরে। মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে সমুদ্রতটে মাথা তুলে দাঁড়াল শহিদ স্তম্ভ— তার গায়ে লেখা ইত্তেফাক ইতমদ্ কুরবানি—একতা, বিশ্বাস, বলিদান। সিঙ্গাপুরে অবতরণ করে মাউন্টব্যাটেনের প্রথম কাজই হল ডিনামাইট দিয়ে স্মারকটি উড়িয়ে দেওয়া।

চারিদিকে জড়ো হওয়া মানুষজনের মধ্যে এক আজাদি সৈনিক কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল, মাউন্টব্যাটেন, আজ তুমি যা অন্যায় করলে একদিন তুমি নিজেও এইরকম বিস্ফোরণে উড়ে যাবে। বহুকাল বাদে আইরিশ বিদ্রোহীদের হাতে বিস্ফোরণে মৃত্যু হয় তার, তখন সেই পুরাতন ঘটনাটি অনেকের মনে পড়েছিল।

আর এক জনসভায় বক্তা সৌকত মালিক আর হবিব-উর-রহমান। সৌকত মালিককে যে দেখেছিলাম তখন ভাবতেও উত্তেজনা হয়। ১৯৪৪-এর ১৪ এপ্রিল ইম্ফলের অনতিদূরে ময়রাং-এ স্বাধীনতার পতাকা তুলেছিলেন সৌকত মালিক। তিনি ছিলেন এক বর্ণময় চরিত্র। তাঁর গল্প অনেক শুনেছি অন্য অফিসারদের কাছে। দেখা হয়নি কখনও। রয়েছেন আমার ডায়েরির পাতায়। হবিবের পুত্র নঈম-উর-রহমান আর পুত্রবধূ রাভিন তাঁদের ইসলামাবাদের বাড়িতে আমাকে আর শিশিরকুমারকে সাদর আতিথ্য দিয়েছে পরে। হবিবকে একাধিকবার দেখেছি কলকাতায়। কালিকা থিয়েটারে 'বালসেনা' অভিনীত হবে। বাবার সঙ্গে দেখতে গিয়েছি। হল-এ প্রথম সারিতে বসে আছেন আনন্দমোহন সহায়, হবিব উর রহমান, দিলীপকুমার রায়, শরৎচন্দ্র বসু।

জওহরলাল নেহরুর আমি একজন ভক্ত ছিলাম, বলা যায় তাঁর লেখার ভক্ত। ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বরের ৮ তারিখে লিখে রেখেছি তাঁকে প্রথমবার দেখে মুগ্ধ হয়ে যাবার বিবরণ। দেশপ্রিয় পার্কের জনসভা। খুব উঁচু মঞ্চের উপর বিরাট ছবি নেতাজি সুভাষচন্দ্রের। মঞ্চে উপস্থিত সর্দার প্যাটেল, জওহরলাল ও শরৎচন্দ্র বসু। প্যাটেল সুভাষের ছবির আবরণ উন্মোচন করলেন, নেহরু হিন্দুস্তানিতে বক্তৃতা করলেন। বিরাট জনসভার শৃঙ্খলা ছিল প্রশংসনীয়। ভলান্টিয়রের কাজ করছিলেন অনেক প্রাক্তন আজাদি সৈনিক।

কিন্তু তার পরদিন আরও ভাল করে জওহরলালকে দেখার ও শোনার সুযোগ হল। আজকের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় তখন ছিল জাতীয় প্রতিষ্ঠান, যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। সেই কলেজের সমাবর্তন উৎসবে এলেন জওহরলাল। মেজমামা সুরেন রায় এই কলেজের প্রাক্তনী এবং কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও যুক্ত। মেজমামা তাঁর আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয় হার্ভার্ডের অনুকরণে সমাবর্তনে প্রাক্তনীদের ১৯১১ থেকে ১৯৪৫ শোভাযাত্রার আয়োজন করেছেন— ক্লাস অব ১৯২০, অথবা ক্লাস অব ১৯২১ ইত্যাদি লেখা পতাকা হাতে প্রাক্তনীরা মার্চ করে ঢুকলেন। এবার মূল শোভাযাত্রা। আমরা যারা যাত্রাপথের দু'পাশে বসেছি তাদের হাতে ফুল দিয়ে গেল। পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছে। একটি গাঁধী টুপি নেহরুরই হবে মনে করে তাক করে ছুড়লাম, টুপ

করে পড়ল টুপির ওপর। শোভাযাত্রা একটু কাছে এলে দেখলাম আমার ফুল শরৎচন্দ্র বসুর গাঁধী টুপিতে পড়েছে। জওহরলাল পাশে হাঁটছেন, চোখ মুখ কুঞ্চিত, দু'দিক থেকে আগত ফুল থেকে মুখ বাঁচাতে বাঁচাতে চলেছেন। স্বীকার করব সেদিন ফুলটা মিস হয়ে যাওয়াতে কিঞ্চিৎ হতাশ হয়েছিলাম। পরে মনে হয়েছে সবকিছুতে ডেসটিনি বা নিয়তির একটা হাত থাকে। সেদিন ছিল ৯ ডিসেম্বর ১৯৪৫। ঠিক দশ বছর পরে ৯ ডিসেম্বর ১৯৫৫-তে আমার বিবাহ হয় শরৎচন্দ্র বসুর পুত্র শিশিরকুমার বসুর সঙ্গে। সেদিনকার সভার উত্তেজনাপূর্ণ বিবরণ লেখা আছে আমার পুরনো ডায়েরির ছিন্ন পাতায়।

এর দু'দিন পরেই সোদপুরে গাঁধীজির প্রার্থনা সভায় যাবার সুযোগ হল। আমার ডায়েরি বলছে খুব উত্তেজিত বা রোমাঞ্চিত হলাম না, শান্তভাবে দেখলাম। চোখে অবশ্য এখনও ভাসে ঋজু ভঙ্গিতে বসে আছেন গাঁধীজি, খালি গা, তামাটে রঙের বুক। পাঁচ টাকা সমেত অটোগ্রাফ খাতা জমা দিয়ে এলাম। খাতা বদল হয়ে গেল। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের কোনও ছাত্রের খাতা পরদিন আমি পেলাম। শেষ পর্যন্ত সঠিক অটোগ্রাফ খাতার সন্ধান মিলল। হিন্দিতে গাঁধীজির সই সমেত খাতাটি এখনও আছে। দশ টাকা দিলে ইংরেজিতে সই করতেন।

বছরটা তো ভালভাবেই শেষ হল। অনেকগুলো বই একসঙ্গে পড়েছি। কার্ল মার্কস আর লেনিনের জীবনী। সুভাষচন্দ্রের 'নূতনের সন্ধানে'। গাঁধীজির 'এক্সপেরিমেন্ট উইথ ট্রুথ' পড়েছি কিন্তু ঠিক যেন অনুধাবন করতে পারছি না। এর মধ্যে হঠাৎ ঢুকে পড়েছে মৈত্রেয়ী দেবীর 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ'। খুব উপভোগ করছি বইটি। এক অন্য রবীন্দ্রনাথকে দেখছি মৈত্রেয়ী দেবীর লেখায়।

১৯৪৬ সালটি যে জীবনে এত গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে তা কে জানত। প্রথমেই ২৩ জানুয়ারি ধুমধাম করে নেতাজির জন্মোৎসব পালন হল। দেশপ্রিয় পার্ক থেকে দেশবন্ধু পার্ক বিরাট শোভাযাত্রা হয়েছিল। ফেব্রুয়ারি মাসটা খুব গোলমালের মধ্যে কাটল। খবর কাগজে হেড লাইন Barracks resound with gun shots Military Police—R. I. N ratings duel. বম্বেতে রয়েল ইন্ডিয়ান নেভিতে বিদ্রোহ হয়েছে, করাচিতেও গোলমাল

হয়েছে। কলকাতার পথে পুলিশ আর সৈন্য নেমেছে। মাঝেমাঝেই ট্রাম-বাস চলাচল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

আমাদের ক্লাস টেন, ম্যাট্রিক পরীক্ষার জন্য তৈরি হবার সময়। পড়াশুনো বিশেষ হচ্ছে না। তবে বাড়িতে গানবাজনা চলছে। বাইরে যত অশান্তিই থাক। সেতার শিখতে শুরু করেছি। বেশ লাগছে।

পয়লা বৈশাখ বাঙালি বাড়িতে ভারী সুন্দরভাবে পালিত হত সেকালে। শুনেছি বাংলাদেশে আজও আনুষ্ঠানিকভাবে পালন হয়। এপার বাংলায় আমরা হ্যাপি নিউ ইয়ার বলে ছেড়ে দিই। ভোরবেলা ছাদে দাঁড়িয়ে আছি। আগের রাত্রে অনেক রাত অবধি গান হয়েছে। সূর্য উঠছে পুবে। ছোটকাকা আবৃত্তি করছেন— জবা কুসুমসঙ্কাশং, কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং... ধান্তারিং। সর্ব পাপঘ্ন, প্রণতোস্মি দিবাকরম। গান করছি, 'এসো হে বৈশাখ, এসো এসো'। স্নান করে নতুন শাড়ি পরে বড়দের প্রণাম। সকলে একসঙ্গে বসে ভাতে-ভাত খাওয়া।

দেশের রাজনীতিক হাওয়া উত্তপ্ত হয়ে পড়ছে দিনদিন। পাকিস্তানের দাবি জোরালো হয়ে উঠছে। মুসলিম লিগ থেকে ১৬ আগস্ট, ১৯৪৬ ডিরেক্ট অ্যাকশন ডে ঘোষণা করা হয়েছে। বাংলায় তখন সোহরাওয়ার্দির সরকার। লিগপন্থী মুসলিমদের মধ্যে একটা 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' মনোভাব প্রকট।

ইতিহাসের এইরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ সময়ে আমি জীবনে প্রথমবার বাংলার লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলির সুন্দর বাড়িটিতে প্রবেশ করবার সুযোগ পেলাম। বাবার বন্ধু তোফাজ্জেল আলি সাহেব ছিলেন ডেপুটি স্পিকার। তিনি কার্ড পাঠিয়েছেন ১২ আগস্টের অধিবেশনের জন্য। সেদিন আলোচনা হবে ১৬ আগস্ট ডিরেক্ট অ্যাকশন ডে প্রতিপালন নিয়ে। বাবা-মার হাত ধরে স্পিকারস্ গ্যালারিতে আসন গ্রহণ করলাম। সেদিনকার অধিবেশন আমার ছেলেবেলার জীবনে এক অভিজ্ঞতা। ট্রেজারি বেঞ্চের দিকে অনেকের মাথায় টুপি, মুখে দাড়ি। অপরদিকে সাদা রঙের খাদির গাঁধী ক্যাপ। কংগ্রেসের কামিনী দত্ত উঠে অ্যাডজোর্নমেন্ট মোশন আনতে চাইছেন। স্পিকার অনুমতি দিলেন না। তখন বিনা অনুমতিতে উনি প্রস্তাব পাঠ করতে শুরু করলেন। অধিবেশন কক্ষে বেজায় হইচই, বেড়াল ডাক,

ডেস্ক থাপড়ানো শুরু হল। কংগ্রেসের বিমল সিংহ আর লিগের শামসুল হুদা-র তর্ক চলছে। একে অপরকে নবাবসাহেব, জমিদারপুত্র আরও কীসব গাল দিয়েছেন। একটু পরে দেখি দু'জনে বেশ গলা জড়াজড়ি করে বেরিয়ে যাচ্ছেন। স্পিকার গ্যালারির পাশ দিয়ে যাবার সময় স্পষ্ট কানে এল হুদাসাহেব বিমলবাবুকে বলছেন, 'কী জমিদার পুত্তুর বলেছি বলে রাগ হল নাকি!' বড়দের কাণ্ডকারখানা দেখে আমি তাজ্জব। সেদিন যাঁদের অধিবেশনে দেখেছিলাম তাঁদের মধ্যে ছিলেন কিরণশংকর রায়, নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, জ্যোতি বসু, বিমল ঘোষ, নেলী সেনগুপ্তা আরও অনেক স্বল্পচেনা, অচেনা মানুষজন। ডিরেক্ট অ্যাকশন ডে-তে সরকারি ছুটি কেন ঘোষণা করা হল তাই নিয়েই ছিল বিতর্ক।

১৬ আগস্ট দিনটি তো যে-কোনও অন্যদিনের মতোই শুরু হয়েছিল। কিন্তু বিকেলের দিকে শহরের চেহারা অন্য রূপ নিল। ছোটকাকা এসে খবর দিলেন ময়দানে লিগওয়ালাদের জনসভা শেষ হবার পর ঘরমুখো জনতা লুঠতরাজ শুরু করেছে। সবাই মিলে ছাদে উঠলাম, চারিদিক দেখব। রাস্তার ওপারে একটা হইহই শোনা গেল তারপরই সামনের পানের দোকানটা লুঠ করে নিল একদল। অমনি ঝপঝপ করে সব দোকান ঝাঁপ বন্ধ করে দিল। রাতের দিকে সারারাতই রাস্তায় গোলমালের আওয়াজ, একটা ছোটমতো রেডিয়ো দোকান লুঠ হয়ে গেছে শুনলাম।

এই সময়ের একটি অভিজ্ঞতা আমার মনে চিরদিনের মতো ছাপ রেখে গেছে। রোজই গোলমাল বাড়ছে, লরি বোঝাই আর্ত মানুষকে এ পাড়া থেকে ও পাড়া অথবা ও পাড়া থেকে এ পাড়া নিরাপদ জায়গায় আনা-নেওয়া চলছে। এক সকালে সবাই খাবার টেবিলে বসে আছি সমুদ্রগর্জনের মতো একটা গর্জন ভেসে এল। সবাই ছাদে দৌড়লাম। দেখি বালিগঞ্জ লেকের দিক থেকে প্রায় শ' দুয়েক লোকের এক হিংস্র জনতা লাঠি হাতে রে রে করে ছুটে আসছে। আর তাদের সামনে প্রাণভয়ে ছুটছে এক একাকী মানুষ। কোনওমতে সে আমাদের উলটোদিকের বাড়ির একতলায় ঢুকে পড়ল। বাড়ির সামনে তুমুল হট্টগোল। পাড়ার কিছু ভদ্রজন পথে নেমে গোলমাল থামাবার চেষ্টা করছেন। 'জানেন এরা কী করেছে পার্ক সার্কাস

অঞ্চলে?' আমাদের প্রতিবেশী চশমা চোখে ক্ষীণ চেহারার প্রফেসর বোঝাবার চেষ্টা করছেন 'এরা' মানে এই ভীত মানুষটি নয়। তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে উত্তেজিত জনতা। প্রবল গোলমালের মধ্যে এক বৃদ্ধার কণ্ঠস্বর ভেসে এল, বারান্দায় হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে মিনতি করছেন, 'বাবা, বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে প্রাণে মেরো না।'

আমি পিছন ফিরে ছাদের সিঁড়ির দিকে রওনা দিলাম। বাবা ছুটে এসে হাতটা ধরে ফেললেন। 'কোথায় যাচ্ছ?' আমি বললাম, 'নীচে যাচ্ছি। লোকগুলোকে বুঝিয়ে বলতে হবে তো। দুশো লোক মিলে এভাবে একটা লোককে মেরে ফেলবে নাকি!'

বাবা হাতটা ধরে আছেন। আমার নির্বুদ্ধিতায় হতভম্ব হয়ে চেয়ে রয়েছেন। ছাদের পাঁচিলের ওপারে কী ঘটছে আমি দেখতে পাচ্ছি না। হুড়মুড় করে দরজা ভেঙে পড়ার আওয়াজ হল। তারপর খানিকক্ষণ ধরে আমি এক অদ্ভুত শব্দ শুনলাম, মনে হল যেন মাথার খুলিতে লাঠির আঘাত ঢপ ঢপ। আমি কি কল্পনা করছি না সত্যি শুনছি!

বাবার ওপর আমার খুব ক্রোধ ও অভিমান হল। যেন আমি নেমে গেলেই ম্যাজিকের মতো সব থামিয়ে দিতে পারতাম। রাতে জ্বর এল আমার। জ্বরের ঘোরে ভুল বকলাম।

সকালে অনেক দিনের পরিচারিকা, তার নাম সহচরী, সে ফিসফিস করে বললেন, বাবা তোমাকে বলতে মানা করেছেন। আরও একটা লোককে মেরে ফেলেছে। রাস্তার ওপর লাশ পড়ে আছে এখনও। দুর্বল পায়ে জানালার ধারে শিক ধরে দাঁড়ালাম। রাসবিহারী অ্যাভিনিউর ট্রামরাস্তার ওপর পড়ে আছে মৃতদেহ। জনহীন রাজপথে হঠাৎ কোথা থেকে একটা ছোটমতো গাড়ি উদয় হল। গাড়ি থেকে নেমে এসে এক সাহেব একটা চাদর দিয়ে মৃতদেহ ঢেকে দিয়ে যেমন এসেছিলেন নীরবে চলে গেলেন।

আমার দেশপ্রেমের অনুভবে প্রচণ্ড আঘাত লাগল। এই সামান্য কাজটুকুও কিনা করতে হল এক সাহেবকে। আমাদের স্বদেশীয় কেউ তো করতে পারতেন এই কাজটুকু। তখন জানতাম না, পরে জেনেছিলাম সাহেব ছিলেন 'স্টেটসম্যান' পত্রিকার সম্পাদক। সেই আমার প্রথম দেখা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার নিষ্ঠুরতা।

১৬ আগস্ট ১৯৪৬-এর দিনটিতে শুরু হওয়া 'দি গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং' দেশের ইতিহাসে এক মর্মান্তিক অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। কে বলবে তার আগের একটা বছরের ইতিহাস একেবারে অন্যরকম ছিল। নেতাজি সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজের সশস্ত্র সংগ্রামের ইতিহাস, জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে আদর্শের জন্য ঐক্যবদ্ধ আত্মোৎসর্গের কাহিনি মানুষকে প্রেরণা দিয়েছিল। লালকেল্লায় বিচারাধীন সাহগল, ধীলন, শাহ নওয়াজের মুক্তির জন্য হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী সারা ভারতের মানুষ উত্তাল হয়ে উঠেছিল। দেশের সেই একতাবদ্ধ চেহারা চোখের সামনে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যেতে দেখলাম। এক সম্প্রদায়ের মানুষ অন্য সম্প্রদায়ের দিকে সন্দেহের চোখে তাকাতে লাগল। দেশের নেতৃবৃন্দ, বলা ভাল কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ দুর্বল ও দ্বিধাগ্রস্ত, অন্যদিকে জিন্না ও মুসলিম লিগ পাকিস্তানের দাবিতে অটল। দেশ ভাগ হয়ে পড়ল প্রায় অনিবার্য।

আগস্ট মাসের সেই ভয়াবহ যন্ত্রণাদায়ক দিনগুলি গ্রথিত হয়ে আছে স্মৃতিতে। শহর যেন যুদ্ধের চেহারা নিয়েছে। বিভিন্ন অঞ্চলে যুবকেরা আত্মরক্ষার জন্য বাহিনী গড়ে তুলেছে। উঁচু বাড়ির ছাদে হেডকোয়ার্টার্স। বিপদের সংকেত চলে যাচ্ছে ছাদ থেকে ছাদে। সাইকেলে দূতেরা খবর দিয়ে যাচ্ছে কোন এলাকায় সংঘর্ষ হচ্ছে, কোথায় দুষ্কৃতীরা অ্যাটাক করেছে। ২০ আগস্ট রাতের দিকে হঠাৎ শঙ্খধ্বনি, তারপরই চিৎকার শোনা গেল, 'মেঘনাদ সাহার বাড়িতে অ্যাটাক' সান্ধ্য আইনের মধ্যেই দেওয়াল ঘেঁষে লাঠি হাতে ছেলেরা সাদার্ন অ্যাভিনিউর দিকে ছুটল। একটা ফায়ার ব্রিগেড ঘণ্টা বাজিয়ে চলে গেল। লরি ভরতি মিলিটারি সঙিন উঁচিয়ে ওদিকে গেল। একটু পরে ছেলেরা ফিরে এল। মিলিটারি পৌঁছে গেছে আগেই। মাঝখান থেকে ছেলেরা পড়েছিল বিপদে। তারা অন্ধকার গলি দিয়ে কোনওমতে ফিরেছে।

কলকাতার যে এলাকায় আমরা থাকতাম সেখানে এই ধরনের সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা ভাবা যায় না। শিক্ষিত, সংস্কৃতিমনস্ক বিদ্বজ্জনের বসবাস। আমি যে প্রথম সাম্প্রদায়িক হত্যা প্রত্যক্ষ করেছিলাম, দুশো জনের উন্মত্ত জনতা ধেয়ে আসছে, তারা ছিল লেকের ধারের একদিকের অবাঙালি গোয়ালা সম্প্রদায়ের মানুষজন। কিন্তু একবার যখন মানুষের

প্রতি মানুষের বিশ্বাস ভেঙে যায় তখন সকলেই একে অপরের দিকে সন্দেহ ও ভীতির চোখে তাকায়। গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং-এর সময়ে কলকাতার পথে শবদেহের স্তূপ হয়েছিল। আর্মির জওয়ানদের মাস্ক পড়ে কাজে নামতে হয়েছিল। আবার ওরই মধ্যে কার স্থান শ্মশানে, কে যাবে কবরস্থানে সে চিন্তাও ছিল। মৃত্যুতেও বিভেদ ঘোচে না। আমার বিবাহের পর শিশিরকুমারের সঙ্গে আমার সে সবদিনের কথা আলোচনা হত। দাঙ্গার ত্রাণকাজে উনি জড়িত ছিলেন। ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকদের এ-এলাকা থেকে অন্য এলাকায় নিরাপদে পৌঁছনোর কাজে গিয়ে অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছিল।

আমাদের দিন কাটছিল। বাড়ির বাইরে যাবার উপায় নেই। খবর কাগজ ঠিকমতো পাচ্ছি না। গুজব ছড়িয়ে পড়ছে। আমাদের পিছনের বাড়িতে পার্ক সার্কাস এলাকা থেকে তাদের আত্মীয়স্বজনকে উদ্ধার করে এনে রাখা হল। অমনি কিঞ্চিৎ উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল। হঠাৎ এক দুপুরে সেজকাকা ড. ক্ষীরোদচন্দ্র চৌধুরী গাড়িতে বিশাল রেডক্রস উড়িয়ে হাজির হলেন। সেসময়ে পাড়ার ছেলেরা আমাদের বাড়ি বাড়ি কচুশাক বিলি করে গিয়েছিল। বাজার তো নেই। মা কচুর শাকই নানারকম রান্না করতেন। সেজকাকা যখনই আসতেন, বউদি কী রেঁধেছেন খেতে দিন— বলে বসে যেতেন। এবার অবশ্য তেমন সময় নয়। আমরা কেমন আছি খোঁজ নিয়েই ছুটলেন পার্ক সার্কাসের দিকে। ওঁর শ্বশুরবাড়ির দিকের আত্মীয়, নাম যতদূর মনে পড়ে বসন্তকুমার সরকার, নিহত হয়েছেন খবর এল। তাঁর বাড়ি আক্রান্ত হয়েছিল।

ধীরে ধীরে এই উন্মত্তভাব কমে এল। যদিও সন্ধ্যার পর কারফিউ— আমরা বলতাম সান্ধ্য আইন, জারি ছিল অনেক দিন। গভীর রাতে জানালার শিক ধরে দাঁড়িয়ে নীচে রাস্তার দিকে দেখতাম— অন্ধকার, জনমানবহীন পথ, মাঝেমাঝে কারফিউ অমান্য করে দু'-একটা গোরু ল্যাজ দুলিয়ে ঘুরে বেড়াত।

এরই মধ্যে বেশ উত্তেজিত হয়ে শুনলাম লর্ড ওয়েভেল রেডিয়োতে ভাষণ দিচ্ছেন, অন্তবর্তী সরকারে ভারতীয় নেতারা কারা কারা থাকবেন নাম ঘোষণা করলেন। তবে কি আমরা সত্যিই স্বাধীন হতে চলেছি? বিশ্বাস হচ্ছে না।

পুজোর ছুটি এসে পড়ছে। আমরা লটবহর সমেত মিহিজামে হাজির। বেশ গুরুত্বপূর্ণ দুটি মাস কলকাতার বাইরে। সন্দেহের বাতাবরণ তখনও ঘিরে রয়েছে। ট্রেনে রওনা হয়েছি মিহিজাম। যাত্রীরা সতর্কভাবে পরস্পরের দিকে দৃষ্টিপাত করছেন। আমার ডায়েরির পাতায় আমি লিখেছি যে কামরায় আমরা উঠলাম সেখানে বেশ কয়েকজন মুসলমান ভদ্রলোক ছিলেন। লিখে রেখেছি— 'আমরা প্রথমে মাইনরিটি ছিলাম, কিছুক্ষণের মধ্যে parity হয়ে গেল, শেষ পর্যন্ত আমরা Majority হলাম।' এসব মাইনরিটি, মেজরিটি শব্দ নিশ্চয় তখনই সর্বদা শুনতাম বা খবর কাগজে পড়তাম।

মিহিজামে পৌঁছে একটু আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করলাম এই সুন্দর, শান্ত সাঁওতাল পরগনার অঞ্চলটিতে একটা পরিবর্তন এসেছে। মিহিজাম যেন রাজনীতি সচেতন হয়ে উঠেছে।

অক্টোবরের পয়লা তারিখ, ১৯৪৬, পুজোর ষষ্ঠী। অন্যবারের মতো দেবালয়ের দিক থেকে ঢাকের আওয়াজ পাচ্ছি না। দেবালয় একটি ছোটখাটো ক্লাবঘরের মতো, সেখানে পুজো হয়। সন্ধ্যায় হঠাৎ শুনি পথে একদল গান গাইতে গাইতে চলেছে। তারা গাইছে—'জননী আর জন্মভূমি স্বর্গ হতে শ্রেষ্ঠ মানি/একথা যে মানে না নরকে নিবাস তাহার'। শেষের দিকে হিন্দু-মুসলমান সকলে একত্র হয়ে মায়ের পুজোর ভার নিতে বলা হচ্ছে। এ রকম সান্ধ্যফেরি আগে দেখিনি। হাট থেকে গ্রামের পথে সাঁওতাল মেয়েরা গান গেয়ে পথ চলত। শহর থেকে আসা আমরাও কখনও জ্যোৎস্না রাতে গান গাইতে পথে বার হতাম। এবার ছবি অন্যরকম।

সপ্তমীর সকালেও ঘুম ভাঙল প্রভাতফেরির গানে। আগমনী গান নয়— তারা গাইছে, 'ভারতেরি ভাগ্যদোষে'—এরা এলাকার কংগ্রেসের লোকজন। গান থামিয়ে মাঝেমধ্যে তারা কেমন যেন তাড়াতাড়ি করে, অদ্ভুতভাবে স্লোগান দিচ্ছে— 'জওহরলাল নেহরু জিন্দাবাদ', 'রাজেন্দ্রবাবু কি জয়' ইত্যাদি। বিজয়া দশমীর দিন সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা বেঁধে যেতে পারে গুজব ছড়াল। কিন্তু ভালভাবেই সব হয়ে গেল। দু'-একদিন বাদে দেবালয় চত্বরে কংগ্রেসের মিটিং হবে খবর পেলাম। একজন গম্ভীর মুখে জানালেন, সুভাষবাবুর একজন ফ্রেন্ড এসেছেন তিনি বক্তৃতা দেবেন।

শুনেই বাবা আর আমি ছুট লাগালাম সেদিকে।

দেবালয়ের মাথায় পতপত করে কংগ্রেসের তেরঙা পতাকা উড়ছে। মাঝে মাঝে জনতা স্লোগান দিচ্ছে—সুভাষবাবু কি জয়, সুভাষবাবু জিন্দা হ্যায় ইত্যাদি। মঞ্চে যখন বক্তা এলেন দেখি একে চিনি। আমাদের স্কুলে কিছুদিন হিন্দি পড়িয়েছেন। হাম সুভাষবাবু কি সৈনিক হ্যায় বলে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিলেন।

এক রাতে স্বপ্ন দেখলাম মিহিজামের চারপাশের পাহাড়ে আগুন লেগেছে। কেলেহি পাহাড় দাউ দাউ করে জ্বলছে। সকালে উঠে সব শুনে মা বললেন, আগুনের স্বপ্ন দেখা খুব খারাপ। বিকেলে তুফান মেলে খবর কাগজ এলে পরে দেখলাম নোয়াখালিতে প্রবল দাঙ্গা শুরু হয়েছে। আমার মাসতুতো দাদা, যতুদাদা তখন ছিলেন। আমাকে খ্যাপাতে লাগলেন, তুই তবে আজকাল জাতীয় স্বপ্ন-টপ্ন দেখছিস। নোয়াখালিতে মহাত্মা গাঁধী এসেছেন খবর পেয়ে মনে যেন স্বস্তি পেলাম। কিন্তু তখনও জানি না দেশের দুর্ভাগ্য ঠেকাবার ক্ষমতা গাঁধীজির হাতেও আর নেই।

কালীপুজো এসে পড়ল। সকলের মন খারাপ। ভাবলাম এবার আর বেণুবন-এ প্রদীপ জ্বালব না। অন্ধকার গভীর হয়ে এল। শালগাছের ফাঁকে এ বাড়ি, ও বাড়ি প্রদীপের আলো।

কোনও এক সময়ে গোকুল মাটির প্রদীপে, তেল-সলতে দিয়ে বেণুবনও আলোকিত করে দিল। বাতাস নেই একেবারে, নিষ্কম্প দীপশিখা জ্বলছে সার দিয়ে। কেমন যেন মনে হল ঝড়ের আগের শান্ত পরিবেশ। বাবার সঙ্গে বসে সংস্কৃত আলোচনা হচ্ছিল। আমি পড়ছিলাম— লিখিতমপি ললাটে প্রোঞ্ছিতুং কঃ সমর্থঃ— বাবা একটু হেসে একটা পূর্ববাংলার গান শোনালেন—

বিধি মাইরাছে কপালে কলম
ঘুচবে না তার কলম লাড়া
মন তুমি হলে কী বুদ্ধি হারা—

বেণুবনে একটু সারানোর কাজ আছে। ইসমাইল মিস্ত্রি, অনেক দিনের পুরনো, রোজ খবর দেওয়া হচ্ছে, কিছুতেই আসছে না। গোকুল জানাল,

'ইসমাইল ভয় পেয়েছে, সে কাজে আসবে না।' সে আবার কী কথা! ইসমাইল আমাদের ভয় পেতে যাবে কেন? আমাদের নয়— ইসমাইল ভীত তার নিরাপত্তার কারণে। নোয়াখালি দাঙ্গার বদলা শুরু হয়ে গেছে বিহারে। নিরপরাধ লোকের উপর প্রতিশোধ নেওয়া সব দাঙ্গাহাঙ্গামার ইতিহাসেই জড়িত। প্রকৃত দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালে তবু কোনও অর্থ হত। মহাত্মা গাঁধী তাঁর মতো কাজ করে চলেছেন। বিহারে দাঙ্গার খবর পেয়ে আবদুল গফ্‌ফুর খান অর্থাৎ সীমান্ত গাঁধীকে সঙ্গে নিয়ে তিনি পৌঁছে গেছেন।

দাঙ্গাহাঙ্গামা আমাদের আর পিছু ছাড়ছে না। কলকাতার গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং, নোয়াখালি, বিহার। শাল-মহুয়ার গাছে ঘেরা শান্ত মিহিজামেও ছোঁয়াচ লাগল তার। মিহিজামেও ১৪৪ ধারা জারি হল, পাঁচ জনের বেশি জমায়েত নিষিদ্ধ। মিহিজাম স্টেশন দিয়ে আপ-ডাউন সব ট্রেন বেনিয়মে চলছে। রাতের অন্ধকারে যেসব ট্রেন চলছে তাতে নাকি থাকছে শবদেহ। সত্য-মিথ্যা-গুজব সব মিলে আতঙ্কের পরিবেশ। ক'দিন আগে ২৫ অক্টোবর নোয়াখালি দিবস উপলক্ষে মিহিজামে হরতাল পালিত হয়েছে। আমরা কলকাতা ফিরবার চেষ্টা করছি। মাঝেমাঝেই স্টেশনে যাই, খবরাখবর নিতে। নোয়াখালির ঘটনায় বিহারের হিন্দুরা ক্ষিপ্ত হয়ে আছে। লোকজনের কথাবার্তায় উত্তেজনা কানে আসে। 'বেশ করেছে মেরেছে! ওরা কী করেছে! বুঝুক এবার সারা ভারত নোয়াখালি নয়।' এমনি করে মানুষে মানুষে বিশ্বাস ভেঙে যায়, আমরা দেশভাগের দিকে এগিয়ে চলি।

আমরা বেশ দেরি করে নভেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে কলকাতা ফিরতে পারলাম। হাওড়া স্টেশনে অভিনব জিনিস চোখে পড়ল। মুসলিম লিগ ও হিন্দু মহাসভার ভলান্টিয়াররা যাত্রীদের সাহায্য করছেন। অবশ্যই নিজ নিজ সম্প্রদায়ের। আমরা বিনীতভাবে সাহায্যের প্রয়োজন নেই জানালাম।

কলকাতায় মনে হল আগের চাইতে আইনশৃঙ্খলা ঢিলেঢালা। আমাদের অনুপস্থিতিতে বাড়িতে তালা ভেঙে ঘরে ঘরে চুরি হয়ে গেছে। খুব কিছু নিতে পারেনি। সামনে ক্লাস টেনের টেস্ট পরীক্ষা। আমাকে পড়াশুনোয়

মন দিতে হল। স্কুলে সবাই দেখলাম আশা করছেন আমি ম্যাট্রিকে ভাল ফল করব, স্কুলের মুখ উজ্জ্বল হবে। এ-কথা শুনেই আমার হাত-পা ঠান্ডা হয়ে গেল। এই নার্ভাসনেস, এই আত্মবিশ্বাসের অভাব আমাকে সারা জীবন তাড়া করেছে। টেস্ট পরীক্ষাতে অবশ্য ভালই রেজাল্ট করলাম, প্রথমও হলাম ক্লাসে।

ডিসেম্বর মাস কলকাতায় বেশ উৎসবের পরিবেশ। বাবার সঙ্গে অক্সফোর্ড বুক স্টোরে গিয়ে পছন্দমতো বই কিনলাম, সিসিল বীটনের ছবির অ্যালবাম, মুনশি প্রেমচাঁদের ছোটগল্পের সংকলন। জন্মদিনের উৎসবও হয়ে গেল, ধুমধাম একটু কম। দেশের অবস্থা অস্থির, তা ছাড়া সামনে পরীক্ষা।

ছয়

সাল ১৯৪৭: আনন্দে-বিষাদে

কিছুদিন হল আমাদের পরিবারের সঙ্গে বেশ আলাপ হয়েছে এক কেরল-এর যুবকের, নাম তাঁর কেশব মেনন। বেশ বাড়ির একজন হয়ে পড়েছেন, নিত্য যাতায়াত। ইনি সক্রিয়ভাবে কংগ্রেস করেন। তবে কংগ্রেস সোশালিস্ট। বাবার সঙ্গে রাজনীতি নিয়ে কথাবার্তা হয়। আমি উৎসুক শ্রোতা। এই পরিচয়ের একটা পটভূমি আছে। আমার এক মেসোমশাইয়ের গল্প আগে বলেছি যিনি ছিলেন যেন সিনেমার বাবা। মেয়ে নিজের পছন্দে পাত্র নির্বাচন করলে রেগে আগুন। পরে অবশ্য মেনে নেওয়া। তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা সদ্য ডাক্তারি পাশ করেছেন। একাধিক যুবকের তিনি আগ্রহের পাত্রী। তিনি পছন্দ করেছেন কেরল যুবক কেশবকে। তাঁদের একটা প্রণয়পর্ব চলছে। পিতাকে অবশ্যই গোপন করতে হচ্ছে। আমার বাবা-মা আধুনিকমনস্ক, আমাদের বাড়িতে দু'পক্ষের যাতায়াত।

আজকাল অনেক বাড়িতে সাহেব জামাই হলে যেমন চাঞ্চল্য হয় সেকালে ভিন্ন রাজ্যে বিবাহ অনেকটা সেইরকম ঘটনা। কেরলের ভাবী জামাই আমাদের বাড়িতে মাছের ঝোল ভাত বাঙালি রান্না খান। আমরা ওদের বাড়ি নিমন্ত্রিত হয়ে দক্ষিণী রান্না খাই। সেকালে দক্ষিণী রান্নার সঙ্গে আমরা সম্পূর্ণ অপরিচিত। রসম্, সম্বরা খেয়ে তাজ্জব বনে যাই। মস্ত বড় পাঁপড় ভাজা। শেষপাতে পায়সম্, সেটা বেশ তরল, চুমুক দিয়ে খাই।

খাওয়াদাওয়া ছাড়াও সর্বভারতীয় রাজনীতি নিয়ে কথা হয়। উনি রামমনোহর লোহিয়ার ঘনিষ্ঠ। বলেন, লোহিয়া কলকাতায় আসবেন, এলেই আমাদের বাড়ি নিয়ে আসবেন। আমি তো খুব উৎসুক।

১৯৪৭-এর জানুয়ারি মাস। আমরা স্বাধীনতার দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে

আছি। ২৩ জানুয়ারি সুভাষচন্দ্রের ৫০তম জন্মদিন সাড়ম্বরে পালিত হচ্ছে। পাড়ার সব বাড়িতে তেরঙা পতাকা উড়ছে। দুপুরে যথারীতি শঙ্খধ্বনি। রাতে কলকাতা সেজেছে প্রদীপের আলোয় যেন অকালে কালীপুজো। নেতাজির জন্মদিনের উৎসবে যোগ দিতে সেসময়ে প্রাক্তন আই এন এ অফিসাররা তখন কলকাতায় আসতেন। আমরা ছুটতাম তাঁদের দেখা পাবার জন্য। আমাদের স্কুলের মাঠের এক অনুষ্ঠানে এলেন কর্নেল থিমায়া, কর্নেল সৌকত মালিক। ক্লাবের মাঠে দেখতে পেলাম কর্নেল সিরিল জন স্ট্রেসি। আর এক অনুষ্ঠানে আনন্দমোহন সহায়, হবিব-উর-রহমান। একটা কথা যত ভাবি আশ্চর্য লাগে। সেদিন যাঁদের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতাম পরবর্তীকালে তাঁরা অনেকে হয়ে পড়েছিলেন নিতান্ত আপনজন। কুনুরে তাঁর বাড়িতে নিজের হাতে কেক বেক করে আপ্যায়ন করছেন কর্নেল স্ট্রেসি। ইসলামাবাদে যখনই গিয়েছি সাদরে গ্রহণ করেছেন হবিব-উর-রহমানের পরিবার। এই লেখা লিখতে লিখতেও ফোন ধরতে উঠলাম। ইসলামাবাদ থেকে ফোন করছেন হবিবের পুত্রবধূ, নঈম-উর-রহমানের স্ত্রী রাভিন। বলছেন, অনেক দিন খবর পাইনি, কেমন আছ? অতীতের স্মৃতিচারণ থেকে বর্তমানে ফিরে আসি আমি।

দেশের অবস্থা অবশ্য তখন প্রতিদিনই আর একটু খারাপ হচ্ছে। দেশের অস্থির অবস্থার কারণে আমাদের ম্যাট্রিক পরীক্ষা কেবলই পিছিয়ে যেতে থাকল। পরীক্ষা পিছনোর ব্যাপারে আমরাই বলা যায় পথিকৃৎ। আজকাল তো কারণে-অকারণে পরীক্ষা পিছিয়ে যাওয়াই রীতি।

ফেব্রুয়ারি ২০ তারিখে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এটলির ঘোষণা শুনলাম ইংরেজরা ১৯৪৮ সালের ৩০ জুনের মধ্যে ভারত ছেড়ে যাবে। লর্ড মাউন্টব্যাটেন তারিখটা এগিয়ে এনেছিলেন আগস্ট ১৯৪৭-এ।

কেশব মেননের সঙ্গে সত্যিই একদিন রামমনোহর লোহিয়া এলেন ডিনার খেতে। বসবার ঘরে বসে চারিদিক চোখ বুলিয়ে দেখলেন, অর্গ্যান, সেতার, এস্রাজ, তবলা, হারমোনিয়াম। বললেন, There is music in the house. কিন্তু কথাবার্তা ইংরেজিতে হলেও উনি হিন্দিতে কথা বলাই বেশি পছন্দ করছিলেন। লোহিয়া আংরেজি হটাওর প্রবক্তা। আমার বাবা ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে অনুরাগী এবং পণ্ডিত। খাবার টেবিলে দু'জনে একচোট

তর্কবিতর্ক হয়ে গেল। বাবা বললেন, আংরেজ হটাব কিন্তু ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য ছাড়ব কেন?

এই তর্কবিতর্কের মাঝখানে আমার দিকে ফিরে হঠাৎ লোহিয়া প্রশ্ন করলেন, তুমি কি কমিউনিস্ট? আচমকা প্রশ্নে আমি বিড়ম্বিত। বাবা আমার সাহায্যে এগিয়ে এসে বললেন, ও কোন রাজনীতি করবে এখনও মন ঠিক করে উঠতে পারেনি। রামমনোহর লোহিয়া আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন, 'শোনো যদি মুসলিম লিগ করতে চাও, তাও করতে পারো। কিন্তু খবরদার কমিউনিস্ট হতে যেয়ো না।' ওঁর ইংরেজি এবং কমিউনিস্ট বিদ্বেষ সম্পর্কে আমি অবহিত হলাম। আমার অটোগ্রাফ খাতায় যাবার আগে একটা সই দিলেন। অবশ্য প্রথমে বলেছিলেন আমার সত্যি পলিটিক্যাল মতামত কী না জানলে সই দেবেন না।

ম্যাট্রিক পরীক্ষা আবার পিছিয়ে গেল ১৭ এপ্রিল-এর বদলে ১৯ মে হবে। এবার ৮ মে অন্তত অ্যাডমিট কার্ড ইত্যাদি দিয়ে দিল। শেষ পর্যন্ত ৭ জুন পরীক্ষা শেষ হল, আমরাও নিশ্চিন্ত হলাম।

একেবারে নিশ্চিন্ত হবার অবশ্য উপায় নেই। দেশভাগ অনিবার্য হয়ে পড়েছে। তাই নিয়ে সর্বক্ষণ আলোচনা চলছে। আত্মীয়স্বজন রয়েছেন ঢাকা আর ময়মনসিংহতে। ওরই মধ্যে পরীক্ষা শেষ হবার আনন্দে আমরা স্কুলের বন্ধুরা মিলে 'নার্স সিসি' বলে একটা সিনেমা দেখে এলাম। তাতে বোধহয় ভারতী দেবী অভিনয় করেছিলেন। ভারতী দেবী আমাদের রাসবিহারী অ্যাভিনিউর বাড়ির পাশেই থাকতেন। বাড়ির ছাদে বেড়াতেন, আমরা জানলা দিয়ে দেখতে পেতাম।

দেশভাগ নিয়ে বাবারা আলোচনা করছেন। শুনতে পাচ্ছি শরৎচন্দ্র বসু আপ্রাণ চেষ্টা করছেন যদি বাংলা ভাগ অন্তত রোধ করা যায়। সোহরাওয়ার্দি, আবুল হাশিম, শরৎচন্দ্র বসু মিলে স্বাধীন যুক্ত বাংলার কথা বলছেন। শুনতে পাওয়া যাচ্ছে মুসলিম লিগ রাজি, কিন্তু কংগ্রেস হাই কম্যান্ডের ঘোরতর আপত্তি। তখন অত কথা বুঝতে পারার মতো বোধবুদ্ধি হয়নি। অনেক পরে আমার স্বামী শিশিরকুমারের কাছে শুনেছি তাঁর পিতৃদেব মহাত্মা গাঁধীর কাছে ছুটে গিয়েছিলেন। গাঁধীজি তো বলেছিলেন তাঁর মৃতদেহের উপর দিয়ে দেশভাগ হবে। তিনি তো দেশভাগের ঘোরতর

বিরোধী। শিশিরকুমার বলেছিলেন, বাবা গাঁধীজিকে বলেন, 'বাপু, এই শেষ মুহূর্তেও আপনি যদি কড়ে আঙুলটিও তোলেন দেশভাগ রদ হয়ে যাবে।' গাঁধীজি দুঃখের সঙ্গে বলেছিলেন, 'শরৎ, আমার আর সে ক্ষমতা নেই। সর্দার (বল্লভভাই প্যাটেল) আমার কথা শুনবে না আর জওহর সম্বন্ধে বেশি না বলাই ভাল।' এই সাক্ষাৎকারের কথা শিশিরকুমার বসু তাঁর 'Remembering My Father' বইতে লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

নেতারা কী ভাবছেন সাধারণ মানুষ জানে না। তারা নিরাপত্তাহীন, ভীত বোধ করছে। মেজকাকা নীরদচন্দ্র দিল্লি থেকে দুই পিসিমাকে উপদেশ দিলেন দেশ ছেড়ে আসবে না। বাস্তবের সঙ্গে এই উপদেশ একেবারেই যায় না। ছোটপিসিমা মাকে জানালেন, তাঁর চারটি কন্যা, দেশের অস্বাভাবিক অবস্থায় এক মুহূর্তও নিরাপদ নয়। সেকালে পোস্টকার্ডে চিঠিপত্র চলত। ছোটপিসিমা মাকে লিখলেন, আমাদের যে কী হবে! মার পোস্টকার্ড গেল, কোনও চিন্তা কোরো না, প্রয়োজনে সকলে একসঙ্গে ডাল ভাত খেয়ে থাকব। ঈশ্বরের কৃপায় ছোটপিসিমার তেমন দুরবস্থা হয়নি। যদিও কঠিন সংগ্রামে পড়েছিলেন। ছোটপিসিমাই আমাকে বলেছিলেন বউদির পোস্টকার্ড আমার মনে কী যে শান্তি দিয়েছিল। কারণ ততদিনে পশ্চিমবাংলায় বসবাসকারীর কাছে পূর্ববাংলার মানুষ অবাঞ্ছিত হয়ে পড়েছেন। উদ্বাস্তু শব্দটি প্রচলিত হয়েছে।

পশ্চিমবাংলার মানুষ বিশেষত হিন্দুরা চাইছেন বাংলা ভাগ হলে তাই হোক। অন্তত অর্ধেক তো বেঁচে যাবে। সর্বনাশে সম্যুৎপন্নে অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ। ভারতীয় এবং বাংলারও মুসলমানেরা আনন্দিত তাদের স্বপ্নের পাকিস্তান শেষ পর্যন্ত জিন্না আদায় করতে পেরেছেন। মুসলমানদের নিজস্ব হোমল্যান্ড। কিন্তু এই উপলব্ধি তখনও আসেনি বেশির ভাগ এই দেশেই থাকলেন যেমন ছিলেন। সাদাত হাসান মান্টোর লেখা মনে পড়ে— বম্বের গরিব বস্তিতে একদিকে তেরঙা পতাকা দিয়ে সাজানো, হুল্লোড় হচ্ছে আমরা স্বাধীন হয়েছি। অপরদিকে সবুজ পতাকা সেদিকেও হুল্লোড় স্বাধীন পাকিস্তান হয়েছে। মানুষগুলো একবারও ভাবছে না তাদের কী এসে গেল। কাল থেকে তারা কি আরও ভাল খাওয়া-পরা পাবে?

মাউন্টব্যাটেন ৩ জুন ১৯৪৭ যে রেডিয়ো বক্তৃতা দিলেন তাতে

বাংলা ভাগ নিশ্চিত হয়ে গেল। যদিও অনেক পরে আমরা জেনেছিলাম মাউন্টব্যাটেন দুটি বক্তব্য লিখেছিলেন, প্ল্যান এ আর প্ল্যান বি। বসু-সোহরাওয়ার্দি প্রস্তাবমতো যদি যুক্তবাংলা হয় তবে একরকম ভাষণ না-হলে অন্য। আমার ছেলেবেলার সেই ছেঁড়া ডায়েরির পাতায় ২০ জুন তারিখে লিখছি, শেষ পর্যন্ত বাংলা ভাগ হয়ে গেল। মাঝের ক'টা দিন বিভিন্ন প্রদেশের তখনকার বিধায়কেরা দেশভাগ নিয়ে মতাদি দিচ্ছিলেন। দেশভাগের পক্ষে জোরালো সমর্থন এল পূর্ব পাঞ্জাব ও পশ্চিমবাংলার জনপ্রতিনিধিদের কাছ থেকে, নিয়তির পরিহাস।

রাসবিহারী অ্যাভিনিউর বাড়ির বসবার ঘরে এক মনখারাপ করা বিকেলবেলার কথা লেখা আছে আমার ডায়েরির ২০ জুন তারিখে। বাবা (এবং মা), ছোটকাকা, আমি সবাই নানারকম আলোচনা করছি। বাবা বলছেন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার অসামান্য আত্মত্যাগ ছিল, আজকের পরিণতির সঙ্গে মেলানো যাচ্ছে না। আমি ভাবছি আমরা পরাধীনতা থেকে মুক্তি চেয়েছিলাম। স্বাধীনতা আসছে। তবে কেন এত মনখারাপ লাগছে। ছোটকাকা হঠাৎ রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠ করতে শুরু করলেন—

বিজয়ের শেষে যে মহা প্রয়াণ
সফল আশার বিষাদ মহান
উদাস শান্তি করিতেছে দান
চির মানবের প্রাণে

সফল আশার বিষাদ-মহান কথাটা যেন আমরা উপলব্ধি করলাম আর এক ধরনের উদাস শান্তি আমাদের আচ্ছন্ন করল।

দিল্লি থেকে মেজকাকা নীরদচন্দ্র বাবাকে লিখলেন, পরীক্ষা হয়ে গেছে। ছুটি কাটাবার জন্য আমাকে যেন দিল্লিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। জুলাইয়ের ৩০ তারিখে আমি আর মা দিল্লি পৌঁছলাম। ফলে দেশের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ সময় আমার রাজধানী দিল্লিতে কাটল। দৈবচক্রে জন্মেছিলাম ঢাকা শহরে। কিন্তু আমার জীবন পুরোপুরি কলকাতাকেন্দ্রিক। আমার বড় হয়ে ওঠা চৌরঙ্গি, ডোভার লেন, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ আর পরবর্তী

জীবন উডবার্ন পার্ক, এলগিন রোড, শরৎ বসু রোড কলকাতারই কত বিচিত্র সব ঠিকানা। কিন্তু ১৯৪৭ সালের ছয়টি সপ্তাহ আমার ঠিকানা হল পুরনো দিল্লির পি অ্যান্ড ও বিল্ডিং, নিকলসন রোড। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতাকা নেমে গিয়ে স্বাধীন ভারতের পতাকা যখন উড়ল, তখন আমি জনতার সঙ্গে দিল্লির রাজপথে।

মেজকাকা নীরদচন্দ্র চৌধুরী সেসময়ে তাঁর প্রথম সাড়া জাগানো বই 'দি অটোবায়গ্রাফি অফ অ্যান আননোন ইন্ডিয়ান' লিখছেন। রোজ ভোরবেলা আমার ঘুম ভাঙে টাইপ রাইটারের খটখট খটখট আওয়াজে। মেজকাকা সোজাসুজি টাইপ রাইটারে লেখেন। কাগজ কলমে নয়। দিল্লিতে তখন প্রচণ্ড গ্রীষ্ম, বাড়ির সবাই ছাদে শুতে যায়। আমার কথায় কথায় ঠান্ডা লেগে যায় তাই খোলা ছাদে না-শুয়ে আমি দক্ষিণের বারান্দায় একটা দড়ির খাটিয়াতে শুই। অনেক রাত পর্যন্ত মেজকাকা খাটের পাশে মাটিতে বসে নিজের বইয়ের ম্যানাসক্রিপ্ট থেকে লম্বা লম্বা প্যাসেজ পড়ে শোনান। বনগ্রামের বাড়িতে, কিশোরগঞ্জে ছেলেবেলার কথা— আই অ্যান্ড মাই ব্রাদার— বাবার ও মেজকাকার জীবনের নানান গল্প। আমি বুঝতে পারি মেজকাকা ঠিক আমাকে শোনাচ্ছেন না, মনে মনে বাবাকে শোনাচ্ছেন। 'দাদাকে গিয়ে বলবে কিশোরগঞ্জের এই কথাটা এইভাবে লিখলাম।' কখনও বলেন, 'দুর্গাপুজোর বর্ণনাটা যেমন পড়লাম দাদাকে বোলো। একদিন ফিসফিস করে বইটার নাম কী হবে বললেন। দাদাকে বোলো, আর কাউকে না।

বই পড়াটা ভাল হয়। কিন্তু মাঝেমাঝেই যখন নিজের রাজনীতিক বিশ্বাসের কথা বলেন তখন আমার সঙ্গে মতে মেলে না। সাধারণত মেজকাকা যখন কথা বলেন সেটা মনোলোগ হয়, উনিই একমাত্র বক্তা, অপরজন নীরব শ্রোতা। ছোট ছিলাম, মাঝেমধ্যে প্রতিবাদ করে বসি— আপনি কেন কেবলই দেশের নিন্দা করেন। বলেন আমাদের দেশ কোনওদিনও বড় হবে না। কী করে জানলেন? আমরা স্বাধীন হতে চলেছি, আমাদের দেশ নিশ্চয়ই একদিন খুব বড় হবে।

উনি জোর গলায় বলেন, 'একটা কথা শুনে রাখো, ইনডিভিজুয়াল ভারতীয় অর্থাৎ ব্যক্তি হিসেবে কোনও কোনও ভারতীয় বড় হবে, বিশ্ব

সভ্যতায় তার অবদান থাকবে। কিন্তু দেশ হিসেবে ভারত কিছু করতে পারবে না। ইংরেজ চলে গেলে তো দেশ খণ্ডবিখণ্ড হয়ে ভেঙেই যাবে।' আমি বিশ্বাস করি না কিন্তু নেহাত ছেলেমানুষ, তর্কে এঁটে উঠতে পারি না। রাতে ঘুম আসে না, এপাশ ওপাশ করতে থাকি। আমার যাঁরা আইকন, আদর্শ মানুষ গাঁধীজি, নেতাজি, জওহরলাল নেহরু— এঁদের সম্বন্ধে অশ্রদ্ধার সঙ্গে কথা বলেন। গাঁধীজি তো 'বানিয়া', ঘোর বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন, বলেন হিপোক্রিট। জওহরলাল হলেন অপরচুনিস্ট, সুবিধাবাদী। আর সুভাষবাবু তো রাজনীতির কিছুই বোঝেন না, কেবলই ভুলভাল পদক্ষেপ নেন।

একটু পর খুব অনিচ্ছার সঙ্গেই একটা কথা স্বীকার করেন। সুভাষবাবু যতই অর্বাচীন রাজনীতি করুন না কেন নিজের যা বিশ্বাস কথাটা ইংরেজিতে বলেন 'কনভিকশন', তার জন্য আত্মোৎসর্গ করার হিম্মত রাখেন, অন্যদের তা নেই। এইসব জাতীয়তাবিরোধী কথাবার্তাই যে শুধু হত তা নয়। জ্ঞানগর্ভ আলোচনা বিভিন্ন বিষয়ে হত। নানা বিচিত্র ঘটনার মধ্যে দিয়ে আমাদের সময় কাটত।

আমার ঘুম ভেঙেছে ভোররাত্রে। খটখট টাইপরাইটার ছেড়ে মেজকাকা উঠে আসেন। 'চলো তোমাকে তারা চেনাই', মেজকাকা আর আমি নিকলসন রোডের বাড়ির বারান্দায়, আকাশের গায়ে অসংখ্য তারকা জ্বলজ্বল করছে। মিহিজামের আকাশে তারা দেখিয়ে বাবার কাছে অ্যাস্ট্রোনমির পাঠ শুরু হয়েছিল। মেজকাকার সঙ্গে তা আরও অগ্রসর হয়।

ভোরের সূর্য ওঠে পুবদিকে। ততক্ষণে মেজকাকা অ্যাস্ট্রোনমি ছেড়ে ফিলজফিতে চলে গেছেন। মা, মেজকাকিমা সকালের খাবারদাবার আয়োজন করছেন। খেতে খেতে মেজকাকা ইংরেজি সাহিত্যের পাঠ শুরু করেছেন। আমার জেন অস্টেনের উপন্যাস সব পড়া হয়ে গেছে শুনে বেজায় খুশি। ওঁর প্রিয় ঔপন্যাসিক। শার্লট ব্রন্টে ও এমিলি (Emily) ব্রন্টেও পড়ে ফেলেছি। কিন্তু হঠাৎ কখন আলোচনা অন্যদিকে চলে গেছে। এবার পাশ্চাত্য সংগীত। এ সম্পর্কে আমার জ্ঞান সীমিত। আমি ক্ল্যাসিক্যাল ইন্ডিয়ান মিউজিক আর রবীন্দ্রসংগীতের ভক্ত। ছোট সেতারটি দিল্লি নিয়ে

এসেছি, রাগরাগিণী বুঝি। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এত বিভিন্ন জ্ঞানের মধ্যে সঞ্চারণ আমার পক্ষে বেশ বেশি। আমার মাথা ঘুরতে থাকে।

অল ইন্ডিয়া রেডিয়োতে কাজ করেন মেজকাকা। চট করে একবার অফিসে ঘুরে এসেই আবার আমাকে নিয়ে পড়েন। 'এসো তোমাকে প্লেটোর সঙ্গে পরিচয় করাই' বলেন। শেলফ্ থেকে থান ইটের মতো মোটা বই নামিয়ে আনেন। সেই আমার প্লেটোর সঙ্গে প্রথম পরিচয়।

সর্বদাই যে এ রকম জ্ঞানচর্চায় ভারাক্রান্ত থাকি তা নয়। ধ্রুব আর কীর্তি দুই ভাইয়ের সঙ্গে বেড়াতে যাই। মেজকাকার নির্দেশে দুই ভাই আমাকে সাইকেল চড়া শেখাচ্ছে। দু'-একবার সাইকেল সুদ্ধ আছাড় খাবার পর বেশ শিখে গেলাম। ধ্রুব একটা বক্স ক্যামেরা নিয়ে নানারকম ছবি তোলা এক্সপেরিমেন্ট করে। মেজকাকা ডাচ পেইন্টারদের ছবি নিয়ে এসে আমাকে ডাচ পেইন্টিং-এর তরুণীর মতো পোজ দিতে বলেন। পিয়ানোর সামনে দাঁড়ানো ডাচ মহিলা হয়ে যাই।

মেজকাকার এক মুসলমান বন্ধুর মেয়ে আমাদের সঙ্গে কয়েক দিন থাকতে এলেন। নাম জুবেদা, আমরা ডাকি জুবেদা বাজি। বেশ ভাব হয়ে গেল তার সঙ্গে। অল ইন্ডিয়া রেডিয়োর মুসলমান সহকর্মীরা কেউ কেউ পাকিস্তানে চলে যাবেন। তাদের চাকুরিতে অপশন দেওয়া হয়েছে, ভারতে থাকবেন না চলে যাবেন যেমন ইচ্ছা। তাদের যাবার আগে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানো হল। সকলের নাম মনে নেই, সরফরাজ ছিলেন আর হামিদ জালাল।

স্বাধীনতা দিবস এগিয়ে আসছে। আমি ভাবছি মেজকাকার যেরকম ইংরেজ প্রীতি দিল্লির কোনও উৎসবে যোগ দিতে পারব না। থাকতাম যদি কলকাতায়, প্রভাতফেরিতে গান গাইতে গাইতে যেতাম। আমার বেশ মনখারাপ। ছোটকাকা কলকাতা থেকে সান্ত্বনা দিয়ে লিখেছে, তোমার জন্য সব আনন্দবাজার পাঠিয়ে দেব।

স্বাধীনতা দিবসের দিন দুয়েক আগে মেজকাকা আমাকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, 'বুঝেছি, মন খারাপ হয়েছে। এসব হুজুগে যোগ দেওয়া যাবে না। আর বিনু (ছোটকাকা) কাগজপত্র পাঠাবে কলকাতা থেকে। ঠিক আছে, যদি এই maffiking-এ যোগ দিতে চাও (ম্যাফিকিং কথাটাই

ব্যবহার করেছিলেন) যেতে পারো, আমি নিষেধ করব না।' আমার সে কী আনন্দ!

আগস্ট মাসের ১৪-১৫ তারিখের মধ্যরাতে পাশের প্রতিবেশী আন্টি গ্ল্যাডিস-এর ফ্ল্যাটে বসে জওহরলাল নেহরুর বিখ্যাত ট্রিস্ট উইথ ডেসটিনি (Tryst with Destiny) বক্তৃতা শুনলাম। পরদিন ভোর হতে না হতেই দিল্লির রাজপথে নেমে পড়লাম। সেদিনের স্মৃতি আমার কাছে আক্ষরিক অর্থেই ধূলি ধূসরিত। চারিদিকে মানুষের পায়ে পায়ে পথের ধূলি উড়ছে। তারই মধ্যে ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেনের ঘোড়ায় টানা গাড়ি চলে গেল। পুরনো পতাকা নেমে গেল। চোখের সামনে উঠে এল নতুন যুগের তেরঙা পতাকা। আমরা যারা পরাধীন ভারতে জন্মেছিলাম স্বাধীনতার আস্বাদ তাদের কাছে কেমন তা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে ঠিক বুঝিয়ে বলা যাবে না। যারা মিডনাইটস চিলড্রেন তারা সেই গ্লানির অনুভূতি জানে না। জনতার ভিড়ের ধাক্কাধাক্কির মধ্যে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম, হঠাৎ দেখি ঘোড়সওয়ার পুলিশের ঘোড়ার পায়ের তলায় আর একটু হলেই পড়ে যাব। কে যেন হাত ধরে টেনে সরিয়ে দিল।

রাত গভীর হল। আমি, ধ্রুব, কীর্তি বাড়ির পথে। দিল্লি শহর ঝলমল করছে, সব অট্টালিকায় আলোক সজ্জা। পথ কিঞ্চিৎ জনবিরল। কীর্তি হঠাৎ গমগম করে আবৃত্তি শুরু করল—

চলে গেছো তুমি আজ মহারাজ
রাজ্য তব স্বপ্নসম গেছে ছুটে
সিংহাসন গেছে টুটে

যাদের চরণভারে ধরণী করিত টলমল সেইসব সেনাদল আজ কোথায়! আমাদের মনের মধ্যে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি প্রতিধ্বনিত।

উৎসবের আলোকসজ্জা ভাল করে তখনও নিভে যায়নি। শহরে শুরু হয়ে গেল প্রচণ্ড দাঙ্গা-হাঙ্গামা। পাঞ্জাব থেকে দলে দলে শিখ ও হিন্দু শরণার্থী প্রবেশ করল শহরে। সঙ্গে নিয়ে এল সর্বস্ব হারাবার করুণ কাহিনি। এপারে জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। বিভিন্ন এলাকায় যে যেখানে সংখ্যাগুরু

অথবা সংখ্যালঘু অত্যাচার ও হানাহানি চলল সমানে। আমাদের বাড়ির সামনেই পুরনো দিনের দিল্লির লাল প্রাচীর; তার গায়ে শরণার্থীরা আস্তানা করে নিল। একতলার প্রতিবেশী শিখ ভদ্রলোক টাঙ্গায় বাড়ি ফিরছিলেন। টাঙ্গাওয়ালা তাকে ছুরি মেরে পালাল। তিনি পাগড়ি খুলে ক্ষতস্থান বেঁধে নিজেই টাঙ্গা চালিয়ে বাড়ি ফিরলেন। তিন দিন যমে মানুষে টানাটানির পর তাঁর মৃত্যু হল। রক্তের প্রতিদানে স্বাধীনতা এনে দেবেন বলেছিলেন সুভাষচন্দ্র। সে রক্ত হত রণক্ষেত্রে সৈনিকের আত্মত্যাগ। এখন নিরপরাধ সাধারণ মানুষের রক্তে ভিজে গেল ভারত-পাকিস্তানের মাটি!

চুরাশি ঘণ্টার একটানা কারফিউ জারি হয়েছে। বাড়ির বাইরে কী ঘটছে জানতে ছাদে যাই। চারিদিকে আগুন আর ধোঁয়া চোখে পড়ে। খাওয়াদাওয়ার কী হবে? বাড়িতে এক টিন এগ পাউডার ছিল। এ বস্তুটি পরে আর কখনও দেখিনি। বোধহয় যুদ্ধের সময়ে তৈরি হত। মা আর কাকিমা এগ পাউডার দিয়ে ডিমের নানারকম পদ রাঁধতে লাগলেন। মেজকাকা বললেন বাড়ির আবহাওয়া খুব স্বাভাবিক রাখতে হবে। ঠিক হল খুন, লুঠ, ধর্ষণ— এই জাতীয় শব্দ ইংরেজি বা বাংলায় কথাবার্তায় ব্যবহার করা চলবে না। নিয়ম মানা হল তবে তাতে কতখানি স্বাভাবিক থাকা গেল জানি না।

এই দাঙ্গাহাঙ্গামা শুরু হওয়ার প্রথম দিনেই আমার একটা সাংঘাতিক অভিজ্ঞতা হয়েছিল। আগের রাতে আমাদের পুরাতন পরিচারক ধনু অল ইন্ডিয়া রেডিয়োর অফিস থেকে বাড়ি ফেরেনি। সবাই চিন্তিত।

ভোরবেলা আমি, ধ্রুব আর কীর্তি তিন জন সাইকেলে চড়ে নতুন দিল্লির পথে রওনা হলাম। ভোরের পথ বেশ নির্জন, নীরব। আমরা সাইকেল চালিয়ে চলেছি। আমার শাড়ি হাওয়ায় ফুলে উঠছে। কীর্তি পাশের সাইকেল থেকে বলল, তোমার শাড়ি সামলাও, সবাই তোমাকে দেখছে। আমি তো অবাক। জনশূন্য পথে কে আবার আমাকে দেখছে। কীর্তির দৃষ্টি অনুসরণ করে উপরে চেয়ে দেখি সব বাড়ির বারান্দায়, জানালায় লোকজন আমাদের দিকে বিস্ময়ের সঙ্গে চেয়ে আছে। আমার শাড়ির জন্য এত কাণ্ড, আশ্চর্য! সামনের একটা মোড়ে কিছু খাকি পোশাক সৈন্য দাঁড়িয়ে আছে। আমরা তাদের পার হয়ে গেলাম। শুনি তারা হুইসল

বাজাচ্ছে, আমাদের থামতে বলছে। সাইকেল থেকে নেমে তিনটি বালক-বালিকা তাদের সামনে দাঁড়ালাম। তাদের চোখে ঘোর বিস্ময়। জিজ্ঞাসা করলে, কোথায় চলেছ? আমরা বললাম, অল ইন্ডিয়া রেডিয়ো। তারা বললে, তোমাদের কি মাথা খারাপ! জানো না শহর জুড়ে দাঙ্গাহাঙ্গামা চলছে। যেখানে আমরা দাঁড়িয়ে আছি এখুনি গুলি চলেছে। তোমরা যত তাড়াতাড়ি পারো এই এলাকা ছেড়ে চলে যাও।

জীবনে কখনও এত জোরে সাইকেল চালাইনি। কোনদিকে চলেছি, ঠিক নেই। কিছু দূর গিয়ে আমি ফুটপাথে বসে পড়লাম। যা হবার হোক! আমি আর সাইকেল চালাতে পারব না। ধ্রুব এদিক ওদিক খুঁজে এক টাঙ্গাওয়ালা ধরে আনল। তিন সাইকেল সমেত আমরা চড়ে পড়লাম। তারপর কতক্ষণ ধরে প্রায় সারা দিল্লি ঘুরে বাড়ি পৌঁছলাম। সকালের খবর কাগজে খবর পড়ে মা কাকিমা, মেজকাকা চিন্তিত মুখে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন। সেদিন সত্যিই আমাদের খুব বিপদ হতে পারত। পিছন ফিরে একটু আশ্চর্য লাগে কী করে মেজকাকা আমাদের পাঠিয়েছিলেন। আমার বাবা খুব সাবধানী! মেয়েকে তো নয়ই, ভাইদেরও যেতে দিতেন না।

হঠাৎ আধ ঘণ্টার জন্য কারফিউ শিথিল করা হয়েছে খবর হল। ধ্রুব বেরিয়ে পড়ল আর একটু বাদে পোস্টাপিস থেকে একতাড়া চিঠি নিয়ে এল। তার মধ্যে বেশ কয়েকটা কলকাতা থেকে বাবার চিঠি। বাবা আর ছোটকাকা চিন্তিত। একটি চিঠিতে আমার ম্যাট্রিক পাশের খবর। খুব একটা আহামরি রেজাল্ট না হলেও ফার্স্ট ডিভিশন আছে, সত্তর পার্সেন্ট নম্বর। বাবা লিখেছেন, ফিরে এসো, কলেজে ভরতি হতে হবে।

কিন্তু ফিরব কীভাবে! শহরের অস্বাভাবিক অবস্থা। দাঙ্গার সময়ে দিলীপকাকা আমাদের বাড়িতে এসে উঠেছিলেন। ইনি হলেন দিলীপ সান্যাল, ইংরেজির অধ্যাপক, মেজকাকার বন্ধু। ঠিক হল দিলীপকাকা, মা ও আমি কলকাতা যাবার একটা চেষ্টা করব। শেষ পর্যন্ত ১৫ সেপ্টেম্বর পুরনো দিল্লি স্টেশন থেকে আমরা ট্রেনে চড়লাম। স্টেশনের আশেপাশে, রেললাইনের ধারে পড়ে আছে শবদেহ। মেজকাকা ছাড়তে এসেছেন। কেবলই বলতে লাগলেন, আরও ক'দিন অপেক্ষা করা উচিত ছিল।

স্বাধীন ভারতে সেই দিল্লি-কলকাতা রেলযাত্রা জীবনে ভুলব না। উলটো দিকের বেঞ্চে বসে আছে এক পাঞ্জাবি পরিবার। আমার বয়সি একটি মেয়ে আছে। ট্রেন যমুনা ব্রিজে উঠল। রেললাইনের দু'ধারে ইতিউতি লাশ পড়ে আছে। মেয়েটি হঠাৎ কেমন যেন উল্লসিত কণ্ঠে বলে উঠল, দেখো, দেখো ক্যাসা খুন গিরতা। মনে হল শিশুর দেহ। আমি চোখ বুজলাম। আতঙ্ক শুধু শিশুমৃত্যুতে নয়, মৃত্যু দেখে মেয়েটির উল্লাসে। একটু আগেই সে অবশ্য বলছিল তার পরিবারের সকলকে দাঁড় করিয়ে গুলি করে মেরে ফেলেছে লাহোরের দুষ্কৃতীরা। সে প্রতিবেশীদের সঙ্গে আশ্রয়ের সন্ধানে কলকাতা চলেছে। সবই তো বুঝলাম, তবুও মানুষ মানুষের প্রতি কত নিষ্ঠুর হতে পারে!

ট্রেন খানিক চলার পরে এক অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়ল। কোনও কোনও কামরা থেকে কী যেন ছুড়ে ফেলছে। হঠাৎ দেখে পাশবালিশের মতো মনে হয়। তারপর বোঝা গেল মানুষের দেহ— মৃত না জীবন্ত জানি না, ছুড়ে ফেলা হচ্ছে। পাঁচ-ছ'জন দুষ্কৃতী, দু'-একজন শিখ তার মধ্যে আছে, বিভিন্ন কামরায় ঘুরে বেড়াচ্ছে আর বিশেষ লোক চিহ্নিত করে এই কাজটি করছে। তারা আমাদের কামরাতেও উদয় হল। পাঞ্জাবি পরিবারের সঙ্গে নিজেদের ভাষায় কী যেন কথা কাটাকাটি হতে লাগল। তারা বলছে বাংলা আর পাঞ্জাব এই দু' জায়গাতেই পাকিস্তান হয়েছে এবং আমরা যখন বাংলার তখন আমাদের ট্রেনের জানালা দিয়ে ছুড়ে ফেলাই কর্তব্য। সেই মেয়েটি রুখে দাঁড়িয়ে কীসব যেন বলছে। দিলীপকাকাকে দেখিয়ে ইনি প্রফেসর আদমি আর মেয়েরা খুব উঁচু ও ভাল পরিবারের ইত্যাদি। একটু আগে মেয়েটিকে দেখেছিলাম অন্য চোখে। 'আমরা ঘুরে আসছি' বলে লোকগুলো তখনকার মতো চলে গেল। রাতের দিকে কানপুরে ট্রেন দাঁড়াল। প্ল্যাটফর্মে চেয়ে দেখলাম ইংরেজ সৈন্য আমরা যাদের বলতাম 'টমি', ট্রেন ঘিরে ফেলেছে। তল্লাশি ও গ্রেপ্তার চলছে। আমাদের যারা মেরে ফেলার হুমকি দিচ্ছিল তারাও ধরা পড়ল। আমার জাতীয় অভিমান ধূলিসাৎ। শেষে কিনা ইংরেজ টমির কৃপায় প্রাণ রক্ষা!

কানপুরের পর আর কোনও অশান্তি হল না। আমি বাঙ্কে উঠে শুয়ে পড়লাম। চোখে ঘুম নেই। ট্রেন উত্তর ভারতের বুক চিরে ছুটে চলেছে

দ্বিখণ্ডিত বাংলার দিকে। আমার ব্যক্তিজীবনে এবং জাতীয়জীবনেও সামনে অজানা ভবিষ্যৎ!

হাওড়া স্টেশনে নামতে বাবা বললেন, এ কী চেহারা করে ফিরলে, পাঠালাম ছুটিতে শরীর সারাতে। সত্যিই দিল্লির ধাক্কাটা কাটাতে আমার সময় লাগল। স্বাধীনতা, দেশভাগ, দাঙ্গাহাঙ্গামা অন্যদিকে মেজকাকার জাতীয়তা বিরোধী মতামত আবার নিরন্তর জ্ঞানচর্চা সব মিলে শরীর ও মনের উপর চাপ ছিল। তবুও এই কয়েক সপ্তাহের দিল্লিবাস অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ।

সা ত

স্বাধীন দেশে

সদ্য স্বাধীন হওয়া ভারতে জীবনের এক নতুন অধ্যায় শুরু হল। কলেজে পড়তে যাওয়া মানে যেন হঠাৎ বেশ বড় হয়ে যাওয়া। রাসবিহারী অ্যাভিনিউর বাড়ির সামনে থেকে খুব ভোরবেলা ট্রামে চড়ে পড়ি। প্রথমদিকে বাড়ি থেকে সঙ্গে কেউ এসে ট্রামে তুলে দিত। একবার উঠে পড়লে ট্রামের ভিতরে কলরব করতে করতে চলেছে একদল তরুণী। ভবানীপুরে আশুতোষ কলেজে নেমে পড়ি সকলে। আশুতোষ কলেজের তখন পড়াশুনোর ব্যাপারে বেশ নামডাক। আমি পড়ব ইন্টারমিডিয়েট বা আই এ। বিজ্ঞান পড়লে বলা হত আই. এস. সি। ইন্টার মিডিয়েট পরীক্ষায় আশুতোষ কলেজ সেসময়ে বেশ ভাল রেজাল্ট করে। প্রথম কুড়ি জনের মধ্যে থাকে অনেকে।

দিল্লি থেকে ফিরে এসে আমি অবশ্য দেখলাম বাবা আমাকে গোখেল কলেজে ভরতি করে রেখেছেন। তার প্রধান কারণ কলেজের বাসে আসা-যাওয়ার ব্যবস্থা আছে। বাড়ি থেকে দুরে কী করে ট্রামে-বাসে পড়তে যাব এই সমস্যা আমাকে বার বার বেশ ভুগিয়েছে। একমাত্র মেয়ে ছিলাম, খুব বেশি নিরাপত্তার ঘের একটা কারণ বটে; তবে একথাও মানতে হবে তখনও মেয়েরা একলা চলাফেরায় স্বচ্ছন্দ ছিল না, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিও ছিল অন্য রকম। দু'-চার দিন কলেজ বাসে যাতায়াত করার পরে আমি বিদ্রোহ ঘোষণা করলাম। বন্ধুরা সব আশুতোষ কলেজে। আমি কলেজ বাসে সারা কলকাতা প্রদক্ষিণ করে ক্লান্ত হয়ে বাড়িতে ফিরি। আমার কথায় কলেজ বদল হল। তবে শত শত মেয়ে ঝরনার মতো কলকল করে

সিঁড়ি দিয়ে নেমে চলেছে অথবা কখনও কলরব করে উপরে উঠছে আমার কাছে এ এক নতুন অভিজ্ঞতা।

স্বভাবতই চুপচাপ আমি ক্লাসের একপাশে বসে থাকি। এক এক সেকশন-এ একশোর ওপর ছাত্রী। আমরা যেন এক একটা সংখ্যা। যেমন আমি, রোল নম্বর ৩৬৯। অধ্যাপকেরা সবাই অ্যালফাবেটের এক এক অক্ষরে পরিচিত।

'হ্যাঁরে আজ এ ভি কী পড়ালেন?'

'বি জি ইংরেজি ক্লাসে টেনিসন পড়াবেন।'

'এম. এম খুব রাগী প্রফেসর না রে?' এই ধরনের আলাপচারিতার টুকরো ভেসে আসে কানে।

আশুতোষ কলেজে লব্ধ আমার এই অভিজ্ঞতা নিয়ে কলেজ ছেড়ে আসার পর আমি একটা লেখা লিখি। নাম দিই 'কলেজ এডুকেশন'। ছদ্মনামে লিখি— রোল নম্বর ১৩। লেখাটা স্টেটসম্যান কাগজে ডাকে পাঠিয়ে দিই। আমার জীবনে প্রথম প্রকাশিত লেখা হল স্টেটসম্যান কাগজে। লেখাটা খুব সাড়া ফেলে দিয়েছিল। স্টেটসম্যানের চিঠিপত্র কলামটা সে আমলে বেশ জনপ্রিয় ছিল। তা 'লেটারস টু দ্য এডিটর' এ ছয় মাসেরও বেশি সময় ধরে আমার লেখার ওপর আলোচনা চলল।

অবশ্য এসব অনেক পরের কথা। তখনও নতুন পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াবার চেষ্টা করছি। কুমকুম একদিন বললে, অমুক ক্লাসের মেয়েরা তোর খুব নিন্দে করছিল। আমি তো হতবাক। কেন? ওরা বলছিল— 'মেয়েটি খুব অহংকারী! কারও সঙ্গে কথাবার্তা বলে না। হবে না-ই বা কেন পড়াশুনোয় ভাল মেয়ে তো!'

কেউ যে আমার সঙ্গে কথা বলতে খুব আগ্রহী তাই তো আমি জানি না। এরপর থেকে ওদের মুখোমুখি হলে আমি জোর করে হেসে এগিয়ে গিয়ে, কী খবর বলি।

অধ্যাপকদের দূর থেকে একটু আধটু চিনতে শুরু করি। 'বি জি' ইংরেজি কবিতা পড়াবার সময়ে নাটকীয় ভাবে হাত-পা নাড়েন। 'এস সি' সিভিক্স বলে একটা সাবজেক্ট পড়ান। দু'-চার লাইন পড়িয়ে বলেন, ডু ইউ আনডারস্ট্যান্ড? তারপর নিজেই বিরক্ত ভাবে বলেন— ইউ ডোন্ট

আনডারস্ট্যান্ড— ইউ উইল নেভার আনডারস্ট্যান্ড। 'এম এস' অতি সুদর্শন চেহারা; ছাত্রীরা রূপমুগ্ধ।

একদিন এক হট্টগোলের ক্লাসে বসে আছি। প্রফেসর তখনও আসেননি, বেজায় চেঁচামেচি চলছে। এমন সময়ে প্রফেসরের প্ল্যাটফর্মের দিক থেকে একটি গম্ভীর গলা ভেসে এল— 'সভায় যারা থাকে তাদের সভ্য বলা হয়। আমি তোমাদের কাছে সভ্যোচিত ব্যবহার আশা করি।'

হঠাৎ ক্লাসে নীরবতা। উনি পড়াতে শুরু করলেন। চেয়ে দেখি এক নিতান্ত তরুণ প্রফেসর পড়াচ্ছেন। একে দু'-একবার করিডরে দেখেছি, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটেন। পায়ে কোনও সমস্যা আছে। এর পড়ানোর ভঙ্গিটি আমার খুব ভাল লেগে গেল। একদিন ক্লাসে বললেন, আজ তোমাদের পড়াব— কেন বাজারে আজ মাছের সের সাড়ে তিন টাকা। কেন তিন টাকা নয়, কেনই বা নয় চার টাকা সের (পাঠক, তখন মাছের দাম সের দরে ওই তিন টাকার কাছে ঘোরাফেরা করত, আজকের কথা ভুলে যান)। কী সুন্দর ভাবে যে ভ্যালু বোঝালেন, চাহিদা আর জোগানের উপর দ্রব্যমূল্য কেমন স্থির হয় বুঝে গেলাম।

আমি এই অধ্যাপকের একজন দূর থেকে অ্যাডমায়রার হয়ে পড়েছিলাম। আলাপ-পরিচয়ের কোনও অবকাশ নেই। শত শত ছাত্রীর মধ্যে আমি তো চোখেও পড়ব না। ইকনমিক্স-এর এই অধ্যাপকের নাম শুনলাম অম্লান দত্ত। একবার তাঁর সঙ্গে মুখোমুখি বাক্যালাপ হয়েছিল। ইন্টারমিডিয়েটের টেস্ট পরীক্ষা হয়ে যাবার পর একদিন রেজাল্ট কবে বার হবে জানতে গেলাম। সিঁড়িতে ওঁর সঙ্গে দেখা। দাঁড়িয়ে পড়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি তো কৃষ্ণা? নিশ্চিত আমি কোনওমতে ঘাড় নাড়লাম। উনি বললেন, 'তুমি তো টেস্টে খুব ভাল ফল করেছ। সব সাবজেক্টেই ভাল করেছ। বাংলাটা তত ভাল হয়নি। আর ইকনমিক্স-এ যদি দু'নম্বর প্রশ্নের উত্তরে ভূমিকাটা একটু অন্যভাবে লিখতে বা পাঁচ নম্বরের শেষটা আর একটু ব্যাখ্যা করতে নম্বর আরও বেশি হত।'

আমি তো হতবাক। যে ভাবে উত্তরপত্রের কথা বলছেন বুঝতে পারছি খুব খুটিয়ে পড়েছেন। ইউনিভার্সিটির পরীক্ষাতেও ইকনমিক্স পেপারে সবচাইতে ভাল নম্বর হল, আশির উপর। আমি যে ইকনমিক্স-এ অনার্স পড়ব সে বিষয়ে নিশ্চিত ছিলাম। বাস্তবে তা হল না।

অধ্যাপক অম্লান দত্তের বৈদগ্ধ্যের খ্যাতি পরবর্তীকালে যখন ছড়িয়ে পড়েছে তখন তাঁর সঙ্গে যথেষ্ট আলাপ হয়েছিল। তিনি নেতাজি ভবনে এসেছেন বক্তৃতা করতে। একসঙ্গে অনেক সভা-সমিতিতে গিয়েছি।

সেকালে ইংরেজি বাংলা ছাড়া আই. এ পড়বার সময়ে তিনটি বিষয় পড়তে হত। আর ফোর্থ সাবজেক্ট বলে একটা বিষয় নেওয়া বা না-নেওয়া নিজের ইচ্ছার উপর নির্ভর করত, যাকে বলে অপশনাল। নিলে লাভ হত। ত্রিশ নম্বর বাদ দিয়ে বাকি পাওয়া নম্বর যোগ হত। যারা ভাল ছাত্র তাদের স্ট্যান্ড করার সুযোগ বাড়ত, মাঝারি ছাত্রদেরও ডিভিশন ভাল হবার উপায় ছিল। কোন সাবজেক্ট-এ বেশি নম্বর উঠবে বলে সবাই সেটা নিত। আমার ক্ষেত্রে বাবা ও কখনও মেজকাকার শিক্ষার ব্যাপারে মতাদির চোটে নানান সমস্যার সৃষ্টি হত। পরীক্ষার জন্য পড়া নয়, জ্ঞান চর্চার জন্য পড়া। বাবা লিবারেল এডুকেশন-এর ভক্ত। বিভিন্ন বিষয়ে অবাধে বিচরণ করতে পারা চাই।

বাবা বললেন, ফোর্থ সাবজেক্ট হবে অ্যানথ্রোপলজি। তখন ওই সাবজেক্ট কেউ বিশেষ পড়ত বলে জানা নেই। কলেজে পড়ানো হয় না। বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে বিজ্ঞান কলেজে ওই একটি সাবজেক্টের জন্য আমি ভরতি হলাম। এমন অবাস্তব কাণ্ড ভাবা যায় না। এমনিতে একলা চলাফেরার উপর নানা বিধি-নিষেধ। দু'রকম কলেজে ছুটোছুটি কীভাবে হবে, সময়ই বা কোথায়। কিছুদিন গেলাম। অধ্যাপকদের সঙ্গে পরিচয় হল। প্রিন্সিপাল ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় গুরুগম্ভীর মানুষ, অ্যাবসেন্ট হওয়া পছন্দ করেন না। কিছুদিন ক্লাসে মানুষের খুলির মাথার মাপ নেওয়া শিখলাম। ক্লাসে আমি তো একমাত্র ছাত্রী। কিছুদিনের মধ্যে বাবাও বুঝলেন এভাবে চলবে না। মাঝখান থেকে আমি ফোর্থ সাবজেক্ট হারালাম। আই এ পরীক্ষার ফল গেজেটে প্রকাশিত হবার পর দেখা গেল আমি প্রথম কুড়ি জনের মধ্যে আঠারো নম্বরে আছি। ফোর্থ-সাবজেক্টে হেসেখেলে আরও ত্রিশ নম্বর যোগ হত, আর একটু উঁচুতে উঠতাম। আমার ফর্মাল এডুকেশনটা চিরদিন ছন্নছাড়া ছিল।

আমাদের সাংসারিক জীবনে স্বাধীনতার পরে একটা পরিবর্তন এল। বাবা নিজের পেশা ছেড়ে চাকুরিতে যোগ দিলেন। সেকালে একটা অলিখিত

নির্দেশ যুবকদের মনে থাকত। ইংরেজের চাকুরি না করতে হলেই ভাল। তাই ওকালতি, ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং এইসব স্বাধীন পেশায় বাবা-কাকারা গিয়েছিলেন। চাকুরি না নিয়ে বাবার কোনও উপায়ও ছিল না। এমনিতেই বাবা ওকালতিতে উৎসাহী ছিলেন না। মক্কেল যারা ছিল তারা পূর্ববাংলার। দেশ ভাগ হয়ে তারা হাতছাড়া। বেঙ্গল ল্যাম্পের ডিরেক্টর পদ কিছুকাল আগেই অ্যানামামিমার কারণে ছেড়ে দিয়েছেন। অন্যদিকে দেশভাগের ফলে সরকারি কর্মী, নথিপত্র ভাগাভাগি হয়েছে। নতুন সরকারে কর্মীরও প্রয়োজন। বাবা রাইটার্স বিল্ডিং-এ কাজে যোগ দিলেন। প্রথম স্বাস্থ্য দপ্তরে আইনকানুন তৈরি করার কাজ। বাবার প্রথম রচিত আইন অ্যান্টি স্মোকিং বিল ধূমপান বিরোধী আইন। আইন প্রণয়নে বাবার দক্ষতার ফলে তাঁকে বিধানসভায় অন্যতম সচিব নিযুক্ত করা হল। পরবর্তী এক দশকেরও বেশি সময় স্পিকারের রুলিং বাবার লেখনীপ্রসূত। নাম যারই থাক।

বাবার এই বিধানসভায় থাকার সুবাদে আমার রাজ্য রাজনীতি কাছে থেকে দেখার সুযোগ হল। বিধানসভায় আমার নিত্য যাতায়াত। সভা চলাকালীন স্পিকারের গ্যালারিতে বসে দেখি মুখ্যমন্ত্রী ডা. বিধানচন্দ্র রায়কে। ব্যক্তিত্বশালী মানুষ কিন্তু বক্তৃতা দিতে উঠে ইংরেজি বা বাংলাতে কোনও বাক্যই শেষ করেন না। সাংবাদিকেরা ক্রিয়াপদ ইত্যাদি বসিয়ে বাক্য সমাপ্ত করে ছাপতে দেন। কাছে থেকে দেখি স্পিকারের চেয়ারে বিশ্বনাথ দাস জালানকে, শৈল মুখার্জিকে। বিরোধী আসনে জ্যোতি বসু, তীব্র আক্রমণ করেন সরকারকে। বামপন্থীরা কথায় কথায় ধর্মঘট ডাকেন, রাস্তায় আন্দোলন করেন। একবার বিধানসভা ঘেরাও হয়েছে। আমি বাড়ি যাব, কোনও গেট দিয়ে বার হতে পারছি না। জ্যোতিষ জোয়ারদার মশাই দেখতে পেয়ে বললেন, চলো উত্তরের গেট দিয়ে তোমাকে বার করে দিই। ওদিকে অবরোধ নেই।

বিধানসভার কাজ বাবার খুব মনের মতো হয়েছিল। শীতকালে চন্দ্রমল্লিকার প্রদর্শনী হবে। তাতেও বাবার উৎসাহ। জাতীয় নেতাদের পেন্টিং টাঙাতে হবে অট্টালিকায়, সেও বাবার মস্তিষ্কপ্রসূত আইডিয়া।

সেকালে চিত্রকর ভাস্করদের আর্থিক অবস্থা আজকালের মতো ভাল হত না। খুব সংগ্রামের জীবন। বিখ্যাত পোর্ট্রেট শিল্পী অতুল বসু পারিবারিক

বন্ধু। বাবাকে তিনি একদিন বললেন, চারুবাবু কিছু একটা করতে পারেন না। দিন চলা মুশকিল। বাবা ভেবেচিন্তে বিধান রায়ের কাছে একটা প্রস্তাব রাখলেন বিধানসভা ভবনে জাতীয় নেতাদের পোর্ট্রেট রাখার ব্যবস্থা করলে কেমন হয়। বিধানবাবু খুব খুশি। বললেন, 'উত্তম প্রস্তাব, ওহে, এখুনি একটা টেন্ডার ডেকে দাও, সবচাইতে কম দর যে দেবে—'

বাবার চক্ষুস্থির! টেন্ডার ডেকে শিল্পকাজ হয় না। কিছুদিনের মতো বাবা ফাইলটা ধামা চাপা দিলেন। বেশ কিছুদিন পর যখন বিধানবাবু ব্যাপারটা ভুলেই গেছেন, ফাইল বার হল। এরপরই নেতাজি সুভাষচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের পূর্ণাবয়ব পেন্টিং বিধানসভায় উন্মোচিত হল। পরে আরও অনেকে, বিভিন্ন শিল্পীর আঁকা।

বিধানসভা চলাকালীন বাবার ফিরতে অনেক রাত হত। একবার বাবা এমনিতেই বেশ রাত করে ফিরলেন। কী ব্যাপার জিজ্ঞাসা করাতে হাসতে হাসতে বললেন, 'জ্যোতিবাবুর জন্য বিছানা পাততে দেরি হল।' তার মানে! শোনা গেল জ্যোতি বসু বিধানসভায় রাজনৈতিক আশ্রয় নিয়েছেন। বিধানসভার ভিতর থেকে কোনও সদস্যকে গ্রেপ্তার করা যায় না। উনি গ্রেপ্তার এড়াতে বেশ কিছুদিন বিধানসভাতেই বসবাস করবেন। বাবা বললেন, শোবার কোনও ব্যবস্থা তো ছিল না, বিছানাপত্র, মশারি ইত্যাদির জোগাড় করতে হল। সেবার উনি অনেক দিন ছিলেন। তারপর একদিন বেরিয়ে পার্টি অফিসে যাবার সময়ে ধরা পড়ে যান। এই সূত্রে অন্য আর এক রাতের কথা মনে পড়ছে। বাবা দেরি করে ফিরলেন। বললেন, কাল শরৎবাবু (বসু) বিধানসভায় বক্তৃতা করবেন। শরীর ভাল নেই। বসে বলবেন। সব মাইক তো দাঁড়ানো, অন্য ব্যবস্থা করে এলাম।

পরদিন সকালে কাগজ খুলে মর্মান্তিক খবর। শরৎচন্দ্র বসুর আগের রাত্রে হার্ট অ্যাটাকে দেহাবসান হয়েছে। দেশবাসী স্তম্ভিত। বাবা খুব দুঃখ পেয়েছিলেন। দক্ষিণ কলকাতার নির্বাচনে শরৎচন্দ্র বসু কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন, সাল ১৯৪৯। তিনি নিজে ইউরোপে আছেন। তাঁর অনুপস্থিতিতেই নির্বাচনের প্রচার চলছিল। কংগ্রেসের সব বড় বড় নেতারা এসে ওঁর বিরুদ্ধে প্রচার করে গেলেন। বাড়িতে আলোচনায় দেখতাম বাবা এবং অন্য বন্ধুরা রাগে ফুঁসছেন। কত বড় সাহস, কলকাতায় এসে

শরৎবাবুর বিরুদ্ধে কথা বলছে। পুত্র শিশিরকুমার তখন ছাত্রাবস্থায় লন্ডনে। নির্বাচন সামাল দিচ্ছিলেন অপর পুত্র অমিয়নাথ। পরে শুনেছি আমার ভাসুর খুব নার্ভাস হয়ে পড়েছিলেন ফলাফলের চিন্তায়। কিন্তু সুদূর ইউরোপে বসে শরৎচন্দ্র বসু বিপুলভাবে দক্ষিণ কলকাতা থেকে জয়লাভ করেছিলেন।

রোজ বিধানসভায় যাতায়াতের ফলে আমাকে সকলে চেনে। লাল জরির কাজ করা উর্দি পরিহিত চাপরাশিরা নিঃশব্দে ঘোরাফেরা করে। আমাকে দেখলে বলে, দিদিমণি এসেছেন। কে যেন আমাকে ঠাট্টা করে বলেছিল, তুমি তো দেখছি বিধানসভার রাজকন্যা। একদিন ঝমঝম বৃষ্টির মধ্যে ভিজে হাজির হলাম। বল্লালবাবু বিধানসভার মার্শাল। তিন তলায় কোয়ার্টার। বল্লালবাবুর স্ত্রীর শাড়ি পরে সেদিন বাড়িতে ফিরি। আমার অজান্তেই এইসব দিনগুলিতে আমার রাজনীতির পাঠ আর সংবিধানের খুঁটিনাটির জ্ঞান অর্জন হয়ে গেল। বাবা সংবিধান বিশেষজ্ঞ বলে খ্যাতি পেয়েছিলেন। যে কোনও সাংবিধানিক সংকট হলে কী সরকার কী সাংবাদিকেরা দেখতাম বাবার মতামত চাইতেন। সভায় নানা তর্কবিতর্কে সংকটের সময়ে বাবা স্পিকারের রুলিং লিখতেন সব দিক বিবেচনা করে।

বাবা চারুচন্দ্র চৌধুরী বিধানসভার অন্যতম সচিব হিসেবে দলমত নির্বিশেষে সকলের প্রিয় ছিলেন। বহু বহুদিন পরেও জ্যোতি বসুর সঙ্গে দেখা হলে তিনি বাবার কথা বলতেন। আমি তখন রাজনীতিতে তাঁর বিপক্ষে পার্লামেন্টে মমতার দলের সাংসদ। জ্যোতিবাবু আমাকে বলেছিলেন, 'হি ওয়াজ অ্যা ভেরি লার্নেড ম্যান।'

আগেই বলেছি, আমার ফর্মাল পড়াশুনোর ব্যাপারটা সর্বদাই এলোমেলো। বি এ পড়বার সময়েও তার ব্যতিক্রম হল না। কোন বিষয় নিয়ে পড়ব, কোন কলেজেই বা যাব দিল্লি-কলকাতা আলোচনা পত্রের মাধ্যমে চলছে। মোটা মোটা গ্রিক ইতিহাস আর রোমান ইতিহাসের বই মেজকাকা নীরদচন্দ্রের কাছ থেকে ডাকযোগে আমার কাছে পৌঁছল। ইতিহাসে অনার্স মেজকাকার মত। আমি পড়তে চাই ইকনমিক্স। ওটা কোনও সাবজেক্টই নয় বলে বাবা-কাকা বাতিল করলেন। বাবা একদিন

বললেন, সংস্কৃত সাহিত্য পড়লে কেমন হয়। সংস্কৃত আমি ভাল জানি। ভাল লাগে। কিন্তু সংস্কৃতর ভবিষ্যৎ কী?

শেষপর্যন্ত কমপ্রোমাইজ সাবজেক্ট হিসেবে ইংরেজি সাহিত্যে অনার্স পড়া ঠিক হল। আমাদের কালে আমরা গুরুজনদের কথা শিরোধার্য করতাম। ইকনমিক্স পড়তে না-পেরে আমি খুব হতাশ হলাম। কিন্তু ইংরেজি মাথা পেতে নিলাম। আপত্তি করলাম না।

কলেজ পছন্দ নিয়েও একই টানাপোড়েন। তখনকার দিনে কলেজে ঢোকা আজকের মতো কঠিন ছিল না। প্রেসিডেন্সি কলেজে একটা আবেদন পত্র দেওয়া হল। কয়েক দিনের মধ্যেই সাদা রঙের পোস্টকার্ড এল আমাকে তারা গ্রহণ করেছেন। রাসবিহারী অ্যাভিনিউ থেকে কলেজ স্ট্রিটে বাসে চড়ে আমি একলা কীভাবে যাব তাই নিয়ে বাড়িতে মহা আলোচনা চলল। সে সময়ে ভাঙাচোরা একতলা পাঞ্জাবিদের বাস একমাত্র গতি। বন্ধুদের মধ্যে কেউ কেউ লেডি ব্রেবোর্নে গেল, সেটার কথা কেন ভাবা হল না জানি না। আচ্ছা, কলেজ স্ট্রিট পর্যন্ত না হলে পার্ক স্ট্রিট অবধি পারব কী? কিন্তু লরেটোতে কোনও আবেদন করিনি। তবু বাবা একদিন আমাকে নিয়ে চলে গেলেন। সাদা পোশাক পরা মেমসাহেব নান ধমক দিয়ে বললেন, এত দেরিতে আর কিছু হবে টবে না। আমরা থ্যাংক ইউ বলে পিছনে ফিরলাম।

মেমসাহেব ফিরে ডেকে বললেন, তোমার মার্কশিটটা একটু দেখি। একবার চোখ বুলিয়ে উনি বললেন, কাল টাকাপয়সা যা দরকার সব নিয়ে চলে এসো। তোমাকে আমরা নেব। হাতে ধরিয়ে দিলেন কাগজপত্র।

ইংরেজিতে অনার্স পড়বার জন্য প্রেসিডেন্সি কলেজ ও লরেটো দু'জায়গায় সিট পাওয়ার পরও কেন আমি কোনওটাতেই গেলাম না তা আমার কাছে খুব স্পষ্ট নয়। সেই যাতায়াতের অসুবিধার কথা। তবে ঘটনা হল এই যে দু'বছরের মাথায় বি এ পরীক্ষার পর ফ্রেঞ্চ ক্লাসে ভরতি হয়ে ট্রামে চেপে বেশ পার্ক স্ট্রিটে আলিয়াঁস ফ্রাঁসে-তে যাতায়াত করতে লাগলাম। আর এম.এ পড়ার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রেসিডেন্সি কলেজ বাসে নিত্য যাতায়াত। তবে ততদিনে বিধান রায়ের দৌলতে খুব সুন্দর দেখতে নীল দোতলা বাস হয়েছে। আমরা নাম দিয়েছি ইন্দ্রপুরী।

বাড়ির সামনে রাসবিহারী অ্যাভিনিউ থেকে উঠি আর একেবারে প্রেসিডেন্সি কলেজের সামনে এসে নেমে পড়ি। দু'বছরে জীবনযাত্রায় অনেক পরিবর্তন।

বি. এ পড়বার সময়টা আমার বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। খুব ব্যস্ত, নিজস্ব সময় বলে কিছু নেই। ভারতীয় ক্ল্যাসিক্যাল সংগীতে তালিম দিচ্ছেন তারাপদ চক্রবর্তী। সপ্তাহে দু'দিন বাড়িতে আসেন। আমি তাঁর প্রিয় ছাত্রী হয়েছিলাম। কিন্তু কেবলি বকুনি খাই। সকালে দু'ঘণ্টা, সন্ধ্যায় দু'ঘণ্টা রেওয়াজ করা উচিত; আমি ফাঁকি দিই বলেন। আসলে আমার সময় কোথায়। আমি বেঙ্গল মিউজিক কলেজে সেতার শিখতে যাই। বেশ অগ্রসর হয়েছি। লখনউ মিউজিক কলেজের সঙ্গে যুক্ত আমার কলেজ। সেখানে থার্ড ইয়ারে সেতারে ইন্টারমিডিয়েট দিলাম। লখনউ থেকে রতন ঝংকার এলেন পরীক্ষা নিতে, ভালভাবে পাস করলাম। এবার ফাইনাল। সংগীতবিশারদ পরীক্ষার জন্য তৈরি হতে হবে। সপ্তাহে দু'দিন সন্ধ্যায় তবলচি আসেন রেওয়াজ করার জন্য। আমার একটা সন্ধ্যাও খালি নেই। ইংরেজি অনার্স পরীক্ষার জন্যও পড়াশুনো চলছে। তবে আমার মনে হয় পড়ার দিকটা বেশ অবহেলিত হচ্ছে। রয়ে গিয়েছি আশুতোষ কলেজে। কলেজে বেশ কয়েকজন ভাল অধ্যাপক রয়েছেন। কিন্তু পড়াশুনোর পরিবেশটা নেই। সেই নিরন্তর জনস্রোত সিঁড়িতে ওঠানামা করছে। 'এম এম' বা মোহিনীমোহন মুখার্জি বেশ ভাল পড়ান, চমৎকার পড়ান সুজাতা চৌধুরী, 'জে এন সি' মানে জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী অত্যন্ত উঁচু মানের অধ্যাপক। কিন্তু ছাত্র-অধ্যাপক আদান-প্রদান তেমন নেই। সহপাঠীরা মধ্য মেধার, ফলে প্রতিযোগিতার অবসর নেই। কলেজ ম্যাগাজিনের জন্য লেখা চাইলেন 'এম এম'। 'লিবারেল এডুকেশন' বলে একটা লেখা দিলাম, উনি খুব পছন্দ করেছিলেন। বি এ পরীক্ষা হয়ে যাবার পর ছুটিতে কলেজ শিক্ষার এই হতশ্রী অবস্থা নিয়েই স্টেটসম্যান পত্রিকায় 'রোল নম্বর তেরো' ছদ্মনামে লেখা লিখেছিলাম। মাঝেমাঝে ধর্মঘট হয় কলেজে। সরকার তো কংগ্রেসের, বামপন্থীরাই ধর্মঘট ডাকে। কলেজ গেট অবরোধ করে অধ্যাপকদের ঢুকতে বাধা দেওয়া হয়। সকালে মেয়েদের কলেজ শেষ হলে বেলায় ছেলেদের ক্লাস শুরু। এক গেট দিয়ে মেয়েরা

যায়, অন্য গেটে ছেলেরা প্রবেশ করে। চালে-ডালে মিশে না যায় কড়া নজর থাকে।

বি. এ পরীক্ষা শেষ হওয়ার পরদিনই মা আর আমি এরোপ্লেনে দার্জিলিং রওনা হয়ে গেলাম। সেই আমার প্রথম এরোপ্লেন চড়া। বাবা আগেই বিধানসভার কাজে দার্জিলিং চলে গেছেন। বিধানসভার কোনও বিশেষ সিলেক্ট কমিটির বৈঠক বসেছে পাহাড়ে। মুখ্যমন্ত্রী বিধান রায়ের নেতৃত্বে প্রায় পুরো ক্যাবিনেট দার্জিলিঙে হাজির। সকালে মন্ত্রীরা অনেকে ম্যাল-এ বেড়ান। যাদব পাঁজা মশায় এই ঠান্ডায় খালি পায়ে হাঁটেন। হাঁটার পথে দেখা হলে বাবা বলেন, খুকু প্রণাম করো। প্রণাম করতে গিয়ে তার খালি পা দেখে আমি বিস্মিত হই। সাংবাদিকেরা আড়ালে তাকে 'খালিপদ বাবু' ডাকেন।

দার্জিলিঙের রাজভবনে বৈঠক হয়। আমরা রাজভবনের কাছেই, ম্যালের উত্তর দিকে একটু নেমে গেলে একটা সুন্দর দোতলা বাড়িতে থাকি। নাম তার হোমডিন, নামে বেশ ধ্বনিমাধুর্য। বাড়িটা কাঞ্চনজঙ্ঘার মুখোমুখি। সব ঘর থেকে এমনকী বাথরুম থেকেও দেখা যায় জানালার ওপারে কাঞ্চনজঙ্ঘা ঝলমল করছে। রাজভবন থেকে একটা চোরা বাটো বা শর্ট কাট আছে আমাদের বাড়ি অবধি। বাবার সেটা দিয়ে নিত্য যাতায়াত। পাহাড়ের মানুষজন কী সরল আর হাসিখুশি। আমাদের কাঞ্চি রোজ ভোরবেলা মর্নিং টি নিয়ে আমার শোবার ঘরে প্রবেশ করে। ট্রেতে চায়ের কাপের পাশে আগের দিন বিকেলে আসা চিঠিপত্র। আমি বলি, চিঠিপত্র কাল ডাক আসার পরেই দিলে না কেন? সে মুচকি হাসে। সাহেবি কেতা মতে সে শিখেছে এটাই নিয়ম। সে যখন হাসে তার লাল টুকটুকে গাল আর একটু লাল হয়ে যায়। আমাদের সঙ্গে এসেছে বাবার চাপরাশি সুধীর। তার লাল উর্দি তাতে সোনালি জরির কাজ— সে বাবার পিছনে কাগজপত্র ফাইল নিয়ে রাজভবনে যাতায়াত করে। তার পাহাড়ে বেজায় শীত করে। অন্য কোনও কাজে সুধীরকে খুঁজছি দেখে কাঞ্চি বলে— ওহ্ পালং মে গিয়া। অর্থাৎ পালঙ্কে লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছে। আমার চিরদিন ফটোগ্রাফিতে উৎসাহ। সেবার বেশ কিছু পাহাড়ি রমণীর পোর্ট্রেট তুলেছিলাম।

বাজারে যে লেপচা মেয়েটির কাছে ফল কিনি সে পরমা সুন্দরী। তার সরু তেরছা চোখ হাসলে একদম ছোট হয়ে যায়। একদিন ক্যামেরা তাক করেছি সে হাঁউমাউ করে উঠল। কিছুতে ছবি তুলতে দেবে না। কী ব্যাপার? সে বললে, তাদের গভীর বিশ্বাস ছবি তোলা হলে সে মানুষ মারা যায়। বেশ কয়েক দিন সাধ্যসাধনার পরে শেষপর্যন্ত সে ছবি তুলতে অনুমতি দিয়েছিল। মা কিনছেন বাতাবি লেবু, মোটাসোটা ভুটিয়া মহিলার দোকান। হাতে বাতাবী লেবু নিয়ে মা জিজ্ঞাসা করলেন, ভিতরটা বেশ লাল টুকটুকে হবে তো। আমি ক্যামেরা ফোকাস করছি, ভুটিয়া মহিলা এক গাল হেসে বললে, আমি তো ভিতরে পশি নাই।

একবার একটা খুব ভাল ফটোগ্রাফ তোলার সুযোগ পেয়েছিলাম দার্জিলিঙে। সেটা অবশ্য বছর দুয়েক পর।

কার্ট রোড থেকে ম্যালে ওঠার রাস্তাটাতে নিত্যদিন চলাফেরা করি। বাঁ পাশে ক্যাভেন্টারের দোকান। প্রায়ই তার দোতলার খোলা ছাদে বসে কফি খাওয়া হয়। নয়তো তার পরেই আছে কেক পেস্ট্রির বিখ্যাত দোকান গ্লেনারিজ। ফ্রাংক রসের দোকানে ওষুধ ছাড়াও অনেক কিছু পাওয়া যায়। সেদিন ফ্রাংক রসের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছি বাবা আর আমি, হঠাৎ পিছনে একটা হইচই— না কোনও গোলমাল নয়— উল্লাসের ধ্বনি। খবর কাগজ হাতে এক ছোকরা ছুটছে আর বলছে, এভারেস্ট কনকারড— এভারেস্ট জয় হয়ে গেছে। আমাদের সে যে কী থ্রিল কী বলব! ছেলেবেলা থেকে বাবার লাইব্রেরিতে এভারেস্ট অভিযানের নানান বই পড়তে পড়তে বড় হয়েছি। সব চেয়ে ভাল লাগত ম্যালোরি আর আরভিন-এর কাহিনি। শেষ ক্যাম্প থেকে তাঁরা দু'জন বেরিয়ে পড়লেন এভারেস্ট শিখরের দিকে।

ক্যাম্পে থাকা একাকী সঙ্গী সাহেব বিকেল তিনটের পর দেখলেন এভারেস্টের চূড়ার কাছাকাছি দুটি কালো বিন্দু। চোখে ঠিক দেখছি তো সাহেব ভাবলেন। ওরা উঠছে না নামছে। এখন তো তাড়াতাড়ি ফিরতি পথ ধরতে হবে নয়তো দেরি হয়ে যাবে। চারটে বেজে গেল, সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এল নিস্তব্ধ পাহাড়ে। ম্যালোরি, আরভিন— চিৎকার প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এল। তারা আর কোনওদিন ফিরল না। কে জানে তারাই প্রথম

এভারেস্ট শৃঙ্গ বিজয়ী কিনা। বহুদিন পর শিখরের কাছাকাছি পাওয়া গিয়েছিল তাদের একজনের বরফ কাটার কুঠার।

দিনটা ছিল ১৯৫৩ সালের ২৯ মে। এডমন্ড হিলারি আর তেনজিং নোরগের এভারেস্ট বিজয়ে যখন আমরা আনন্দে আত্মহারা তখন পূর্বসূরিদের কথা মনে পড়ছিল। বাবার আরও মনে পড়ল ফুলমামার দেহাবশেষ গ্রিন লেকের থেকে রেসকিউ পার্টি নিয়ে ফিরিয়ে এনেছিল এই তেনজিং। আমি বললাম, চলো তেনজিং-এর বাড়ি যাই। ক্যালকাটা রোডের ধারে আলুবাড়ি বস্তিতে থাকে তার পরিবার। সে তো তখনও ফিরে আসেনি। আমরা পৌঁছে গেলাম আলুবাড়ি বস্তি। দরিদ্র বস্তি কিন্তু সুন্দর একটি গোছানো ঘরে আমাদের বসতে দিলেন তেনজিং-এর স্ত্রী আর দুই কন্যা। আমি পটাপট বেশ কয়েকটি ছবি তুললাম তাদের— বক্কু পরে দাঁড়ানো তিনজন। আমরাই তাদের প্রথম ভিজিটর। দার্জিলিঙের কথা লিখতে বসলে মনে হয় কোনও শেষ নেই। কতবার যে ঘুরেফিরে এলাম। পরে যখন পাহাড়ে রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু হল, বিক্ষোভ, হিংসা, তাণ্ডব মনে হত হাসিখুশি পাহাড়ি মানুষগুলোকে কবে আমরা শত্রু বানিয়ে ফেললাম!

বিধানসভার কাজে বাবা যখন বাইরে যেতেন তখন অনেক সময়ে মা আর আমাকে সঙ্গে নিতেন। কয়েকবার স্পিকার কনফারেন্স-এর সময় বাবার সঙ্গে গিয়েছি। একবার মুম্বাই, তখন আমরা বলতাম বম্বে, আর একবার শ্রীনগর। মুম্বাইতে আমরা ছিলাম গেটওয়ে অব ইন্ডিয়ার বেশ কাছে, তাজ হোটেলের পিছন দিকের রাস্তায়। মুম্বাইর সমুদ্র আমাকে মুগ্ধ করেছিল। পুরীর সমুদ্র থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। পুরীর মতো বিশাল ঢেউ বালুকাবেলায় আছড়ে পড়ছে না। সামনে দিগন্ত বিস্তৃত উন্মুক্ত জলরাশি— শান্ত সমাহিত। হঠাৎ কখনও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলে মৃদু ঢেউ তুলে গেটওয়ে অব ইন্ডিয়ার প্রাচীরে আছড়ে পড়ল আর অমনি অজস্র জলের কণা দেবতার আশীর্বাদের মতো মাথার ওপর ঝরে পড়ল। তীরে দাঁড়িয়ে এমন অনেক দিন ভিজতাম।

অ্যাসেম্বলির কোনও মিটিং সেবার ছিল দিল্লিতে। দিল্লির কাজ শেষ হয়ে যাবার পর বাবা আমাকে ও মাকে নিয়ে আগ্রা, মথুরা, বৃন্দাবন

ঘুরতে গেলেন। আগ্রাতে সেই প্রথম তাজমহল চোখে দেখলাম। ছবিতে কত দেখেছি। কিন্তু সামনে না দেখলে এর অপরূপ সৌন্দর্য উপলব্ধি হয় না। বারবার দেখেও আশ মেটে না। রাত্রে টাঙ্গায় চড়ে আবার বার হলাম জ্যোৎস্নায় স্নাত তাজমহল দেখতে হবে। চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে তাজমহলের গম্বুজ, মিনার অপার্থিব দৃশ্য। তবে মনে পড়ে মা ভয় পেয়েছিলেন। চারিদিক নির্জন, টাঙ্গাওয়ালা আর আমরা। তবে অপ্রীতিকর কিছু ঘটেনি। আগ্রা ফোর্ট আমাদের মুগ্ধ করেছিল তার শ্বেতপাথরের সৌন্দর্যে। আর ফতেপুর সিক্রিতে আকবরের লাল পাথরের প্রাসাদ— আর বিশাল বুলন্দ দরওয়াজার স্থাপত্য আমাকে অভিভূত করেছিল।

মথুরা আর বৃন্দাবন দেখে কী যে হতাশ হলাম কী বলব! পদাবলী, কীর্তন, ভজন এমনকী মাইকেল মধুসূদন দত্তের ব্রজাঙ্গনাকাব্য সব মিলে মনের মধ্যে মথুরা বৃন্দাবনের যে কল্পনা ছিল তা সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ। মনে হতে লাগল, 'না দেখা ছিল যে ভাল।' তার উপর মন্দিরের কাছে পান্ডাদের অত্যাচার। তারই মধ্যে একদিন বৃন্দাবনে রামকৃষ্ণ মিশনের আশ্রমে গিয়েছিলাম। আশ্রমের নির্জন পরিবেশ, বাগানে অনেক ফুল। হঠাৎ আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে গেল, বাইরে বার হয়ে যমুনার তীরে দাঁড়ালাম। হঠাৎই স্বল্পক্ষণের জন্য বৃন্দাবন যেন স্বরূপে দেখা দিল। মেঘলা আকাশের নীচে যমুনার তীরে দাঁড়িয়ে মনে হল, এখনও তেমনি বহে যে যমুনা, উঠে তার তীরে মুরলীতান/ যে মানে সে মানে/ যে শোনে সে শোনে/ যে মানে, শোনে মজেরে প্রাণ—

কাশ্মীরে স্পিকারস কনফারেন্স খুব ভাল ভাবে মনে পড়ে। শ্রীনগরে খুব বড় করে আয়োজন হয়েছিল। বাবা তো সব সময়ে কাজে ব্যস্ত। কিন্তু কনফারেন্স-এর ফাঁকে সব ডিনার আর লাঞ্চে আমার নিমন্ত্রণ থাকে। ফলে অনেক লোকের সঙ্গে আলাপ হল। অনেক অভিজ্ঞতা। আমার কাঁধে ঝোলে এক রোলিকর্ড ক্যামেরা। কেমন করে যেন প্রায় অফিসিয়াল ফটোগ্রাফার হয়ে পড়েছি। চারিদিক থেকে ডাক পড়ে ছবি তুলে দেবার জন্য। ছবি তুলেছিও অনেক। একদিন এক কেলেঙ্কারি হল। মহারাজের প্যালেসে বাগানে লাঞ্চ হচ্ছে। আমাকে একজন এসে খবর দিলে বিধানবাবু তোমাকে খুঁজছেন। কী ব্যাপার। গিয়ে দেখি পোজ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন— ডা. বিধান

রায়, স্পিকার শৈল মুখার্জি, বক্সি গোলাম মহম্মদ—তখন জম্মু-কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী, আর এক অপূর্ব সুন্দর চেহারার তরুণ দম্পতি করণ সিং আর তাঁর পত্নী। বিধানবাবু সস্নেহে আমাকে বললেন, আমাদের একটা ছবি তুলে দাও দেখি। ফোকাস করে শাটার টিপলাম, কী কাণ্ড, শাটার কাজ করছে না। হাসিমুখে আবার ফোকাস করলাম। ওঁরা ভাবলেন দুটো ছবি উঠল। সমস্বরে 'থ্যাংক ইউ' বললেন। আমার যে কী অস্বস্তি, মুখে অবশ্য স্মিত হাসি বজায় রাখলাম। নানারকম ছবিই তুলেছিলাম সকলের— কিন্তু এ রকম একসঙ্গে পোজ দিয়ে ছবির সুযোগ হারালাম। ডাল লেকের ধারে ক্যামেরার দোকানে কর্মী একটু টিপেই ঠিক করে দিয়েছিল। বলল, সামান্য জ্যাম হয়ে গিয়েছিল। পরে করণ সিং-এর সঙ্গে গভীর পরিচয় হয়েছিল। নেতাজি ভবনে এসেছেন, বক্তৃতা দিয়েছেন। সহ-সাংসদ ছিলাম বেশ অনেক দিন। আমি লোকসভা, উনি রাজ্যসভা। আমার বিদেশ মন্ত্রক কমিটিতে উনি সদস্য থাকার ফলে একসঙ্গে কাজ করেছি, এমনকী কমিটি নিয়ে কাশ্মীরেও গিয়েছি। এই ফটোগ্রাফ ঘটিত গল্পটি তাঁকে কোনও দিন বলিনি। কাশ্মীরে এই কনফারেন্স ১৯৫৪ সালের কথা। তার ঠিক একবছর আগে কাশ্মীরের রাজনৈতিক পটভূমিতে ওলটপালট হয়ে গেছে। নেহরু সরকারের নির্দেশে ১৯৫৩-র আগস্ট মাসে কাশ্মীরের জননেতা শেখ আবদুল্লা গদিচ্যুত হয়েছেন এবং গ্রেপ্তার হয়ে জেলে গেছেন। তারই ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী বক্সি গোলাম মহম্মদ প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসেছেন। দিল্লির সঙ্গে এই সরকারের সম্পর্ক ভাল। তরুণ করণ সিং আনুষ্ঠানিক ভাবে রাষ্ট্রপ্রধান বা সদর-ই-রিয়াসৎ। সাধারণ মানুষের মনে বক্সি সম্পর্কে একটা চাপা ক্ষোভ। এক শিকারাচালক শেখ আবদুল্লার গুণগান করে বলেছিল— বক্সি নে ক্যায়া কিয়া— কুছ নেই কিয়া।

আমরা তখন কাশ্মীরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে আছি। কনফারেন্সের কাজকর্ম মিটতেই সকলে বেড়াতে বেরিয়ে পড়লেন। আমরা এবং স্পিকার শৈলবাবু ও তাঁর স্ত্রী চলে গেলাম পহালগাম। লেডার নদীর তীরে তাঁবু খাটানো হল পাশাপাশি ওঁদের আর আমাদের। একটা তাঁবু শোবার ঘর, একটা রান্না ঘর আর একটা ছোট তাঁবু— টয়লেট। ওঁদের রান্নার তাঁবু বেশ বড়। রোজ রান্নাবান্না হত, লোকজনও আছে। আমরা এত বেশি বেড়াতাম

যে বাইরেই খেয়ে নিতাম, খুব সুস্বাদু পথের ধারের দোকানে রুটি, তরকা, মাংস। বাবা, মা ও আমি অমরনাথের পথে যাব স্থির হল। সঙ্গে আরও কেউ যোগ দিলেন। তাঁদের মধ্যে তখনকার শিক্ষাবিদ হুমায়ুন কবীরের স্ত্রী শান্তি কবীর। সঙ্গে জিনিসপত্র আর ঘোড়া নিয়ে ঘোড়াওয়ালা। প্রথমদিন থামা হল চন্দনবাড়ি, সুন্দর বাংলো।

চন্দনবাড়ি থেকে শেষনাগ পর্যন্ত পথ বেশ কঠিন চড়াই। এক জায়গায় সরু পথ, একপাশে খাড়া পাহাড়, অন্য পাশে খাদ। আমি ঘোড়া থেকে নেমে হেঁটে চললাম। ঘোড়াওয়ালা বললে, ঘোড়ায় চড়ে যাওয়া অনেক নিরাপদ। কারণ ঘোড়া জানে ঠিক কীভাবে যাওয়া উচিত। একবার চোখ তুলে দেখলাম মাকে নিয়ে ঘোড়া খাড়া চড়াই সাবলীলভাবে উঠে যাচ্ছে। একবার ঝিরঝিরে ঝরনা, তার উপর কাঠের সাঁকো। ঘোড়া মাকে নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। সাঁকো ঠুকে দেখল পা দিয়ে, তারপর নেমে পড়ে ঝরনার জলের মধ্য দিয়ে হেঁটে চলল। সে বুঝল যে যাত্রী পিঠে নিয়ে যাবার ভার সাঁকো নাও নিতে পারে।

শেষনাগ পৌঁছে যেদিকে চাই বরফের বিস্তীর্ণ প্রান্তর। শেষনাগ একটি লেক কিন্তু জমে আছে। বাবার হাতের লাঠি দিয়ে একটু আঘাত করতে কাচের মতো ভেঙে গেল, নীচে জল। বরফের মাঝে ছোট দু'কামরার বাংলো, একটিতে রয়েছি আমরা। ছোট ঘরটিতে গাদাগাদি করে বসে অনেক রাত অবধি গান চলল। কানে বাজে মা আর শান্তি মাসিমা (কবীর) গান ধরেছেন— 'হরি হে তুমি আমার সকল হবে কবে'— অন্যরা গলা মেলাচ্ছে। পরদিন জানা গেল অমরনাথের পথ খুলতে আরও কয়েক দিন দেরি আছে। পথ তুষারাবৃত, আমাদের ফিরতে হবে। ঘোড়ায় উঠে রওনা হলাম। এদিকে আমার ঘোড়া কিছুতেই ফিরতি পথ ধরবে না। সে জানে পরের স্টেজ তো অমরনাথ। অনেক করে তার গলায় হাত বুলিয়ে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রওনা হলাম। চন্দনবাড়ি থেকে পহালগাম বেশ জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে একেবারে তাঁবুর সামনে থামলাম। শৈলবাবুরা ডেক চেয়ার পেতে চা খাচ্ছিলেন—আরে, এসো এসো অভ্যর্থনা করলেন।

পহালগামের সঙ্গে একধরনের আত্মিক যোগ বোধ করতাম। আমাদের পরিচিত এক সাধক সন্ন্যাসী তাঁর সন্ন্যাসজীবনের পূর্ণ সময় কাশ্মীরের

পাহাড়ে, পর্বতে কাটিয়েছেন, তবে তাঁর কেন্দ্র ছিল পহালগাম।

দেশভাগের পর কাশ্মীর যখন পাকিস্তানি হানাদারের আক্রমণে তখন তিনি বাংলাদেশে ফিরে আসেন, জীবনের শেষ দশ-বারো বছর প্রধানত কলকাতা, দার্জিলিং, পুরী, কাশী, আগ্রা, পাটনা ঘুরে বেড়াতেন। তাঁর পরিচিত কোনও কোনও পরিবারের সঙ্গে শ্রীনগরে আলাপ হয়। ওয়াটল পরিবার আমাদের আমন্ত্রণ করে তাঁদের এয়ারপোর্ট রোডের বাড়িতে নিয়ে যান। এঁরা নেহরু পরিবারের আত্মীয়, কাশ্মীরি পণ্ডিত। আর একজন সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ তাঁর পরিচিত এসে দেখা করলেন। মনে হয় মহারাজা হরি সিং-এর আমলে উচ্চপদস্থ কেউ ছিলেন। তাঁর সঙ্গে শ্রীনগরের পথে বার হলে দেখতাম পথের দু'ধারে মানুষ তাঁকে সেলাম জানায়।

কাশ্মীরে আমাকে সবচাইতে মুগ্ধ করেছিল সোনমার্গ। গুলমার্গ বা পহালগামের সৌন্দর্যে একটা শ্রী আছে সোনমার্গে প্রকৃতি যেন একটু রুক্ষ, বলিষ্ঠ। নীচের দিকে বরফ গলে গিয়েছে, উপরে তখনও বরফ। একপাশে একটি ইন্ডিয়ান আর্মির ক্যাম্প। আমি প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি তুলছিলাম। তারা আমাকে ছবি তুলতে বারণ করল। ফিরবার পথে আমরা আটকে পড়লাম। আমাদের গাড়ির সামনে পনেরো-ষোলোটি আর্মি ট্রাকের কনভয় চলছিল। তার একটি ট্রাক বিকল হয়ে হেলে পড়াতে দু'দিকেরই ট্র্যাফিক অচল। অনেকক্ষণ পথের পাশে দাঁড়িয়ে এক মিলিটারি অফিসারের সঙ্গে বাবা আর আমি গল্প করছিলাম। চশমা চোখে, বুদ্ধিদীপ্ত চেহারার তরুণ অফিসার। আমাদের আশ্বস্ত করছিলেন, এখুনি ক্রেন আসছে, পথ খুলে যাবে। কলকাতায় ফেরার কয়েক দিন পর বাবা আমাকে স্টেটসম্যান পত্রিকার একটি খবর দেখিয়ে বললেন, নামটা চেনা লাগছে না? সেই পরিচিত অফিসারেরই নাম— সীমান্তে কোনও গোলমালে নিহত হয়েছেন তিনি।

আ ট

বিশ্ববিদ্যাতীর্থ প্রাঙ্গণ

কাশ্মীর ভ্রমণের দিনগুলি হল এম.এ পরীক্ষার পরে। কিন্তু এম.এ পড়বার সময়ে আমার ছাত্র জীবনের দিনগুলি মনের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে আছে। বি.এ পরীক্ষার পর যে দীর্ঘ অবসর সে সময়ে পার্ক স্ট্রিটে অ্যালেয়াঁস ফ্রাঁসেতে ভরতি হয়ে গেলাম ফরাসি ভাষা শিখব। প্রথম টিচার হিসেবে যাঁকে পেলাম তিনি মাদমোয়জেল বসেনেক। চমৎকার পড়াতেন। তাঁর পড়ানোর গুণে আমাদের ফরাসি উচ্চারণ হল সঠিক, আর দ্রুত উন্নতি করতে লাগলাম। তারপর বেশ কিছুদিন পড়িয়েছিলেন মাদাম দে সরকার, বিদেশিনী কিন্তু বিবাহসূত্রে বাঙালি। ফ্রেঞ্চ পড়াটা অনেক দিন রেখেছিলাম, এম এ পড়বার সময়েও চালু ছিল। অবশ্য আমার কাকিমা, ডাক্তার কাকার স্ত্রী বলেছিলেন— ফ্রেঞ্চ শিখে কী হবে? দেশ স্বাধীন হয়েছে, এখন হিন্দি শেখো, কাজে লাগবে। কথাটা সত্যিই ছিল। কিন্তু তখন আমাদের মধ্যে ফরাসি পড়বার একটা আগ্রহ। একটা ঠাট্টাও চালু হয়েছিল। তখনকার তরুণ-তরুণীরা বাস থেকে নেমে পরস্পরের সঙ্গে দেখা হলে বলেন— 'কোমত্ আলে ভু?' বাংলায় যার মানে কেমন আছ। জবাব আসে, 'ত্রে বিয়াঁ, মের্সি।' খুব ভাল আছি ধন্যবাদ।

ফরাসি ক্লাসে আমার সমবয়সি যেমন আছে, তেমনি অনেকে বয়সে অনেক বড়। আমি একমাত্র সন্তান হওয়ার সুবাদে যে নিরাপত্তা বলয়ের ঘেরে থাকতাম সেখান থেকে বার হয়ে বাইরের বিশ্বের সঙ্গে পরিচয় ঘটতে লাগল। ট্রামে চড়ে পার্ক স্ট্রিটে যাই। ট্রামের জানালা দিয়ে হু হু করে হাওয়া আসে, সিল্কের শাড়ির আঁচল, মাথার চুল উড়তে থাকে। বাতাসে যেন ভেসে আসে স্বাধীনতার আস্বাদ।

একটু উঁচু ক্লাসে সহপাঠিনী হিসেবে পেলাম লেডি রাণু মুখার্জিকে। তাঁর সঙ্গে একরকম অসমবয়সি সখ্য হল। আমি তখন অল্পবিস্তর চিত্র সমালোচনা লিখতে শুরু করেছি। লেডি রাণু চিত্রকলা জগতে বিশিষ্ট ব্যক্তি। আমি বাবার লাইব্রেরিতে আধুনিক চিত্রকলার উপর বইপত্র পড়ে মডার্ন আর্ট-এর ভক্ত হয়ে পড়েছি। একটা মুশকিল হল কোনও চিত্র প্রদর্শনীতে লেডি রাণুর সঙ্গে দেখা হলে উনি ফরাসি ভাষায় কথোপকথন শুরু করেন। আমি কথা বলাতে তত অভ্যস্ত নই, ঠেকে ঠেকে বলি।

মাঝে মাঝে সোজা ফরাসি ক্লাস থেকে কলকাতা ইউনিভার্সিটি যাই। হয়তো একটু দেরি হয়ে যায়। ক্লাসের চৌকাঠে পা দিয়েছি, কানে আসে অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেনের কণ্ঠস্বর— রোল নম্বর সেভেন। হাঁপাতে হাঁপাতে বলি, সেভেন প্রেজেন্ট স্যর। উনি বলেন, ইয়েস স্যর, আই হ্যাভ সিন ইউ স্যর।

প্রথম যখন এম.এ পড়ব ঠিক হল, আমাদের বাড়ির উলটো দিকেই থাকেন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ইংরেজির অধ্যাপক, অধ্যাপক গুহ মাকে বললেন, 'কেন আবার এম এ পড়তে পাঠাবেন। মেয়েরা তো বেশি নেই। ওই যাদের এখনও বিয়েটিয়ে হয়নি— আপনার তো বেশ ফুটফুটে মেয়ে শিগগির বিয়েথা হয়ে যাবে।'

অধ্যাপক গুহ তাঁর মত পালটেছিলেন। কিছুদিন পরেই মা'কে বলেছিলেন এবার যে মেয়েদের ব্যাচটা এসেছে খুব প্রাণচঞ্চল। সত্যিই আমরা খুব হইচই ফেলে দিতাম। কাজল সেনগুপ্ত (তখন বসু) আর আমি মাঝেমাঝেই নতুন কিছু করবার প্ল্যান করতাম। সঙ্গে মদত দেবার জন্য আছে ঊষসী, নন্দিতা, রানি আরও সবাই। 'মার্ডার ইন দ্য ক্যাথিড্রেল' থেকে শ্রুতিপাঠ করব। আর 'ম্যাকবেথ' থেকে কিছু অংশ। ডাকিনীর ভূমিকায় কাজল আর আমি। শ্রোতার আসনে নিমন্ত্রিত অধ্যাপকেরা।

একবার 'এভরিবডি কামস টু মেবল' বলে এক নাটক আমরা মেয়েরা আশুতোষ বিল্ডিং-এর হলে করলাম। মুখ্য নায়িকা মেবল-এর ভূমিকায় কাজল, আমি দ্য আদার উওম্যান। নাটকের শেষে আমি কাজলের অর্থাৎ মেবল-এর স্বামীর সঙ্গে ইলোপ করব। হাসির নাটক, বেশ জমে গেল। ফলে তখনকার গভর্নর হরেন্দ্রকুমার মুখার্জি আমাদের ডেকে পাঠালেন।

আমরা রাজভবনের মার্বেল হলে নাটকের পুনরাভিনয় করলাম। বাইরের দর্শক সমাগমে হল ভরতি ছিল। আজকের ছেলেমেয়েদের কাছে এ কোনও আশ্চর্য ঘটনা নয়। কিন্তু সেই ১৯৫২ সালে আমাদের মেয়েদের এই দাপিয়ে বেড়ানো বেশ অভিনব ছিল।

এবার ভরতি হয়েছি প্রেসিডেন্সি কলেজে। সেখানে মাইনে দিই। মাইনে ছিল সতেরো টাকা। সেখানে আমাদের ক্লাস নেন সেকালের কিংবদন্তি অধ্যাপক তারকনাথ সেন। আর আছে অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের স্নেহ ও শাসন মিশ্রিত ছত্রছায়া। দোতলায় ইংরেজি সেমিনার রুমে আধুনিক কবিতা পড়ান অধ্যাপক অমল ভট্টাচার্য। তাঁর কাছেই আধুনিক ইংরেজি কবিতার রস আস্বাদন করতে শিখি। এইসব ক্লাসে আমার সহপাঠী তিন জন, অরুণকুমার দাশগুপ্ত, বিনোদকিশোর রায়চৌধুরী, ধৃতিকান্ত লাহিড়ি চৌধুরী। অচিরে আমাদের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব হয়ে যায়। অরুণ একটু গম্ভীর প্রকৃতির, ধৃতি আর বেণুর (বিনোদকিশোর) সঙ্গে বন্ধুত্ব সহজতর। আমাদের সর্বদাই একসঙ্গে ঘুরতে ফিরতে দেখা যায়। অতএব সহপাঠী মহলে আমাদের একটা ডাকনাম চালু হয়ে গেল— Goldilocks and her three bears. বেণুর দিদি রানি বিবাহের পরে নতুন করে পড়াশুনো শুরু করেছে। রানিও আমাদের দলের ঘনিষ্ঠ সদস্য। রানি দেখতে অপরূপ সুন্দরী। আমরা যখন একসঙ্গে কফি হাউসে আড্ডা দিই, সে টেবিল আলো করে বসে থাকে। একদিন অন্য টেবিল থেকে একটি ছেলে উঠে এসে আমাদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খানিক গল্প করল। ভদ্রতা করে বললাম, আপনি বসুন না। সে বললে, এবার যাই, মানে আমাদের টেবিলে একটা বাজি ধরা হয়েছিল যদি আপনাদের টেবিলে এসে আলাপ করতে পারি পাঁচ টাকা জিতব।

কেন এমন বাজি ধরা হল সে কিছু বলল না। তবে আমরা ধরে নিলাম রানিই এ টেবিলের আকর্ষণ।

বেণু একদিন দুম করে আমার সামনে বেশ একটা হৃষ্টপুষ্ট খাতা বসিয়ে দিল। খুলে দেখলাম গোটা গোটা হাতের লেখায় কবিতা লেখা। বেণু সিরিয়াস মুখে আমাকে বললে, রবীন্দ্রনাথের পর যে কবি উঠে আসছে এ সব তারই লেখা। শুনে তো আমি অভিভূত! প্রথম পাতায় নাম লেখা— শঙ্খ ঘোষ।

আমার বন্ধুরা প্রায় সকলেই বামপন্থী বা বলা যায় ফেলো ট্র্যাভেলর। ধৃতি- বেণুরা পূর্ববাংলার জমিদারবাড়ির ছেলে। সাধারণভাবে স্বাধীনতা ও দেশভাগ-উত্তরকালে পূর্ববাংলার মানুষেরা কংগ্রেসের প্রতি ছিলেন বিরূপ। আমার পিতৃদেবকেও দেখেছি চিরদিনই বামপন্থীদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। মনে হয় গাঁধী-সুভাষ বিরোধেরও এই ব্যাপারে ভূমিকা আছে। তবে আমাদের পরিবার মোটের উপর মুক্তমনা। মা-র যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ ছিলেন ফুলরেণুদি (গুহ)। লীলা রায়ের সঙ্গেও ছিল যথেষ্ট পরিচিতি। মা'র পিতৃগৃহ ঢাকার সূত্রে হয়তো এই পরস্পর নৈকট্য। জ্যোতি বসুর দিদি, স্নেহময় দত্তের স্ত্রীও ছিলেন মা-র বন্ধু।

আমাদের ছাত্রজীবনে 'স্টাডি সার্কল' বলে একটা ব্যাপার ছিল। আলোচনা বা আড্ডাও বলা যায়। তবে বামপন্থী আর আঁতলা।

ধৃতি-বেণুর সঙ্গে আমি এইরকম 'স্টাডি সার্কেল'-এ বারকতক গিয়েছি। এটা বেশ মনে পড়ে। অধ্যাপক সুশোভন সরকার মশাইয়ের এলগিন রোডের ফ্ল্যাটে। নানা রকম বিদগ্ধ আলাপ-আলোচনা। সেখানে একটি বেশ ঝকঝকে বুদ্ধিদীপ্ত ছাত্রকে দেখতাম, তার নাম সুখময় চক্রবর্তী। পরবর্তীকালে সুখময় বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ হিসেবে খ্যাত হয়েছিল।

একদিনের একটা ছোট্ট দৃশ্য। প্রেসিডেন্সি কলেজের বারান্দায় আমি আর ভারতী (রায়) দাঁড়িয়ে আছি। নীচে একদল ছেলে চলেছে। ভারতী ওপর থেকে বললেন, এই শোনো, শোনো অমর্ত্য কোথায় দেখেছ? একটি ছেলে মুখ তুলে নিস্পৃহ গলায় বললেন, মর্ত্যেই কোথাও আছেন। ভারতী চটে বললে, কথা বলার ভঙ্গি দেখলে।

আমাদের পড়াশুনো জোরকদমে চলছে। বিশেষ করে অধ্যাপক তারক সেনের ক্লাসে। এক একদিন বেলা একটায় ডাকেন। লাইব্রেরির পাশে ওঁর ছোট কিউবিকল-এ ক্লাস নেন। দুটো বাজে, তিনটে বাজে— কোনও একসময় বলেন যাও একটু চা-টা খেয়ে এসো। অমনি কফি হাউসে দৌড়। ফিরে এলে আবার পড়ানো চলল— পাঁচটা অবধি তো বটেই। মাঝে মাঝে সন্ধ্যা ছ'টা, সাতটাও হয়েছে। সারা কলেজ অন্ধকার, করিডোরে টিমটিম আলো। যেদিন স্যামসন অ্যাগনিস্টিস, পড়িয়ে শেষ করলেন এক সন্ধ্যায়,

বিধ্বস্ত আমরা করিডোরে দাঁড়িয়ে আছি। কে যেন বললে, কেমন লাগছে। আমি বললাম— Calm of mind all passion spent.

তারকবাবু পড়িয়েছিলেন কিং লিয়র, মিলটনের স্যামসন অ্যাগনিস্টিস, কখনও বা অস্কার ওয়াইল্ড, তখন সাহিত্যে শ্লীল-অশ্লীল বুঝিয়েছিলেন। চমৎকার পড়াতেন ক্রিটিসিজম— সমালোচনা কেমন করে করতে হয়।

একদিন ক্লাসে ইংরেজ চিত্রকর টার্নার-এর কয়েকটি ছবি দিয়ে কোনটি সেরা— সমালোচকের দৃষ্টিতে বলতে বললেন। আমি একটি সমুদ্রের ওপর জাহাজ পছন্দ করলাম— একটু ঝাপসা, আউট অফ ফোকাস মতো। অন্যরা অন্য একটি বেছে নিল, তারকবাবু ওদের সঙ্গে সহমত হলেন। আমাদের যুক্তি দিয়ে লিখে বলতে হবে আমাদের পছন্দের কী কারণ। খাতা যেদিন ফেরত দিলেন, আমার বুক দুরু দুরু। আমার তো ভিন্ন মত। খাতা খুলে দেখলাম উনি বসিয়ে দিয়েছেন 'S' অক্ষরটি অর্থাৎ কিনা Satisfactory. অধ্যাপক সেনের কাছ থেকে সেটা যথেষ্ট বড় পাওনা।

বাইরে গম্ভীর হলেও অন্তরে উনি স্নেহপ্রবণ ছিলেন। একবার আমাদের পড়ানোর ইন্টারভেলে কফি হাউসে কোল্ড কফিতে স্ট্র-সহ চুমুক দিতে বেণুর কফির সঙ্গে কী একটা উঠে এলে। কফির গুঁড়ো হতে পারে। বেণু বললে বাচ্চা আরশোলা। বেণু স্থির করলে ক্লাস ফাঁকি দেবার এ এক অপূর্ব সুযোগ। আমার দিকে চেয়ে, একটু সামলে দিও, বলে সে হাওয়া। ফিরে যেতে তারকবাবু তাঁর শান্ত স্বরে বললেন, বিনোদকিশোরকে দেখছি না। আমি যথাসাধ্য ট্র্যাজিক ভাবে আরশোলা ঘটিত উপাখ্যান বিবৃত করলাম। উনি এমন ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। উদ্বিগ্ন জিজ্ঞাসা— সে কী! খেয়ে ফেলেছে নাকি! ওষুধ দেওয়া হয়েছে? আমি তো অপরাধ বোধ করতে লাগলাম। পরদিন ক্লাসে আসা মাত্র তার শরীরস্বাস্থ্য নিয়ে অনেক সময় কাটালেন।

এ রকম উদ্বিগ্ন হতে আর একবার দেখেছি। রানি বিশেষ অনুমতি নিয়ে আমাদের কিউবিকল-এর ক্লাসে একদিন যোগ দিয়েছিল। সেদিন ওর চাবির গোছা হারিয়ে গেল। ক্লাসে পড়ে গিয়ে থাকতে পারে। সাহস করে কেউ স্যারকে বলতে পারছে না। 'এই যে ফেভারিট ছাত্রী'— বলে আমার 'থ্রি বেয়ারস' আমাকে ঢুকিয়ে দিল।

উনি অসময়ে আমাকে দেখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন। আমি

বললাম— মানে রানির শাশুড়ির চাবিটা কাল—। উনি ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন— সে কী! শাশুড়ির চাবি! তারপর নিচু হয়ে আমার সঙ্গে টেবিলের তলায় বেঞ্চির তলায় খুঁজতে লাগলেন। বাইরে আসা মাত্র অরুণের আমার ওপর চোটপাট— তারকবাবুকে দিয়ে টেবিলের নীচে খোঁজানো, ভাবা যায়! সে তার গুরুকে দেবজ্ঞান করে। আমার কী দোষ। আমার উপর তিনি আদেশ দিয়েছেন পিছনে সাফাই কর্মীদের কোয়ার্টারে গিয়ে জিজ্ঞাসা করতে হবে— ঝাঁটপাট দেবার সময়ে দেখেছে কিনা!

ওঁর সঙ্গে দীর্ঘ ক্লাস করতে গিয়ে আমাদের ইউনিভার্সিটির বেশ কিছু ক্লাস মিস হয়ে যায়। উনি বলেন খেয়াল রাখবে, পার্সেন্টেজ যেন চলে না যায়। কোন ক্লাস দরকারি অথবা তত প্রয়োজনীয় নয় সে-কথাও বলেন। আমরা শ্রীকুমারবাবুর ক্লাস অল্পদিন পেয়েছিলাম। উনি এমন আলংকারিক ইংরেজি বলেন যে আমরা ফাঁকি দিই। ওঁর সম্পর্কে কাহিনি হল— ছাত্রছাত্রীরা বারান্দায় ঘোরাঘুরি করছে দেখলে উনি 'Do not loiter' না বলে বলেন— 'Why are you perpetually perambulating in the corridor?'

তারক সেন মশাই বললেন, ওঁর মতো ভাল রোমান্টিক লিটারেচার কেউ পড়াতে পারেন না। ওঁর ক্লাস করবে। কিছুদিন পর আমাদের একটা মোটামতো খাতা দিয়ে বললেন— লেখাগুলো টুকে নিয়ে আমাকে ফেরত দেবে। খাতাটা শ্রীকুমারবাবুর পড়ানোর notes, নিয়েছেন তারক সেন।

ইউনিভার্সিটির ক্লাসগুলিতে আমরা অর্থাৎ ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্রীরা— যাদের অধ্যাপক গুহ 'প্রাণচঞ্চল' আখ্যা দিয়েছিলেন— খুব দুষ্টুমি করি। সেকালে ছেলেমেয়েরা আলাদা বসি, পরস্পরকে 'আপনি' সম্বোধন করি। বেশ বন্ধুত্ব হলে পর 'তুমি'তে নামা চলে।

ছেলেরা দরজার দিকে বসে। একজন অধ্যাপক ভাল মানুষ, কিন্তু কী বলেন বোঝা যায় না। তাঁর ক্লাসে 'প্রেজেন্ট স্যার' বলেই একে একে ছেলেরা হাওয়া। উনি দেখেও দেখেন না। একদিন আমরা আগে গিয়ে দরজার দিকে বসে ওদের পালানোর পথ বন্ধ করার চেষ্টা করলাম। সফল হলাম না। দূর থেকে ওকে দেখে ছেলেরা দৌড়ে গিয়ে, স্যার আজ ক্লাসটা পাশের ঘরে হবে বলে ওকে নিয়ে ঢুকে পড়ে দড়াম করে দরজা দিল বন্ধ

করে। কী করা যায়। আমরা দল বেঁধে দরজায় নক করলাম। উনি বললেন, কাম ইন, টেক ইওর সিট। আমরা মাথা নিচু করে বসতে যাব ছেলেরা হইহই করে হাততালি। ভাল মানুষ অধ্যাপক কী বুঝলেন— উঠে পড়ে বললেন, আজ আর পড়াব না, ছুটি দিলাম।

আমাদের আর একটা খেলা ছিল কাগজের টুকরোয় কবিতার লাইন বা কোনও মন্তব্য লিখে সামনে উপবিষ্ট সহপাঠীর পিঠে সেঁটে দেওয়া। মেয়েরা শুরু করেছিলাম। ছেলেরাও তাদের এলাকায় চালু করল। আমি খুব সজাগ কেউ আমার পিছনে কিছু লাগাতে পারে না। একদিন অন্যমনস্ক হয়ে জানলার বাইরে মেঘলা আকাশের দিকে চেয়ে এক পিরিয়ড কাটিয়ে দিলাম। ক্লাস শেষের ঘণ্টা পড়তে দেখি আমার দিকে চেয়ে কেউ কেউ মুচকি মুচকি হাসছে। উঠে দাঁড়াতেই পিঠের আঁচলে কাগজের খচমচ। দেখি লেখা রয়েছে, 'তুমি কী কেবলি ছবি!'

ছাত্র ইউনিয়নের নির্বাচন। আজকের মতো রক্তারক্তি না হলেও উত্তেজনা আছে। ধৃতি হল কট্টর বাম, নির্বাচনে দাঁড়িয়েছে। আমাদের ক্লাস থেকে কংগ্রেসের হয়ে দাঁড়িয়েছে পূর্ণেন্দু। ছেলেটি ভদ্র, সজ্জন। সুন্দর কবিতা লেখে। ক্লাসে একদিন প্রচারে বক্তৃতা করলে। বক্তৃতা করতে করতে সে যেদিকে মেয়েরা বসে সেদিকে চেয়ে কী যেন বলছিল, ছেলেদের দিক থেকে হাঁক উঠল, পূর্ণেন্দু ভাই, আমরাও আছি। সে অপ্রস্তুত, তাড়াতাড়ি দিক বদল করলে।

নির্বাচনের আগের দিন হবে, আমি পূর্ণেন্দুর একটা এক লাইনের চিঠি পেলাম—

প্রীতিস্মিতাসু, মনে আছে তো কাল নির্বাচনের দিন। ইতি প্রীত্যর্থী পূর্ণেন্দু।

চিঠির কথা শুনে ধৃতি চটে উঠে জিজ্ঞাসা করলে, কী লিখেছে? কী চায়? আমি বললাম কিছু চায়নি, প্রীত্যর্থী। শুনে আশ্বস্ত ধৃতি বললে— 'গিভ হিম দ্যাট অ্যান্ড গিভ মি দ্য ভোট।'

ধৃতি একটা ছোট গাড়ি কিনেছিল। গাড়িটার ওপরে আমরা সবাই খুব উৎপাত করতাম। দল বেঁধে এদিক-ওদিক যাওয়া, তা ছাড়া আমাদের প্রয়োজনে বাড়ি থেকে কলেজ বা কলেজ থেকে বাড়ি পৌঁছনো ইত্যকার

আবদার রক্ষা করা। সেই সূত্রে একদিন অধ্যাপক তারক সেনের সঙ্গে রাসবিহারী অ্যাভিনিউ থেকে প্রেসিডেন্সি কলেজ মোটরগাড়ি যাত্রার সৌভাগ্য হল।

আচমকা সেদিন ট্রাম-বাস চলাচল বন্ধ হয়ে গেল। বামেরা কী সবের প্রতিবাদে 'হরতাল' ডেকেছে। ধৃতি তার ছোট গাড়িটি নিয়ে আমাকে তুলতে এল। পথে নেমে দেখি গাছের তলায় ছাতা হাতে দীর্ঘদেহী তারকবাবু দাঁড়িয়ে আছেন বাসের অপেক্ষায়। ধৃতি তাকে সাদরে এনে সামনে বসাল। এদিকে হঠাৎ এমন ভাবলেশহীন মুখ করে আছে যে আমাকে যেন দেখতেই পাচ্ছে না। কী মুশকিল! তারকবাবু আমাকে দেখেছেন, ডেকে নিলেন। পিছনে বসলাম। থিয়েটার রোড থেকে রানিকে তুলতে হবে। বাড়ির কাছাকাছি এলে আমি মৃদু গলায় কথাটা মনে করিয়ে দিতে গেলাম। ধৃতি স্পিড বাড়িয়ে দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে গাড়ি চালাল তারকবাবু চমকে পিছনে ফিরে বললেন, কিছু বললে? আমি বললাম, না। গাড়ি থামল প্রেসিডেন্সির গাড়ি বারান্দায়। ধৃতিকান্ত, খুব উপকার করলে, বলে তারকবাবু নেমে গেলেন। আমার দিকে ফিরে এবার ধৃতির তর্জনগর্জন। দেখতে পাচ্ছ তারকবাবু রয়েছেন সঙ্গে, একটা কাণ্ডজ্ঞান নেই, একে তুলতে হবে, তাকে তুলতে হবে—। আমি বললাম, শহরের অস্বাভাবিক পরিবেশ উনি কিছু মনে করতেন না।

আমাদের মাস্টারমশাইদের প্রতি আমাদের ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধা ছিল। কাজল (বসু, পরে সেনগুপ্ত) আর আমি অধ্যাপক সুবোধ সেনগুপ্তর কাছে বেজায় বকুনি খেলাম। ক্লাসে ফার্স্ট বেঞ্চে বসে দু'জনে ফিসফিস করে কথা বলছিলাম। উনি পড়াচ্ছেন বার্নাড শ'— আর্মস অ্যান্ড দ্য ম্যান। আমরা নাটকটা নিয়েই কথা বলছিলাম অবশ্য। আগের সন্ধ্যায় উড স্ট্রিটের একটা পুরনো বাড়ির হল ঘরে 'আর্মস অ্যান্ড দ্য ম্যান' নাটক হয়েছে। নায়িকার ভূমিকায় কাজল, পরিচালনায় আমাদের চেয়ে সিনিয়র ছাত্র পি লাল। আর প্রেমিকের ভূমিকায় লালের বন্ধু বিশ্বনাথন। প্রথম দৃশ্যে জানালা দিয়ে প্রেমিকের নায়িকার ঘরে প্রবেশ। বিশ্বনাথন সত্যিই দোতলার জানালা টপকে এল, মনে হয় কার্নিসে দাঁড়িয়েছিল। দর্শকের আসনে আমি হতবাক। এসব কথা তো সুবোধবাবুকে বলা যাবে না। ক্লাস

শেষে দু'জনে ওঁর পিছনে গেলাম, বললাম, সরি। উনি রেগে বললেন, নো ইউ আর নট সরি। আমাদের বকুনি খাওয়া দেখে ছেলেরা বেজায় খুশি। অরুণ বললে, 'কেন যে আগে পরামর্শ না করে কাজ করো। রাগ পড়ে গেলে তারপর ওর সঙ্গে কথা বলতে হত।' ওঁর রাগ বিকেলের মধ্যেই পড়ে গেল। ট্রামে উঠে ওঁর সঙ্গে হঠাৎ মুখোমুখি। এক গাল হেসে বললেন, কোথায় চলেছ?

পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকে আমাদের এই কলেজ জীবনের কথা লিখতে গিয়ে মনে হচ্ছে আজকের তরুণদের কাছে এ কাহিনি কি প্রাগৈতিহাসিক মনে হবে? প্রকৃতপক্ষে তারুণ্যের দিনগুলি মূলত এক। আমরা দলবেঁধে পার্ক স্ট্রিটে খেতে যাই। 'কোয়ালিটি' নতুন খুলেছে। এক একদিন এক একজনের খাওয়াবার পালা। 'আজ ছোড়দা খাওয়াবে'— প্রেসিডেন্সি কলেজসুদ্ধ যাকে আমরা ছোড়দা ডাকি তার নাম সনৎ ভট্টাচার্য। তার এক দাদা আমাদের সিনিয়র দর্শনের ছাত্র। তাই সনৎ 'ছোড়দা' নাম পেয়েছিল মনে হয়। লাইট হাউসে সিনেমা দেখার টিকিট বেণু কাটবে। ছোড়দা বললে, আই এ এস পড়বে। শুনে উত্তেজিত কাজল আর আমি যোগ দিলাম। আমাদের বসবার ঘরে তিন জনে তিন-চারদিন একসঙ্গে প্রবল পড়াশুনো। মা চা আর চিঁড়েভাজা খাওয়ালেন। তারপর আমাদের উৎসাহ চলে গেল।

আমাদের বন্ধুদের আড্ডা বসে থিয়েটার রোডে ব্রিটিশ কাউন্সিলে। বারান্দায় টেবিল ঘিরে বেতের চেয়ার, সকলের সামনে খোলা বই। নিচু গলায় আলোচনা চলছে। ধীরে তর্কাতর্কি উঁচু গলায় পৌঁছলে কাউন্টারে বসা মেমসাহের ধমক দেন— স্‌স্‌স্‌! আমরা উঠে পড়ে ক্যামাক স্ট্রিট ধরে হাঁটা শুরু করি। সেকালের ক্যামাক স্ট্রিট, দু'পাশে বিশাল গাছের ছায়া, তারই ফাঁকে লাল ইটের দোতলা বাড়ি। কখনও বা ধৃতির ছোট্ট গাড়িতে সদলবলে যাত্রা। চৌরঙ্গি দিয়ে গাড়ি ছুটছে, আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে এল, ময়দানের গাছগুলো স্তব্ধ। ধৃতি গান ধরল, ওরে ঝড় নেমে আয়। কথা নেই বার্তা নেই তুমুল ঝড়, ময়দানের গাছগুলো খেপে উঠে দুলতে শুরু করল। সবাই ধৃতিকে বকাবকি, তোমাকে তানসেন হতে কে বলেছিল। সে বললে, এখুনি থামিয়ে দিচ্ছি। গান ধরল 'বাদল ধারা হল

সারা—' সঙ্গে সঙ্গে থামা দূরস্থান, নামল প্রচণ্ড বৃষ্টি। কলকাতার পথে হাঁটুজল। কিছুদূর গিয়ে গাড়ি অচল।

কলেজে আমাদের যারা সিনিয়র তারা কেউ কেউ কলেজ জীবনের শেষে যুগল হলেন। রুবিদি-নিরুপমদা, পি লাল-কিশা ইত্যাদি। কিন্তু আমাদের এই দলটার মধ্যে গড়ে উঠেছিল এক অবিচ্ছেদ্য সখ্য। জীবনে কিছুই চিরন্তন নয়। কলেজ জীবনের শেষে যে যার জীবন-যুদ্ধে রত, নিত্য দেখাসাক্ষাতের প্রশ্নও নেই, তবুও আজীবন এক সূক্ষ্ম বন্ধন রয়ে গিয়েছিল— কাজল, রানি, ধৃতি, বেণু, অরুণ, সনৎ, আমি।

পরীক্ষা এসে পড়েছে, ক্লাস শেষ হয়ে যাবে শিগগিরি। এমনি সময়ে আমরা একদিন ডায়মন্ডহারবারে হাজির, অবশ্যই সেই ছোট্ট গাড়িটিতে। ধৃতি সঙ্গে বন্দুক এনেছে, সে ভাল শিকারি। গাড়ি থেকে নেমে নৌকোতে। ধৃতি বন্দুক তাক করলে। বারোটা গুলিতে এগারোটা টিল পাখি। ঝুপ করে জলে আওয়াজ হয়, ক্ষীণ রক্তের রেখা, পাড়ে বসা বালকেরা জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে তুলে এনে দেয়। আমি স্টেটসম্যান পত্রিকা দিয়ে চোখ ঢেকে রাখি। এ খেলা আমার ভাল লাগে না।

শিকার পর্বের শেষে জলের ধারে বসে আড্ডা হয়। গাছ থেকে টাটকা খেজুরের রস নামিয়ে দিয়েছে। আমি ভয়ে খাই না, আমার ধারণা লোকে মাতাল হয়ে যায়। কাজল সাহসী, একটা তত পরিষ্কার নয়, কাঁচের গেলাস থেকে দিব্যি চুমুক দিচ্ছে। হঠাৎ আলোচনার বিষয় দাঁড়িয়ে গেছে দূর ভবিষ্যতে আমাদের ছেলেমেয়েদের নামকরণ কী হবে। কাজল বললে, তোমার নামটা আমার খুব পছন্দ। আমার মেয়ের নাম রাখব কৃষ্ণা। রানির তো বালিকা কন্যা আছে, বুবলি আমাদের সকলেরই আদরের। ধৃতিকে নিয়ে খুব মুশকিল। তার পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ সব 'ধ' দিয়ে নাম ধীরেন্দ্রকান্ত, ধরণীকান্ত ইত্যাদি। সে নিজেই স্বীকার করলে 'ধ' দিয়ে তার ছেলের ভাগ্যে দুটো মাত্র নাম হতে পারে— ধাপ্পাবাজকান্ত বা ধড়িবাজকান্ত।

ধৃতি-শীলা সংসার পাতলে। তাদের পুত্র হল দীপকান্ত। বেণু-সুমিত্রার সুখের সংসারে দুই কন্যা। অরুণেরও দুই কন্যা। কাজল অক্সফোর্ড থেকে ফিরে অনেক দেরিতে সংসার করলে। প্রেসিডেন্সিতে মহিলা অধ্যাপিকা

হিসেবে প্রথম দিনে ছাত্ররা ব্ল্যাকবোর্ডে লিখল— 'মাগো, আমার শোলকবলা কাজলাদিদি কই?'

পড়াশুনোর চাপ ও বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে সদলবলে হইচইয়ের ফাঁকে আমি কিন্তু আমার লেখালেখির চর্চা চালিয়ে যাচ্ছিলাম। আমার প্রিয় সাবজেক্ট সেই সময়ে মডার্ন আর্ট। 'আধুনিক চিত্রকলা' বলে একটি লেখা 'দেশ' পত্রিকায় পাঠিয়ে দিলাম। সম্পাদক সাগরময় ঘোষ লেখাটি ছাপলেন। উৎসাহিত হয়ে চিত্রকলা প্রদর্শনীর ওপর লেখা পাঠালাম। দেশ পত্রিকায় আমার বাংলা লেখা প্রথম প্রকাশ এই প্রবন্ধ দুটি। কলকাতায় একটি নতুন ইংরেজি সান্ধ্য দৈনিক বার হল সেই সময়ে, নাম 'Free Lance'। তারা আমাকে একটি চিত্রপ্রদর্শনী কলা-সমালোচক হিসেবে কভার করতে বলল। আমি এরপর তাদের কলা-সমালোচক হয়ে পড়লাম। লেখায় নাম থাকত না, 'বাই আওয়ার আর্ট ক্রিটিক' ছাপা হত। আমি আমার কেরিয়ার স্থির করে ফেলেছি। আমি কলা-সমালোচক হব। বাবার লাইব্রেরিতে মন দিয়ে আর্টের ওপর পড়াশুনো করতে লাগলাম।

ফিল্ম ক্রিটিক হওয়ার একটা অফার পেলাম। বিলেতের পড়াশুনো শেষ করে চঞ্চল সরকার কলকাতার স্টেটসম্যান পত্রিকায় যোগ দিলেন। ওঁর সঙ্গে আমার একটা মামা-ভাগনি সম্পর্ক আছে। চঞ্চল মামা বললেন ফিল্ম্ ক্রিটিকের পদটা খালি আছে, তুমি করবে? স্টেটসম্যানে ফিল্ম্ ক্রিটিক বেশ লোভনীয় প্রস্তাব। আমি না বলে দিলাম। সপ্তাহে প্রায় রোজই সিনেমা দেখা আমার পোষাবে না। ছবি দেখা অন্য ব্যাপার। শিল্পী পরিতোষ সেন তাঁর নিজের প্রদর্শনীর আলোচনা পড়ে প্রীত হয়ে সম্পাদককে চিঠি দিয়েছিলেন। আমাকে 'he' বলেই উল্লেখ করেছিলেন, ভেবেছিলেন পুরুষমানুষ। দিল্লি থেকে মেজকাকা নীরদচন্দ্র আমাকে লিখলেন কারা যেন নতুন একটা কাগজ পাঠাচ্ছে। এমনিতে বিশেষ কিছু নয়। কিন্তু আর্ট সমালোচনা ভাল হচ্ছে। শুনে আমার তো 'হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে' অবস্থা। জানালাম পরিচয়। জবাবে লিখলেন, গতবারের লেখায় অনেকখানি ফরাসি উদ্ধৃতি ছিল, এত ভাল ফরাসি শিখে ফেলেছ নাকি!

আর্টের জগতে এক পরিচিত নাম ছিল অবনী সি ব্যানার্জি। লেখা পড়ে তিনি আলাপ করতে এলেন। মডার্ন আর্ট-এর ওপর তাঁরা আমাকে বক্তৃতা

দিতে আমন্ত্রণ করলেন। শুনলাম এলগিন রোডে নেতাজি ভবনে বক্তৃতার ব্যবস্থা হবে। পরে স্থান বদল হল। জীবনে প্রথম পাবলিক লেকচার চৌরঙ্গির ওয়াইএমসিএ হলে দিলাম। পিছনে ফিরে ভাবলে অবাক লাগে স্লাইড দেখিয়ে নির্ভয়ে বক্তৃতা করে যাচ্ছি। সামনে সেকালের অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি, সৌমেন ঠাকুরকে মনে পড়ছে। বক্তৃতার পর লেখাটি অমৃতবাজারের চিদানন্দ দাশগুপ্ত নিলেন। অমৃতবাজারে ছাপা হল।

আমার অবশ্য চিত্র সমালোচক হওয়া আর হয়ে ওঠেনি।

কোনও এক ফাঁকে সেতারে সংগীতবিশারদ পরীক্ষা দিয়ে দিলাম। ভি জি যোগ পরীক্ষক ছিলেন। পাশ করে গেলাম। রেওয়াজ করার কোনও সময় ছিল না, ফল তেমন কিছু হল না।

কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে আমার প্রিয় যাওয়ার জায়গা ছিল রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার। না, তখনও গোলপার্কের বিশাল বাড়ি তৈরি হয়নি। টালিগঞ্জে একজন একটি বড় তিনতলা বাড়ি দান করেছিলেন মিশনকে। সেখানে নানারকম বক্তৃতার আয়োজন হত। নিত্য স্বরূপানন্দজি তখনও দেখাশুনো করেন। অনেক বক্তার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হয়। একবার আমেরিকা থেকে এলেন অখিলানন্দ, আরও একবার নিখিলানন্দ। ময়মনসিংহের সূত্রে এঁরা বাবা-কাকার পরিচিত। বিবেকানন্দের প্রভাব— অন্য অনেকেরই মতো আমার জীবনে অত্যন্ত গভীর। বাবার সাহিত্য সমৃদ্ধ লাইব্রেরিতে অন্য বইয়ের মধ্যে 'ভারতে বিবেকানন্দ' বইটি পড়ে ফেলেছিলাম বেশ ছেলেবেলায় আর অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। বাবা নাস্তিক হলেও মিশনের সেবাধর্মে আকৃষ্ট ছিলেন আর অনেক সাধুদের সঙ্গেই ছিল ব্যক্তিগত পরিচয়। বাবা এবং মা-ও অনেক সময়ে আমার সঙ্গে অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন। শ্রদ্ধেয় ভরত মহারাজের সঙ্গে পারিবারিক যোগ ছিল ঘনিষ্ঠ। পরবর্তীকালে দেখেছি আমার পিতৃগৃহ, শ্বশুরগৃহ সকলের সব সংবাদ তাঁর নখদর্পণে।

আধ্যাত্মিক চেতনার কথাই যখন হচ্ছে তখন আর একজন সাধকের কথা বলতে হয়। পঞ্চাশের দশকের গোড়ায় বা তার একটু আগেই এই ভিন্ন ধরনের সাধকের সঙ্গে আমাদের পারিবারিক পরিচয় হয় অথবা বলা চলে পুনরায় পরিচয় হয়। সেই সময়ে তাঁর বয়স আশি ছুঁই ছুঁই। তিনি

আমার দাদু ললিত রায়কে ভাল চিনতেন। দিদিমা এখনও আছেন জেনে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত অর্থাৎ তাঁর জীবনের শেষ দশ বছর তিনি আমাদের অত্যন্ত আপনজন হয়ে পড়েন। সেই সময়ে কলকাতার সমাজে এক সন্ন্যাসী ও এক সন্ন্যাসিনী অত্যন্ত জনপ্রিয়, মোহনানন্দ ব্রহ্মচারী ও আনন্দময়ী মা। কিন্তু আমাদের নব পরিচিত সাধক গুপ্ত থাকতে পছন্দ করতেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে ছাত্রাবস্থায় থাকার সময়ে তিনি ফাইনাল পরীক্ষা শেষ হওয়ার আগে সন্ন্যাস গ্রহণ করে জম্মু-কাশ্মীর চলে যান। কাশ্মীরের পাহাড়ে পর্বতে তাঁর সন্ন্যাসজীবন কেটে যায়। মাঝে মাঝে বেনারস বা আগ্রাতে নামতেন। পূর্ববাংলাতেও যেতেন।

আগেও ওঁর কথা বলেছি। কাশ্মীর ভ্রমণের সূত্রে স্বাধীনতার পর পরই যখন কাশ্মীরে পাকিস্তানি হানাদারের আক্রমণ ও যুদ্ধ হয় সেই সময়ে তিনি পহালগামে ছিলেন। যুদ্ধের অশান্ত সময়ে খানিক ঝুঁকি নিয়ে সমতলে নেমে আসেন। তাঁর কোনও আশ্রম ছিল না, সাধারণ অর্থে যা বোঝায় সেই অর্থে দীক্ষাও দিতেন না। শেষ জীবন তিনি পুরী, বেনারস, আগ্রা, দার্জিলিং, কলকাতা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে কাটাতেন। একবার কলকাতাবাসের সময়ে দিদিমার সঙ্গে পূর্ব পরিচয়ের সূত্রে আমার মা-র সঙ্গে তাঁর দেখা হল। তিনি মাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার ক'টি ছেলেমেয়ে? মা বললেন, আমার একটি মেয়ে। উনি হেসে বললেন, কী বোকা মা আমার। তোমার একটি ছেলে আর একটি মেয়ে।

আমার মা সেদিন থেকে তাঁর পরম ভক্ত। একটা প্রায় বৈপ্লবিক পদক্ষেপ হল আমাদের ঠাকুরের আসনবিহীন গৃহে প্রথম মা ঠাকুরের আসন প্রতিষ্ঠা করলেন। বাবা কোনও উৎসাহ প্রকাশ করলেন না কিন্তু আপত্তিও করলেন না। নিজের নাস্তিক অস্তিত্বে অবিচল থাকলেন।

মা-র পীড়াপীড়িতে এবং খানিক নিজস্ব কৌতূহলবশে আমার সঙ্গে ওঁর পরিচয় হল। প্রথম সাক্ষাতে আমার সঙ্গে ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে অনেক আলোচনা করলেন। এই বয়সে স্মৃতিশক্তি প্রখর। শেক্সপিয়রের বিভিন্ন নাটক থেকে দীর্ঘ প্যাসেজ আবৃত্তি করে চলেছেন। আবার সংস্কৃতে গভীর জ্ঞান। উপনিষদের বিভিন্ন মন্ত্র অবলম্বনে বেনারসের খ্যাতনামা পণ্ডিত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের সঙ্গে আলোচনা করে এক পূজা মন্ত্র বই

লিখেছেন। পুরোহিত ডেকে পূজা করতে হবে না। পরিবারের সকলের সঙ্গে বসে নিজেরাই মন্ত্রোচ্চারণ করবেন। বাবাকে আমি বেশ কিছুদিন বোঝালাম এই সাধক একজন পণ্ডিত ব্যক্তি আর অত্যন্ত সৎ, আলাপ করলে তোমার ভালই লাগবে। শেষ পর্যন্ত বাবাকে রাজি করালাম। বাবাকে দেখে উনি বললেন, জানেন তো আমি নাস্তিক খুব পছন্দ করি। মুখে ধর্ম ধর্ম বলে আর কাজে অন্যরকম তার চেয়ে নাস্তিক অনেক ভাল।

অতঃপর আমার নাস্তিক পিতৃদেব তাঁর বিশেষ বন্ধু হয়ে পড়লেন। বাবা ভাল এস্রাজ বাজাতেন। এরপর যখন উনি মাঝেমধ্যে কলকাতা আসেন বাবা এস্রাজ হাতে দেখা করতে যান। বাবা এস্রাজ বাজান, আমি গান করি— পদপ্রান্তে রাখো সেবকে। সঙ্গে যিনি খোল বাজান তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক শশিভূষণ দাশগুপ্ত। ইনি একজন বিশিষ্ট অনুরাগী ও ভক্ত। নানারকম তর্কবিতর্কও চলে। একজন মঙ্গলময় ঈশ্বরের অস্তিত্বে কেন বিশ্বাস করব। মানুষের এত দুঃখ কষ্ট চারিদিকে এত হিংসা দ্বেষ। উনি বলেন, জীবন পজিটিভ- নেগেটিভের খেলা, দুঃখ কষ্ট থাকবেই। তারই মধ্যে আনন্দে থাকতে হবে— সেটাই প্রকৃত সাধনা। সেই সাধনা যে কত কঠিন তা ওঁর অজানা নয়। তিনি বলতেন, 'ঝড় বৃক্ষকে সতেজ করে— অবশ্য দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলে।' আমি চিরদিন রয়ে গেলাম সংশয় আর বিশ্বাসের দোলাচলে। আমার প্রিয় কবি ব্রাউনিং যাকে বলেছেন 'the search of the finite soul for the infinite'।

সে তো নিরন্তর চলেছে মানুষের মনে। প্রকৃতির সৌন্দর্য, ধ্রুপদী সংগীতের মূর্ছনা সেই আকুতি জাগিয়ে তোলে। হৃদয় মাথা নত করতে চায়, মস্তিষ্ক যুক্তি দিয়ে অস্বীকার করে। তবে জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে এই উপলব্ধি হয় যে ঝড়ের মুখে দাঁড়াতে হলে একটা বিশ্বাস বা 'ফেথ' খুব প্রয়োজন। তবেই ঝড় বৃক্ষের ক্ষতি করতে পারে না, বরং সতেজ করে।

দেখতে দেখতে পরীক্ষার দিন এসে পড়ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস বন্ধ, সবাই বাড়িতে মন দিয়ে পড়ছি। এমন সময়ে আমি পরিবারে গভীর সংকটের সৃষ্টি করলাম। বাবা গেছেন গোয়ালিয়রে স্পিকারস্ কনফারেন্সে। আসন্ন

পরীক্ষার কারণে আমি যাইনি। আমি ঘোষণা করলাম, আমার প্রিপারেশন তেমন হয়নি, এ বছর আর পরীক্ষা দেব না। খবর পেয়ে সেজকাকা অর্থাৎ ডাক্তার কাকা হাজির। তিনি বললেন হালকা চালে— পরীক্ষাটা দিয়ে দে, কী আর হবে ফেল করবি। তোর পাশ করার কী দরকার? আমরা তো বিয়ে দেব।

আমার কাঁদো কাঁদো জবাব, ফেল করলে কেউ বিয়েও করবে না।

কাকা বললেন, আলবাত করবে। আমরা ফেল করা ছেলে ধরে আনব।

একটা মিকশ্চার টনিক লিখে দিয়ে আর রোজ মুরগির সুপ পথ্য বলে ডাক্তার কাকা ভ্যানিশ। আমি বইপত্র গুছিয়ে তুলে ফেললাম।

আমার পরীক্ষা না দেবার সিদ্ধান্তে আমি অটল। কাজল অন্য সহপাঠীরা অনেক বোঝাবার চেষ্টা করলে। পি. লাল থাকে সাদার্ন অ্যাভিনিউ-এর এক ফ্ল্যাটে। তার বাড়ির ছাদে বন্ধুরা মিলে খাওয়াদাওয়া চলছে। একপাশে আমাকে ডেকে নিয়ে লাল বললে, দেখো তুমি যদি খুব চেষ্টা করো তাও তুমি পরীক্ষাতে ফেল করতে পারো না, কেন অবুঝের মতো কাজ করছ।

পড়াশুনোর চিন্তা নেই বাবার সঙ্গে বালিগঞ্জ লেকে প্রাতঃভ্রমণ। বাবা খুব বিরক্ত কিন্তু নিরুপায়। এক সকালে উলটোদিক থেকে মর্নিংওয়াক করে আসছেন অধ্যাপক সুবোধ সেনগুপ্ত। আমাকে দেখে ভুরু কুঁচকে তাকালেন।

এখানে কী করছ? সকালে উঠে পড়াশুনো নেই? আমার কোনও কথায় কর্ণপাত না করে হুকুম দিলেন, বাড়ি গিয়ে এখুনি পড়তে বসো! ফলে আর লেক- মুখো হই না। ব্রিটিশ কাউন্সিলের ঠিক উলটো দিকে থিয়েটার রোডে আমার মামার বাড়ি। দিদিমা আছেন। একদিন ওঁকে দেখতে গেলাম। সেদিন বাড়িতে কেউ নেই, রোগশয্যায় দিদিমা। দিদিমা আমার হাত ধরে বললেন, হ্যাঁরে তোর কী হয়েছে? পড়াশুনো ছেড়ে দিলি কেন?

বাড়ি ফেরার পথে দিদিমার কণ্ঠস্বর মনের মধ্যে শুনছি— তুই তো পড়াশুনোয় চিরদিন ভাল, তোর কী হয়েছে? তাই তো নিজেকেই জিজ্ঞাসা করি আমার কী হয়েছে? বাড়ি ফিরে নিঃশব্দে বইপত্র নামিয়ে ধুলো ঝেড়ে পড়তে বসলাম। বাড়িতে বাবা-মা সকলে উঁকি মেরে দেখেও দেখেননি

ভান করতে লাগলেন। কী জানি যদি মুড হঠাৎ বদলে যায়।

এম.এ পরীক্ষা শুরুর আট দিন বাকি। আমাদের আটটি পেপারে পরীক্ষা। অতএব অষ্টম পেপার থেকে পড়া শুরু করি। পরদিন সেভেন্থ এইভাবে ফার্স্ট পেপারে পৌঁছলাম পরীক্ষার শুরুর আগের দিন। এইভাবে কেউ নিজের লেখাপড়া নিয়ে খেলা করে? হলে বসে দেখলাম, দিব্যি লিখতে পারছি, কিছুই ভুলিনি। তবুও ক্ষতি যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। সে বছর কাজল প্রথম হল, অরুণ দ্বিতীয়। আমি তৃতীয়। আমার সঙ্গে ব্র্যাকেটে এক অচেনা ছাত্র।

কাজল স্টেট স্কলারশিপ নিয়ে অক্সফোর্ড গেল। অরুণ গেল তার পরের বছর। আমি অধ্যাপনার চাকুরির সন্ধানে বের হলাম। হাতে তারকনাথ সেনের দেওয়া একটি পরিচয়পত্র।

তারকবাবু সুন্দর পরিচয়পত্র লিখে দিয়েছেন। একথাও উল্লেখ করেছেন আমার পারিবারিক পটভূমি সংস্কৃতিমনস্ক ও বিদ্যোৎসাহী। হিন্দুস্থান রোডে ছোটখাটো একটি মেয়েদের কলেজ, নাম মুরলীধর কলেজ। কলেজ পরিচালক নলিনীমোহন শাস্ত্রী। দেখা করতে এক মাস পড়াবার সুযোগ দিলেন। অধ্যাপনায় হাতেখড়ি, দেখলাম আমি পড়াতে পারব। আত্মবিশ্বাস বাড়ল।

আমি যখন অধ্যাপনা করব বলে কাজ খুঁজছি বাবা আর মা দু'জনে দু'রকম মত দিলেন। মা-র হাতে যদি ক্ষমতা থাকত তবে সেকালে যেমন হত আমার ম্যাট্রিক পাশ করার পরেই হয়তো বিয়ে হয়ে যেত। বাবার ধনুর্ভঙ্গ পণ আগে পড়াশুনো শেষ করতে হবে। এদিকে এম এ পাশ করে আমি যখন কাজের সন্ধানে বাবা বললেন, চাকুরি করার কী দরকার, লেখালেখি, কলা-সমালোচনা ঠিক আছে। এদিকে মা তখন বললেন, এত কষ্ট করে পড়াশুনো শিখেছে, কাজ করতে চায় সে তো ভাল কথা।

খবর পেলাম লেডি ব্রেবোর্ন কলেজের প্রিন্সিপাল রমা চৌধুরী আমাকে খুঁজছেন। তিনি এতদিন বাদে জানতে পেরেছেন 'রোল নম্বর ১৩' ছদ্মনামে কলেজ এডুকেশনের উপর স্টেটসম্যান-এ প্রকাশিত লেখাটি আমার কীর্তি! তাই আমার সঙ্গে আলাপ করার কৌতূহল। আমার রমাদিকে খুব ভাল লাগল। বেশ খানিক নানা বিষয়ে কথার পর উঠে পড়েছি উনি

বললেন, পড়াবার ইচ্ছে আছে? আমি বললাম, আছে। উনি বললেন, সামনেই লিভ ভ্যাকেন্সি হচ্ছে দু' মাসের। বাড়ি ফিরে আসার পরদিন অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পেলাম।

সেকালে ফার্স্ট ইয়ার থেকে ফোর্থ ইয়ার চারটে ক্লাস ছিল। ফোর্থ ইয়ারে যারা পড়ে তারা প্রায় আমার সমবয়সি, অনেকে বন্ধুও। খুব গম্ভীর মুখ করে রেজিস্ট্রি খাতা হাতে ফোর্থ ইয়ারের ক্লাসে ঢুকি। রমাদি মাঝে মাঝে বারান্দায় পায়চারি করেন, চারিদিকে নজর। বলেছিলেন, তুমি ভাল পড়াচ্ছ, ছাত্রীরা মন দিয়ে শুনছে। বলেছিলেন, পড়ানো একটা আলাদা আর্ট, সবাই পারে না।

কলেজের বার্ষিক অনুষ্ঠানের রিহার্সল চলছে, রবীন্দ্রনাথের শ্যামা। আমি সেতার হাতে কলেজে আসি। পড়ানো ছাড়াও নৃত্যনাট্যে গানের সঙ্গে সেতার বাজাই। প্রতি বুধবার বিকেল চারটে কোনও একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছাত্রীদের কাছে বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা করতে আসেন। সেই সেমিনারে বক্তাকে পরিচয় করে দেওয়া, বিষয় সম্পর্কে দু'-চার কথা বলা ও ধন্যবাদ দেবার ভার আমার উপর ন্যস্ত। বিশিষ্ট চিকিৎসক টি বি রোগ নিয়ে বলবেন, খ্যাতনামা সংগীতজ্ঞ বাউল সংগীতের উপর বক্তৃতা দেবেন। ফলে আমার বিভিন্ন অজানা বিষয়ে উঠে দাঁড়িয়ে মন থেকে বক্তৃতা দেওয়া অভ্যাস হয়ে গেল। ভবিষ্যৎ জীবনে এই অভিজ্ঞতা কাজে দিয়েছিল।

দু' মাস দেখতে দেখতে চলে গেল। কিন্তু ছাত্রী ও অধ্যাপিকা মহলে সকলের প্রিয় হয়েছিলাম। বেশ কিছুদিন পরে রমাদি স্থায়ী কাজে যোগ দিতে ডেকেছিলেন, তখন আমি অন্যত্র কাজ করছি। ওঁর অনুরোধে না বললাম।

নয়

জীবনে নবদিগন্ত

সাল ১৯৫৫ আমার জীবনে একটা ল্যান্ডমার্ক। এরপর জীবনের গতি অন্যদিকে ঘুরে গেল আর শুরু হল এক নতুন অধ্যায়। বছরের মাঝামাঝি সময়ে জীবনে দুটি ঘটনা প্রায় একই সময়ে ঘটল। একদিকে খুঁজে পেলাম জীবিকা, অপরদিকে দেখা পেলাম জীবন সঙ্গীর।

জীবিকার কথাই বলি। আমি মনে মনে স্থির করেছিলাম নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে, কাজ খুঁজছিলাম। অথচ আমাকে যে কাজ করতেই হবে তেমন কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। আমি যে সামাজিক পরিস্থিতিতে আছি সেখানে মেয়েরা তখনও বাইরে কাজ করতে বেরোন না। আজকের দিনে মেয়েরা কতরকম কাজে রয়েছেন, মহাকাশচারীও হয়েছেন। আমি অধ্যাপনার কাজ করব স্বজন-বান্ধবেরা সেটাই বেশ বৈপ্লবিক মনে করলেন।

তখনকার দিনে নামকরা কলেজ ছিল সিটি কলেজ। আমহার্স্ট স্ট্রিট, কলেজ স্ট্রিট ক্যাম্পাস সব মিলিয়ে বেশ কয়েকটি কলেজের গুচ্ছ নিয়ে এক সাম্রাজ্য। তারা দক্ষিণ কলকাতায় একটি নতুন শাখা খুলল। জীবনে প্রথম চাকুরির জন্য ইন্টারভিউ দিলাম। আমহার্স্ট স্ট্রিটের কলেজেই ডাক পড়ল। বিশাল অশ্বক্ষুরাকৃতি টেবিল ঘিরে বসে ছিলেন বাঘা বাঘা অধ্যাপকরা। অনেকক্ষণ ধরে প্রশ্নোত্তর চলল। এক প্রবীণ আলাদাভাবে আর্ম চেয়ারে অর্ধশয়ান ছিলেন। তিনি খুঁটিয়ে অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করলেন, ক্রিস্টোফার মার্লোর নাটকের উপর বেশ একটা আলোচনা হয়ে গেল। পরে জেনেছিলাম তিনি অধ্যাপক অমিয় সেন। একজন কিছুই জিজ্ঞাসা করলেন না। তিনি অধ্যাপক পি সি ঘোষ। ইউনিভার্সিটিতে আমাদের পড়াতেন। ওঁর একটা

মুদ্রাদোষ ছিল চোখ আধবোজা রেখে পড়াতেন। 'কিছু জিজ্ঞাসা করবেন নাকি?' বলাতে উনি চোখ আধবোজা রেখে বললেন, না, ছাত্রী ছিল, ভালই জানি। প্রশ্নের বহর দেখে মনে হয়েছিল কাজটা বোধহয় হবে না। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার এসে গেল। জুলাই মাসে নতুন কলেজে কাজে যোগ দিলাম।

সেই যে অধ্যাপনার জীবনে প্রবেশ করলাম, চলেছিল চার দশক। ধীরে ধীরে আরও দায়িত্বভার। বিভাগীয় প্রধান ছিলাম। শেষের দিকের দীর্ঘ সময় অধ্যক্ষের কাজও করলাম। আমি এই পদ গ্রহণে অনিচ্ছুক ছিলাম। এক গ্রীষ্মের ছুটি আমেরিকাতে কাটিয়ে ফিরে এসে দেখলাম তদানীন্তন অধ্যক্ষ রিটায়ার করেছেন এবং গভর্নিং বডি আমাকে নিযুক্ত করেছেন। সব কলেজ মিলিয়ে যিনি সর্বোচ্চ পদাধিকারী সেই রেক্টর অধ্যাপক অরুণ সেনের কাছে দেখা করে অব্যাহতি চাইলাম। বলেছিলাম, আমার পড়াশুনো ও লেখালেখির কাজের ক্ষতি হয়ে যাবে। তা ছাড়া শিক্ষকসমাজ ও ছাত্রসমাজে রাজনীতির অনুপ্রবেশ ঘটেছে, আমি এর মধ্যে জড়াতে চাই না। উনি অনেক বোঝালেন। বললেন, কাজ করেই দেখো না, আমরা তো রয়েছি।

অধ্যাপনা জীবনে অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হল। অধ্যক্ষের কাজে যোগ দিয়ে শিক্ষাজগতে রাজনীতির প্রবল অনুপ্রবেশ ভালভাবে প্রত্যক্ষ করলাম। তখন আশির দশক, শিক্ষাজগতে যা 'অনিলায়ন' নামে পরিচিত তা ঘটে গিয়েছে। শাসকদল শিক্ষাজগৎকে কুক্ষিগত করার কাজ প্রায় সম্পূর্ণ করে এনেছেন। তাঁদের দলীয় নীতি অনুসারে তাঁরা কাজ করছিলেন। মুশকিল হল গণতন্ত্রে কখনও ক্ষমতাসীন, কখনও ক্ষমতাচ্যুত হতে হয়। যাঁরাই যখন ক্ষমতায় থাকেন তাঁরা নিজেদের রঙে শিক্ষানীতি রাঙিয়ে নেবার চেষ্টা করেন। এতে আখেরে দলের লাভ হয় না, দেশের ক্ষতি হয়।

আমি যে সময়ে পার্লামেন্টে ছিলাম তখন ভারতীয় জনতা পার্টির দিক থেকে শিক্ষার 'গেরুয়াকরণ' অর্থাৎ Saffronization-এর প্রচেষ্টা হয়েছিল। পার্লামেন্টে এক গুরুত্বপূর্ণ বিতর্কে অংশ নিয়ে আমি গেরুয়াকরণের বিরুদ্ধে বলেছিলাম। সেই সঙ্গে একথাও বলেছিলাম আমার রাজ্যে, পশ্চিমবাংলায় শিক্ষা রক্তিমবর্ণ হয়েছে। আমাদের দেখা উচিত শিক্ষা যেন

সব রঙের ঊর্ধ্বে শুভ্রবর্ণ থাকে। শিক্ষাজগৎকে দলীয় রাজনীতির বাইরে রাখা উচিত।

বাস্তব অন্যরকম। অধ্যক্ষর জীবনে মাঝেমধ্যে ঘেরাও হব, অন্যায্য দাবি নিয়ে ছাত্ররা আন্দোলন করবে এসব ছিল স্বাভাবিক। লক্ষ করতাম সাধারণভাবে বামপন্থী ছাত্ররা বেশি বুদ্ধিমান, দাবি আদায় করার কায়দা জানে। সেকালে বিরোধী বলতে তখনকার কংগ্রেসি ছাত্ররা তুলনায় তত চতুর নয়, অহেতুক চেঁচামেচি করে নিজেদের কাজ পণ্ড করে। একবার বামপন্থী ছাত্ররা আমার টেবিল ঘিরে দাঁড়িয়ে কী যেন দাবি করছিল। একটি ছেলে তার গাল আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল— ম্যাডাম প্লিজ আমাদের দাবি মেনে নিন তারপর আমার গালে একটা চড় মারুন। আমি বলেছিলাম— Do not tempt me. বলা যায় না দাবি মানি আর না-ই মানি অন্য অনুরোধটা মেনে নিতেও পারি।

একটা ক্ল্যাসিক ঘটনা মনে পড়ছে। একদিন ছুটিতে ছিলাম, কলেজ থেকে জরুরি ফোন—শিগগির আসুন কংগ্রেস নেতা সুব্রত মুখার্জি ও যুবনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কলেজে ঢুকে বাগানে মাইক লাগিয়ে বক্তৃতা করছেন। ট্যাক্সি নিয়ে ছুটলাম। আমার বামপন্থী ছাত্র ইউনিয়ন। আমার সঙ্গে তাঁদের মুখোমুখি হল। আমি শান্তভাবে বললাম—ক্লাস চলছে, আমাদের পড়ানোর ব্যাঘাত হচ্ছে। এই মুহূর্তে আপনারা চলে যান। তাঁরা স্থানত্যাগ করলেন। সুব্রত মুখার্জি সোজা বিধানসভায় গিয়ে আমার স্বামী শিশিরকুমার বসু তখন বিধায়ক, তাঁকে হাসতে হাসতে খবর দিলেন— বউদির কলেজে গিয়েছিলাম গেট আউট বলে দিলেন।

শিক্ষকরাও দল-উপদলে বিভক্ত ছিলেন। দু'-চার জন অধ্যাপক ফিসফিস করে প্রচার করার চেষ্টা করলেন যে আমি আগেই সব জানতাম, ইচ্ছা করেই কলেজে আসিনি। এই অপবাদে মনে আঘাত পেতে পারতাম। কিন্তু আমার ছাত্রীরা আমার বামপন্থী ইউনিয়ন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানাল ম্যাডামের প্রতি তাদের পূর্ণ আস্থা আছে। অবশ্য সেই ১৯৫৫ সালে যখন অধ্যাপনার জীবন শুরু করলাম তখন পরিবেশ ছিল শান্ত। পিছন ফিরে আজ মনে হয় সব চাইতে বড় প্রাপ্তি অসংখ্য ছাত্রীর ভালবাসা। আজও পথেঘাটে বা নানা বিচিত্র জায়গায় হয়তো আকাশপথে এরোপ্লেনে কেউ

ঢিপ করে প্রণাম করে বলে—সেই যে আপনি ওয়ার্ডসওয়ার্থ পড়িয়েছিলেন অথবা সেই যে ম্যাকবেথ—তখন মনে এক ধরনের পরিতৃপ্তি আসে।

একবার মজার অভিজ্ঞতা হল। প্রেসিডেন্ট ওবামা সদ্য জিতেছেন— প্রথম অ্যাফ্রো-আমেরিকান প্রেসিডেন্ট। কোনও এক সভাতে এক ভদ্রমহিলা আমাকে দেখে দৌড়ে এসে বললেন, স্ক্রিনে দেখছি ওবামা জিতছেন, চোখে ভাসছে আপনি ক্লাসে দাঁড়িয়ে পড়াচ্ছেন। হতচকিত হয়ে জিজ্ঞাসা করি, ওবামার জয়ের সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক! মহিলা বললেন, আমি আপনার ছাত্রী। আপনি অ্যাব্রাহাম লিংকন নামে একটি নাটক আমাদের পড়িয়েছিলেন। সেই প্রথম লিংকনের কথা, আমেরিকার জাতিবৈষম্য, গৃহযুদ্ধ এসব আপনি বুঝিয়েছিলেন।

সেই প্রথম দিনগুলিতে আমার সঙ্গে যাঁরা অধ্যাপনার কাজে যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন সংস্কৃতে রেবা রুদ্র, ইতিহাসে জয়তী সেনগুপ্ত, ফিলজফিতে নীতি ব্যানার্জি। নীতির স্বামী আন্দামান-ফেরত বিপ্লবী, পরে সি পি আই সদস্য। আর একটু পরে এলেন ইলা মিত্র। ইলাদির সঙ্গে আমার বেশ সখ্য ছিল। অবশ্য তিনি ছিলেন অবিভক্ত সি পি আইর সদস্য। তাঁর রাজনীতিক জীবনে অনেক অত্যাচার সহ্য করেছেন বলে আমরা ওঁকে শ্রদ্ধা করতাম। বাংলা বিভাগে দিব্যনারায়ণ ভট্টাচার্য ছিলেন নাট্য ব্যক্তিত্ব। ওই বিভাগেই ভাস্কর মিত্র ছিলেন গানের জগতের, অল্পবয়সে সে আমাদের ছেড়ে চলে যায়। আমরা যখন মেয়েদের কমার্স পড়াতে শুরু করলাম অনেক ভাল অধ্যাপক পেলাম আর ছাত্রীরা তো উজ্জ্বল, অনেক ফার্স্ট ক্লাস পেত। পরে ভাল ভাল চাকুরিতে উঁচু পদে কাজ করত। সব কিছু মিলিয়ে আমার অধ্যাপনার জীবন বেশ পরিপূর্ণ, অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ।

জুলাই মাসে কলেজে যোগ দিলাম আর আগস্ট মাসে শিশিরকুমার বসুর সঙ্গে আমার বিবাহ স্থির হয়ে গেল। অবশ্য বিয়ের অনুষ্ঠান হল আরও কিছুদিন পর ডিসেম্বর মাসে। এই মধ্যবর্তী সময়ে আমাদের প্রায়ই দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে। কখনও পারিবারিক নৈশ ভোজ, কখনও বিখ্যাত ফটোগ্রাফার সুনীল জানা ও শোভাদির রাসবিহারী অ্যাভিনিউর বাড়ি, কখনও আমার ডাক্তার কাকা ড. ক্ষীরোদচন্দ্র চৌধুরীর বাড়ি। একবার

ডাক্তার কাকা কলকাতার বাইরে গেলে তাঁর স্ত্রী আন্ট অমলাকে বলে যান ওঁর অনুপস্থিতির সময়ে যেন আমাদের ডাকা হয়। আমরা হয়তো কথাবার্তা বলতে স্বচ্ছন্দ বোধ করব। কোনও এক রাত্রে ওঁদের ক্রিক রো-র বাড়িতে ডিনারের পর দক্ষিণের বারান্দায় বসে গভীর রাত্রি অবধি অনেক কথা হয়।

শিশিরকুমার ছিলেন স্বল্পভাষী, গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। আমাকে অবাক করে দিয়ে উনি সেদিন ধীরে ধীরে নিজের বিপ্লবী জীবনের অনেক কথা বলতে লাগলেন। ওঁর জীবনে রাঙাকাকাবাবু সুভাষচন্দ্রের প্রভাব ছিল গভীর, কত গভীর পরিমাপ করা কঠিন। সেই রাত্রে মহানিষ্ক্রমণে সুভাষচন্দ্রের সারথি হওয়ার ভূমিকার কথা, পরে যুদ্ধের মধ্যে খবর আদান-প্রদান, নেতাজির প্রেরিত দূতদের সঙ্গে আন্ডারগ্রাউন্ড যোগাযোগ, নিজের গ্রেপ্তার হওয়া, দিল্লির লালকেল্লার ভূগর্ভের সেল-এ, পাঞ্জাবের লাহোর ফোর্টে একক বন্দি জীবন সলিটারি কনফাইনমেন্ট—এইসব কাহিনি শুনতে শুনতে ওঁর জীবনের একটি অন্যদিক আমার কাছে উদ্ঘাটিত হল। এক সদ্য বিলাতফেরত তরুণ ডাক্তার তাঁর পেশায় প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য সংগ্রাম করছেন এইরকম একটি ছবিই আমার মনের মধ্যে ছিল।

প্রকৃতপক্ষে শিশিরকুমারের নিজের কাছে তাঁর স্বাধীনতা সংগ্রামী জীবনের দিকটি ছিল নিতান্ত জরুরি। আর রাঙাকাকাবাবু নেতাজি সুভাষচন্দ্রের প্রতি আনুগত্য ছিল অবিচল। পরবর্তীকালে লঘু হাস্য-পরিহাস, আলাপচারিতায় আমি অনিতাকে বলেছিলাম যে সুভাষচন্দ্র অন্তত তোমার মাকে, এমিলিয়েকে আগেই বলে নিয়েছিলেন—আমার প্রথম প্রেম ও একমাত্র প্রেম আমার দেশ, তোমাকে দেবার মতো আমার আর কিছুই নেই, এ কথা জেনেও যদি তুমি আমাকে গ্রহণ করো ইত্যাদি। তোমার লালদাদা (শিশির) কিন্তু আমাকে সে ভাবে তেমন কিছু বলেননি। আমি বিবাহের পর উপলব্ধি করলাম ওঁর প্রথম প্রেম ও একমাত্র প্রেম ওঁর রাঙাকাকাবাবুর স্মৃতি, আর সেই স্মৃতি রক্ষায় ওঁর মনপ্রাণ নিবেদিত। আমাকে এর সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে।

অতএব আমার সংসার ও জীবিকার সঙ্গে আমি এই কাজেও ব্রতী হলাম। আমার যারা সমসাময়িক আমাদের সকলের মনেই রয়েছে নেতাজি

সুভাষচন্দ্রের প্রতি এক আবেগমিশ্রিত শ্রদ্ধা ও ভালবাসা। শিশিরকুমারের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে আমি সুভাষচন্দ্রকে পূর্ণরূপে আবিষ্কার করলাম। দেশপ্রেমিক হিসেবে রোমান্টিক ইমেজের ঊর্ধ্বে তিনি এক চিন্তাশীল রাষ্ট্রনায়ক। কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে দেওয়া তাঁর হরিপুরা অভিভাষণ পড়ছি শিশিরের সঙ্গে—আসলে প্রুফ দেখা হচ্ছে, কপি ধরে আছি। পরাধীন দেশের সমস্যার কথা কী প্রাঞ্জল ভাবে তুলে ধরেছেন। দেশ স্বাধীন হওয়া মাত্র সেইসব সমস্যার সমাধানে হাত লাগাতে হবে। তার জন্য পরিকল্পনা প্রস্তুত। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস দেশ শীঘ্রই স্বাধীন হবে, আর দেরি নেই।

দেশের বাইরে গিয়ে তিনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এক বিকল্প নেতৃত্ব দিলেন। সেই বীরত্বের আত্মত্যাগের কথা সঠিক ভাবে সংরক্ষণ করতে হবে আগামী প্রজন্মের জন্য— এই ছিল শিশিরের একান্ত প্রচেষ্টা। কাজটা খুব কঠিন ছিল। সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে নেতাজির কীর্তি। ধীরে ধীরে এক গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রহশালা গড়ে তুলতে পেরেছিলেন উনি। এই কাজে ওঁর সঙ্গী হতে পেরে স্বাধীনতা সংগ্রামের এক বিশেষ দিক সম্পর্কে অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয়েছিল আমার। ওঁর সঙ্গে ইউরোপের দেশে দেশে ঘুরে আসার পর আমি লিখেছিলাম 'ইতিহাসের সন্ধানে'—নেতাজির ত্রিশের দশকে ইউরোপে নির্বাসন ও চল্লিশের দশকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে কীর্তি গাথা। দেশ পত্রিকার সম্পাদক সাগরময় ঘোষের তাগিদে লেখাটি লিখেছিলাম। পাঠক সাদরে গ্রহণ করেছিলেন। একই ভাবে দক্ষিণ এশিয়ার দেশে দেশে জাপান, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড এমনকী তাইপে গিয়েছি একই ইতিহাসের সন্ধানে। 'চরণরেখা তব' নামে লিপিবদ্ধ সেই কাহিনি।

১৯৫৫ সালের অক্টোবরে স্পিকারদের কনফারেন্স হল অসমের (তখনও মেঘালয় হয়নি) শৈলশহর শিলঙে। বাবা-মার সঙ্গে আমিও গেলাম। সেই কনফারেন্স-এ আমাদের বিবাহের খবর একটা সর্বভারতীয় পরিচিতি পেয়ে গেল। কলকাতায় ফিরে আসার পরই শুরু হয়ে গেল আসন্ন বিবাহের প্রস্তুতি। সেকালে যেমন হত আত্মীয়স্বজনে বাড়ি ভরে উঠল। বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে ত্রিপুরা ভবনে দুটি বাড়ি ছিল। দ্বিতীয়

বাড়িটি বিবাহের জন্য ভাড়া দেওয়া হত। সেই বাড়িতে প্রাঙ্গণে শামিয়ানা, ভিতরে অন্য ব্যবস্থা। বিবাহের চিঠি শিল্পসম্মত হওয়া চাই। অবনীন্দ্রনাথের আলপনার বই থেকে লক্ষ্মীর পা ও পদ্ম ছাপা হল। ধ্রুব ছবি তোলে। সে তখনকার ছোট ক্যামেরাতে মুভি তুলবে। আমার সহপাঠিনী রানি তার সুন্দর দুই হাতে খাম খুলে আলপনা যুক্ত বিবাহের চিঠি খুলছে, সেটা প্রথম দৃশ্য। আমার সহপাঠী বন্ধুরা ধৃতি, বেণু খুব উত্তেজিত। তারা কনেকে পিঁড়িতে বসিয়ে সাত পাক ঘোরাবে। তাই একটা ক্যারিয়িং কমিটি গঠন করেছে, আমার ওজন কত, কে কোনদিকে ধরবে গবেষণা চলেছে। ধৃতি একদিন বললে, 'তোমার বর যদি শিশুচিকিৎসক না হয়ে চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ হত তা হলে কত ভাল হত।' তার মানে?

মানে খুব সহজ। রুগি কোনওদিন হাতছাড়া হত না, চর্মরোগ কখনও সারে না। আর কারও বাচ্চা কাঁদলে শিশুর ডাক্তারকে মাঝরাতে রুগি দেখতে ছুটতে হবে, সে হাঙ্গামাও থাকত না। ধৃতির কথাবার্তায় বরাবরই কৌতুক থাকে। নিমন্ত্রিতদের তালিকা বেশ কৌতূহলজনক। বাবা বিধানসভার সচিব, সেই সূত্রে বিভিন্ন রাজনীতিক, প্রশাসক, অন্যদিকে বাবার বন্ধুর তালিকায় সাহিত্যিক, শিল্পী। বাবার প্রিয় বন্ধু ফণীভূষণ চক্রবর্তী তখন কলকাতা হাইকোর্টে চিফ জাস্টিস। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় দিলেন মহাভারত। নরেন্দ্র দেব রাধারানী দেবী তাঁদের নিজেদের লেখা বই। শিল্পী গোপাল ঘোষ বসে গেছেন বর ও কনের পিঁড়ির ওপর আলপনার ঢঙে ছবি আঁকতে। অতুল বসু নিয়ে এসেছেন যামিনী রায়ের আঁকা ছবি। লেডি রাণু মুখার্জি অনেক আগে এসে গেছেন। আমার সাজঘরে বসে দেখছেন মনুয়াদি আমাকে কনে সাজাচ্ছে।

বর বলে পাঠিয়েছেন, বরের গাড়িতে যেন ফুলের সাজ না থাকে। অতএব মেজমামা সুরেন্দ্রকুমার রায়ের বিশাল শেভ্রলে গাড়ি নিরাভরণ পাঠানো হল। বর বলেছেন সিংহাসনে বসবেন না। মাটিতে সাদাসিধে শতরঞ্চি বিছানো হল। সানাইওয়ালাদের বলা আছে বর এলেই যেন সানাই বেজে ওঠে। ওদিকে গেটের পাশে পজিশন নিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে পুলিশ ব্যান্ড। বর এসে নামলেই তারা স্বদেশি গানের সুর বাজাবে। আমার কলেজের সহ-অধ্যাপিকারা কনেকে অর্থাৎ আমাকে ঘিরে বসে আছেন।

সেজকাকা ড. চৌধুরীর ওপর অতিথি ও বরযাত্রী আপ্যায়নের ভার। অনিলকাকা, ব্যারিস্টার অনিল গাঙ্গুলীও আছেন অতিথি অভ্যর্থনায়। নতুন কাকা হিরণ্ময়ের উপর রান্না দেখাশোনার ভার। ঠাকুর রান্না করছে। অন্যদিকে ভিয়েন বসেছে, মিষ্টি বাড়িতে তৈরি করাই রীতি। ছোটকাকা বিনোদচন্দ্র খুব শাস্ত্র মেনে চলেন। সকাল থেকে উপবাস করে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করেছেন। এখন সম্প্রদান করার জন্য তৈরি। ন'কাকা মন্মথচন্দ্র বলছেন ছোটভাই সম্পর্কে—বিনুর তো চট করে রেগে ওঠা স্বভাব। উপোস করে পুজোআচ্চা নিয়ে থাকাই ভাল। লেট্ আস্ স্টার্ভ দ্য লায়ন।

বর এসেছে, বর এসেছে বলে ধ্বনি উঠল। আমাকে অর্থাৎ সুসজ্জিতা কনেকে ফেলে সবাই বর দেখতে দৌড়। শূন্যঘরে এলেন অনিলকাকা, গান গেয়ে উঠলেন 'যেন মুখ দেখে মা তোর ছেলে বলে সকলে চেনে, সাজায়ে দে মা তোর সন্তানে।' উনি বর দেখে এসেছেন। ওদিকে সানাই বাজছে, অন্যদিকে পুলিশ ব্যান্ডে 'ধনধান্য পুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা—'

অত্যন্ত সুন্দর মন্ত্রোচ্চারণে বিবাহের মন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছে। আমি সংস্কৃত ভাল জানি, মুগ্ধ হয়ে শুনছি। বরপক্ষের সঙ্গে এসেছেন ওঁদের কুলপুরোহিত আচার্য গৌরীনাথ শাস্ত্রী। উপস্থিত দর্শকদের কখনও বাংলায় কখনও বা ইরেজিতে বুঝিয়ে দিচ্ছেন মন্ত্রের অর্থ। তিনি বর ও কন্যা দু'পক্ষের হয়েই মন্ত্র উচ্চারণ করছেন; যদিও কন্যাপক্ষেও আনন্দবাজারের পণ্ডিতমশাই উপস্থিত আছেন। গৌরীনাথ দু'পক্ষেরই পৌরোহিত্য করে চলেছেন। ধ্রুবতারার মতো পতিগৃহে বিরাজ করো আশীর্বচন উচ্চারিত হচ্ছে। সানাই-এ সন্ধ্যার রাগ বাজছে, ব্যান্ডে স্বদেশি সংগীতের মূর্ছনা, গৌরীনাথ শাস্ত্রীর উদাত্ত কণ্ঠে বিবাহের পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণের মধ্যে আমার জীবনে এক নতুন পর্বের সূত্রপাত হল ৯ ডিসেম্বর, ১৯৫৫ সালে। পারিবারিক দিক থেকে তারিখটি তাৎপর্যপূর্ণ, ওই একই তারিখে শিশিরের পিতৃদেব শরৎচন্দ্র বসু ও বিভাবতী দেবীর বিবাহ সম্পন্ন হয়েছিল।

একজন ব্যক্তির জীবনকথা বা কোনও একটি পরিবারের সাধারণ সুখদুঃখের কাহিনির মধ্যে লুকিয়ে থাকে তার দেশ-কাল বা সামাজিক পারিপার্শ্বিকের কথা। লিখতে গিয়ে দেখছি কলকাতা শহর একটি মূল

স্রোতের মতো বয়ে যাচ্ছে আমার শৈশব, কৈশোর আর তারুণ্যের দিনগুলির মধ্যে। ইংরেজ আমলের চৌরঙ্গি, ডোভার লেনের নতুন বসতি গড়ে উঠছে, তার প্রান্তে শেয়ালের ডাক, সুবিস্তৃত রাসবিহারী অ্যাভিনিউর দু'দিকে বেগুনি রঙের জারুল, রক্তবর্ণ কৃষ্ণচূড়া। এসব ছবি হারিয়ে গিয়েছে অনেক দিন আগে। আজকাল কেউ বিছানাপত্র, বাসন ইত্যাদি নিয়ে মাসাধিক কালের জন্য ছুটি কাটাতে পুরীর সমুদ্রতীর, দার্জিলিঙের পাহাড় বা সাঁওতাল পরগনার ছিমছাম ছোট শহরগুলিতে যাত্রা করে না। জীবন গতিময়, বেগে বয়ে চলেছে। পুরনো সেই দিনও কিন্তু মন্দ ছিল না।

নির্দেশিকা

অখিলানন্দ ১৪০
অজাতশত্রু ৩১
(ডা.) অজিতা চক্রবর্তী ৮৩
অতুল বসু ৫৭, ১১৭, ১৫২
(স্বামী) অতুলানন্দ ৩৭
অনিতা ১৫০
অনিল গাঙ্গুলী ১৫৩
(স্বামী) অনুভবানন্দ ৩৭, ৩৮
অবনী সি ব্যানার্জি ১৩৯
অবনীন্দ্রনাথ [ঠাকুর] ৩৭, ১৫২
অমর্ত্য [সেন] ১৩২
অমলা [চৌধুরী] ১৫০
অমিয় সেন ১৪৬
অমিয়নাথ [বসু] ১১৯
অমিয়া [দেবী চৌধুরানী] ২৩
'অমৃতবাজার পত্রিকা' ১৪০
অম্লান দত্ত ১১৫, ১১৬
অরিন্দম সেন ৭৭, ৭৮
অরুণ সেন ১৪৭
অরুণকুমার দাশগুপ্ত ১৩১, ১৩৪, ১৩৭, ১৪৪
অরুণা আসফ আলি ৪৮
অল ইন্ডিয়া রেডিয়ো ৫৫, ১০৭
অলকদা [ঘোষ] ২৬
অস্কার ওয়াইল্ড ১৩৩
অ্যানামামিমা ১২, ১৮, ৩৯, ৪১, ৪৪, ৫৬, ৬২, ৬৮, ৭২, ৭৬, ৮৪-৮৬
অ্যাব্রাহাম লিংকন ১৪৯

আদিনাথ সেন ৭৪, ৭৫
'আধুনিক চিত্রকলা' ১৩৯
'আনন্দবাজার পত্রিকা' ৪৭, ১০৭
আনন্দময়ী মা ১৪১
আনন্দমোহন সহায় ৮৯, ১০১
আন্ট অ্যানা দ্র. অ্যানামামিমা
আবদুল গফ্‌ফুর খান ৯৮
আবাদ খান ৪৯
আবিদ হাসান ৬৪
আবুল হাশিম ১০২
আরভিন ১২৩
'আর্মস অ্যান্ড দ্য ম্যান' ১৩৬

'ইতিহাসের সন্ধানে' ১৫১
ইন্দিরা গাঁধী ২৯
ইন্দ্রাণী সেন ৬৫
ইলা মিত্র ১৪৯

ঈশ্বরদাস জালান ১১৭

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ২৩, ২৪
উপেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ১৫, ১৯

এটলি ১০১
এডমন্ড হিলারি ৮৫
'এভরিবডি কামস টু মেবল' ১৩০
এমিলি ব্রন্টে ১০৬
এমিলিয়ে [বসু] ১৫০
এরিক স্টোকস ৮২

[বারাক] ওবামা ১৪৯
ওয়ার্ডসওয়ার্থ ৬৮
(লর্ড) ওয়েভেল ৯৫

করণ সিং ১২৬
'কলেজ এডুকেশন' ১১৪
কাজল সেনগুপ্ত (বসু) ১৩০, ১৩৬, ১৩৮, ১৪৪
কাননদেবী দ্র. কাননবালা
কাননবালা ২৭, ২৮, ৬৬, ৬৭
(লর্ড) কার্জন ৬১
কার্ল মার্কস ৯০
কালিদাস নাগ ৬১
কালীকুমার [রায়] ১৮, ৪০
'কিং লিয়র' ১৩৩
কিরণ রায় ১২, ১৭, ৩৮, ৬২, ৬৮, ৭৬, ৭৮, ৮৫, ৮৬
কিরণশংকর রায় ৯২
কীর্তিনারায়ণ [চৌধুরী] ২৯, ৩৪, ৩৫, ১০৮, ১০৯
কুন্তলামামিমা ৬৬, ৬৭
কুমকুম ৬৩
কেশব মেনন ১০০
ক্রিস্টোফার মার্লো ১৪৬
ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ১১৬

(ডা.) ক্ষীরোদচন্দ্র চৌধুরী ১৫, ২২, ২৮, ৩৫, ৫০, ৬৯, ৭৭, ৯৫, ১৪৯, ১৫৩

গাঁধীজি ১৫, ৪৬-৪৮, ৫৫, ৮১, ৮৩, ৮৭, ৯০, ৯৭,, ৯৮, ১০২, ১০৩, ১০৬
গিরিজা মুখার্জি ৬৪
গিরিজাশংকর চক্রবর্তী ৬৭
গিরীন্দ্রশেখর বসু ৫৪
গুরুবক্স সিং ধীলন ৭৪, ৮১
গোপাল ঘোষ ৫৭, ১৫২
গোপীনাথ কবিরাজ ১৪১
গৌতম বুদ্ধ ৩০
(আচার্য) গৌরীনাথ শাস্ত্রী ১৫৩
'গ্রেট এসকেপ' ৫৯
গ্ল্যাডিস ১০৮

চঞ্চল সরকার ১৩৯
চন্দ্রোদয় [ঘোষ] ৬৬
'চরণরেখা তব' ১৫১
চারুচন্দ্র চৌধুরী ১৯, ২০, ৬৫, ১১৯
[উইনস্টন] চার্চিল ৩৫
(দেশবন্ধু) চিত্তরঞ্জন দাশ ১৭
চিদানন্দ দাশগুপ্ত ১৪০

ছায়াময়ী [চৌধুরী] ২০, ২১

জওহরলাল নেহরু ৮৪, ৮৬, ৮৯, ৯০, ১০৬, ১০৮
জয়তী সেনগুপ্ত ১৪৯
জয়প্রকাশ নারায়ণ ৪৮
জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ১২১
জুবেদা ১০৭
'জুলিয়াস সিজার' ৬৫
জেন অস্টেন ১০৬
জ্যোতি বসু ৯২, ১১৭-১১৯, ১৩২
জ্যোতিষ জোয়ারদার ১১৭

'ঝুলা' (ছায়াছবি) ৫৩

টি কে রাও ৫৯
'টুকটুকে রামায়ণ' ২৯
'টুনটুনির বই' ২৩

'তরুণের স্বপ্ন' ৮৭
তারকনাথ সেন ১৩১-১৩৪, ১৩৬, ১৪৪
তারাপদ চক্রবর্তী ৬৭, ১২১
তেনজিং নোরকে ৮৫
তোফাজ্জেল আলি ৯১
ত্রিদিব চৌধুরী ৪৩
ত্রৈলোক্য মহারাজ ১৭

(কর্নেল) থিমায়া ৮৮, ১০১

দাদাভাই ৮৭
'দি অটোবায়োগ্রাফি অফ অ্যান আননোন ইন্ডিয়ান' ১০৫
দিব্যনারায়ণ ভট্টাচার্য ১৪৯
দিলীপ সান্যাল ১১০, ১১১
দিলীপকুমার রায় ৮৯
(মাদাম) দে সরকার ১২৯
দেবনাথ সেন ৭৫
দেবব্রত বিশ্বাস ১৯
'দেশ' ১৩৯

ধীরেন্দ্রকিশোর [রায়চৌধুরী] ২৪
ধৃতিকান্ত লাহিড়ি চৌধুরী ১৩১, ১৩৫-১৩৮, ১৫২
ধ্রুবনারায়ণ [চৌধুরী] ২৯, ৩৪, ১০৭-১১০, ১৫২

নঈম-উর-রহমান ৮৯, ১০১
নবনীতা [দেবসেন] ৫৬
নরেন্দ্র দেব ৫৭, ১৫২
নরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ২৩
নলিনীমোহন শাস্ত্রী ১৪৪
নাম্বিয়ার ৬৪
'নার্স সিসি' (ছায়াছবি) ১০২
নিখিলানন্দ ১৪০
নিত্যস্বরূপানন্দজি ১৪০
নীতি ব্যানার্জি ১৪৯
নীরদচন্দ্র [চৌধুরী] ১৩-১৫, ২০, ২৩, ৩৪, ৩৫, ৫০, ৫৪, ৬৫, ১০৩-১০৫, ১১৯, ১৩৯
নীলিমা ৪৪, ৫০
নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার ৯২
'নূতনের সন্ধানে' ৮৭, ৯০
নৃপেন্দ্রকুমার রায় ৪০, ৮৫
নেতাজি দ্র. সুভাষচন্দ্র
নেতাজি রিসার্চ ব্যুরো ৪৮, ৬৪
নেলী সেনগুপ্তা ৯২

'পথের কুকুর' ৫৬
পদ্মালয়া [চৌধুরী] ৪৪, ৫০, ৫১, ৫৪

পরিতোষ সেন ১৩৯
পরিমল গোস্বামী ৪৪
পান্ডিয়া ৭৭-৭৯
পাশা [কবীর] ৬৯
পাহাড়ি সান্যাল ২৭
পি লাল ১৩৬, ১৪৩
পি সি ঘোষ ১৪৬
পুলিন [বিহারী] সেন ৫০
পূর্ণেন্দু ১৩৫

বক্সি গোলাম মহম্মদ ১২৬
(ডা.) বলাই মিত্র ৩৭
বল্লালবাবু ১১৯
বসন্তকুমার সরকার ৯৫
[মাদমোয়জেল] বসেনেক ১২৯
[জর্জ] বার্নার্ড শ' ১৩৬
'বিদ্যাপতি' (ছায়াছবি) ২৭
(ডা.) বিধানচন্দ্র রায় ৭৬, ১১৭, ১১৮, ১২০, ১২২, ১২৫, ১২৬
বিনয়কাকা [ঘোষ] ৬৬
বিনোদকিশোর রায়চৌধুরী ১৩১, ১৩৩, ১৫২
বিনোদচন্দ্র [চৌধুরী] ১৫, ৩৪, ৫০, ৫৪, ৫৬
[স্বামী] বিবেকানন্দ ১৪০
বিভাবতী দেবী ১৫৩
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ২১, ৩১
বিমল [রায়] ৬৩
বিমল ঘোষ ৯২
বিমল সিংহ ৯২
বিমলানন্দ তর্কতীর্থ ২৮
বিশ্বনাথন ১৩৬

'বিসর্জন' ২০
বুদ্ধদেব বসু ৫৭
বেণীমাধব বেজবরুয়া ৬৩
(লর্ড) বেন্টিঙ্ক ৬১
ব্যাস ৬৪
'ব্রজাঙ্গনাকাব্য' ১২৫
[রবার্ট] ব্রাউনিং ১৪২
'ব্রাত্যজনের রুদ্ধসংগীত' ১৯

ভগতরাম তলোয়ার ৪৯
ভরত মহারাজ ১৪০
ভাওয়াল সন্ন্যাসী ৩৩
ভারতী দেবী ১০২
ভারতী রায় ১৩২
'ভারতে বিবেকানন্দ' ১৪০
ভাস্কর মিত্র ১৪৯
ভি জি যোগ ১৪০
ভুলাভাই দেশাই ৮৪

'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' ৯০
মনুয়াদি ২৬, ২৭, ১৫২
মনোরমা বসু ৫৯, ৬০
মন্মথচন্দ্র [চৌধুরী] ১৫, ২০, ৪৪, ৫০, ৫১, ৫৪, ৬৫, ১৫৩
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ১১৯, ১৪৮
মমতা শংকর ৬৬
মহম্মদ জমান কিয়ানি ৭৪
মহাত্মা গাঁধী দ্র. গাঁধীজি
'মহাভারত' ৩০
মহিম রায় ৪১
'(মাই) এক্সপেরিমেন্ট উইথ ট্রুথ' (sic) ৮৭, ৯০

মাইকেল মধুসূদন দত্ত ১২৫
(লর্ড) মাউন্টব্যাটেন ৮৮, ১০১, ১০৩, ১০৪, ১০৮
মাতঙ্গিনী হাজরা ৪৭
মাদাম কুরি ৮৬
মাধবী [মুখার্জি] ৬৩, ৬৪
মানিকদা ২৫, ২৬
'মার্ডার ইন দ্য ক্যাথিড্রাল' ১৩০
মিঞা আকবর শাহ ৪৯
মিলটন ১৩৩
মিলান হাউনার ৪৯
মীরা দেব বর্মন ৫৭
'মুকুট' ১৯
মুনমুন সেন ৭৬
মুনশি প্রেমচাঁদ ৯৯
মেঘনাদ সাহা ৯৪
মৈত্রেয়ী দেবী ৯০
মোহনানন্দ ব্রহ্মচারী ১৪১
মোহিতলাল মজুমদার ২১
মোহিনীমোহন মুখার্জি ১২১
'মৌচাক' ৫৬
'ম্যাকবেথ' ৬৫, ১৩০
ম্যালোরি ১২৩

যাদব পাঁজা ১২২
যামিনী রায় ৫৭, ১৫২

'রবিনহুড' ২৯
'রবিনহুড' (ছায়াছবি) ২৮
রবীন্দ্রনাথ [ঠাকুর] ১৯, ২৬, ২৭, ৩১, ৩৬, ৩৭, ৫০-৫২, ৬৮, ১০৮, ১৪৫
রমা চৌধুরী ১৪৪, ১৪৫

রহমৎ খান দ্র. ভগতরাম তলোয়ার
'রাজকাহিনী' ৩৭
(লেডি) রাণু মুখার্জি ১৩০, ১৫২
রাধারানী দেবী ৫৭, ১৫২
রাভিন ৮৯, ১০১
রামবিলাস পাসোয়ান ৭৩
রামমনোহর লোহিয়া ১০০, ১০২
'রামায়ণ' ৩০
রেবা রুদ্র ১৪৯
'রোল নাম্বার ১৩' (ছদ্মনাম) ১৪৪

লক্ষ্মী স্বামীনাথন ৮৭
ললিত রায় ১৭, ৩৩, ৩৮, ৫৭, ১৪১
লায়লা ৬৯
'লিবারেল এডুকেশন' ১২১
লীলা চিটনিশ ৫৩
লীলা রায় ১৩২
'লুসি' ৬৮
'লেখন' ৫৬
লেনিন ৯০

শঙ্খ ঘোষ ১৩১
শচীন দেব বর্মন ৫৭
(ডা.) শচীন সর্বাধিকারী ৬৯, ৭২
শরৎচন্দ্র বসু ৩৮, ৪৩, ৮৪, ৮৯, ৯০, ১০২, ১১৮, ১১৯, ১৫৩
শশিভূষণ দাশগুপ্ত ১৪২
শান্তি কবীর ৬৮, ১২৭
শান্তি রায়চৌধুরী ৪৪
শামসুল হুদা ৯২
শার্লট ব্রন্টে ১০৬
শাহ নওয়াজ খান ৭৪, ৮১
(ডা.) শিশিরকুমার বসু ৪২, ৪৮,

৪৯, ৫২, ৫৯, ৬৪, ৮৯, ৯০, ১০২, ১০৩, ১১৯, ১৪৮-১৫১
শেক্সপিয়র ১৪১
শেখ আবদুল্লা ১২৬
'শেষ উত্তর' (ছায়াছবি) ৬৬, ৬৭
শৈল মুখার্জি ১১৭, ১২৬
শৈলজারঞ্জন মজুমদার ১৯
'শ্যামা' ১৪৫
শ্রাবণী সেন ৬৫
শ্রীকুমারবাবু [বন্দ্যোপাধ্যায়] ১৩৪

সনৎ ভট্টাচার্য ১৩৭
সরোজবালা ৪১
সর্দার [বল্লভভাই] প্যাটেল ৮৪, ৮৯, ১০৩
সাগরময় ঘোষ ১৩৯
সাদাত হাসান মান্টো ১০৩
(কর্নেল) সিরিল জন স্ট্রেসি ৮৮, ১০১
সিসিল বীটন ৯৯
সুকুমার রায় ২৪
সুখময় চক্রবর্তী ১৩২
সুচিত্রা সেন ৭৬
সুছন্দা সিংহ ৬৯
সুজাতা চৌধুরী ১২১
সুজাতা রায় ৬৪
সুনয়নী দেবী ৬০
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ৫৭, ১৫২
সুনীল জানা ৬২, ১৪৯
সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ১৩১, ১৩৬, ১৪৩
সুব্রত মুখার্জি ১৪৮
সুভাষচন্দ্র [বসু] ৪২, ৪৩, ৪৬-৪৯, ৫৮, ৫৯, ৬৪, ৭৪, ৮০, ৮২-৮৪, ৮৬-৯০, ৯৪, ১০১, ১০৬, ১০৯, ১৫০, ১৫১
সুমিত্রা সেন ৬৫
সুরেন্দ্রকুমার রায় ১৭, ১৮, ৮৯, ১৫২
সুশোভন সরকার ১৩২
সুহৃদচন্দ্র সিংহ ৬৯, ৭০
সোহরাওয়ার্দি ১০২
সৌকত মালিক ৭৪, ৮৯, ১০১
'স্টেটসম্যান' ৪৭, ৯৩, ১১৪, ১২১, ১৩৯, ১৪৪
(স্যার) স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস ৪৭
'স্বদেশ ও সভ্যতা' ৬১
স্বামী ৬৪
'স্যামসন অ্যাগনিস্টিস' ১৩২, ১৩৩

(মহারাজা) হরি সিং ১২৮
হরেন্দ্রকুমার মুখার্জি ১৩০
হবিব-উর-রহমান ৮৯, ১০১
হিরণ্ময় [চৌধুরী] ১৫৩
হুমায়ুন কবীর ৬৮, ১২৭
হেমেন্দ্রকুমার দাস ২৩
হেমেন্দ্রকুমার রায় ৫৬

'Free Lance' ১৩৯
'Remembering My Father' ১০৩
'Tryst With Destiny' ১০৮